উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর

(The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century)

গবেষক

মোঃ কামাল হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

জুলাই-২০২২

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর

(The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ কামাল হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি: নং- ৬৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই-২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি মোঃ কামাল হোসেন এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত **উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর (The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণালব্ধ রচনা। আমি এ অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদান করছি। ইতোপূর্বে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা কোনো ডিগ্রির জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়নি। আমার জানা মতে, আলোচ্য শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভও রচিত হয়নি।

ঢাকা
জুলাই, ২০২২

(মোঃ কামাল হোসেন)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং- ৬৩, সেশন- ২০১৬-২০১৭
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মোঃ কামাল হোসেন কর্তৃক (রেজি. নং- ৬৩, সেশন- ২০১৬-২০১৭) পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর (The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি (থিসিস) আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

তারিখ, ঢাকা
জুলাই, ২০২২ খ্রি.

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় শিক্ষাগুরু অধ্যাপক এ কে এম ইদ্রিস আলী

এবং

জন্মদাত্রী মা তারাবানু বেগম

দু'জনই আজ দূর নক্ষত্র রাজ্যের বাসিন্দা।

প্রসঙ্গ কথা

উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ শতকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসিত বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও এ ধারার প্রতিফলন দেখা যায়। উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান সমাজের চিন্তার জগতে এ রূপান্তরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে **উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর (The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century.)** শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমি পিএইচ.ডি. গবেষণা শুরু করি। আমার এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক এ কে এম ইদ্রিস আলী। উল্লেখ্য যে, আমি ইতোপূর্বে একই বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে **ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ভূমিকা** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা সম্পন্ন করে ডিগ্রি অর্জন করি। পরবর্তীতে তাঁর তত্ত্বাবধানেই উপর্যুক্ত শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণা শুরু করি। গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিন্যাস ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাজের ভিত্তি রচনায় আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুখ ও পরিতাপের বিষয় হলো যে, আমার প্রিয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক এ কে এম ইদ্রিস আলী ২০১৭ সালের ৯ নভেম্বর আকস্মিক ইন্তেকাল করনে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহী রাজিউন)। আমি কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে আমার শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রয়াত অধ্যাপক এ কে এম ইদ্রিস আলীকে স্মরণ করছি। একই সাথে তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করছি। প্রয়াত অধ্যপক এ কে এম ইদ্রিস আলীর সহধর্মিনী মিসেস কামরুন্নাহার আলো। আমি তাঁর পুত্রসম স্নেহ ভালোবাসায় সিক্ত। তিনি আমার এম.ফিল. গবেষণা এবং পরবর্তীতে পিএইচ.ডি গবেষণা কাজের একজন স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও প্রেরণাদানকারী। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও সহযোগিতার জন্য আমি বরাবরই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাঁর সার্বিক মঙ্গলময় জীবন, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাকে ব্যক্তিগতভাবে মর্মাহত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। একই সাথে আমার গবেষণা কর্ম পরিচালনাও সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় আমার গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করতে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। উল্লেখ্য যে, তিনি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণা কর্মের যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের মৃত্যুর পর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একাডেমিক কমিটি যুগ্ম-

তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করে। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি উপর্যুক্ত শিরোনামে এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন করেছি। অভিসন্দর্ভের কাঠামো পুর্ণবিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণা কাজকে বোধগম্য করতে বিশেষভাবে সহায়ক এবং অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করেছে। তিনি আমার গবেষণাকর্মের অধ্যায় ভিত্তিক সংশোধন পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বস্তুত আমার নিজের সীমাবদ্ধতাকে তিনি বারবার তাঁর সানুগ্রহ প্রশ্রয় দিয়েছেন। অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি নিজের সময় ও শ্রম দিয়ে গবেষণা কাজটি সুসম্পন্নকরণে তিনি যে ভূমিকা রেখছেন তা নিঃসন্দেহে আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁর উপর্যুপরি তাগিদ এবং সার্বিক সহযোগিতার ফলেই আমার গবেষণা কর্মের সমাপ্তি ও অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। একজন স্নেহধন্য গবেষক হিসেবে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আমার অগ্রজ ও সুহৃদ আলো আরজুমান বানু (গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের সহধর্মিনী), গবেষণা কাজের প্রয়োজনে সময় অসময়ে বাসায় আসলে তাঁর আন্তরিক অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা ভুলবার মতো নয়। এ সুযোগে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য আমার অনিঃশেষ শুভ কামনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষণার নীতিমালার শর্তপূরণের জন্য আমাকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে “কোম্পানি আমলে বাংলার পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারাঃ মুসলিম সমাজে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া” এবং “উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার রূপান্তর” শিরোনামে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়েছে। প্রবন্ধ দু'টি উপস্থাপনের সুযোগ দানের জন্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপস্থাপিত এ দু'টি প্রবন্ধের উপর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি বিভাগীয় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বন্ধুবর শিক্ষক ও অনুজ শিক্ষকদের কাছ থেকে। আমি তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণাকর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত প্রদানসহ নানাভাবে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- আমার কর্মক্ষেত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মামুনুর রশিদ, সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মান্নন হাওলাদার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আনোয়ারা আক্তার, অধ্যাপক ড. মাহমুদা খানম, সহকারী অধ্যাপক আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও জগন্নাথ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর কাছ থেকেও বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। পিএইচ.ডি. গবেষণার দীর্ঘ ও কঠিন যাত্রা পথের শুরু থেকে শেষাবধি গবেষণা সহায়ক নানা পরামর্শ, অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে উদ্দীপনা ও অনুপ্রাণীত করার জন্য তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ ড. আইনুল ইসলাম, সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মোঃ আবুল হোসেন, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম লুৎফর রহমান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আলীম, অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম শফিউল্লাহ হাবিব এবং ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আশরাফুল আলম এবং নাট্যকলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল হালিম প্রামানিক অনেক তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। তাঁদের এ উদার সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আমার গবেষণা সম্পন্নকরণে সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জান স্যারের কাছ থেকে। এ বিষয়ে তাঁর সহধর্মিনী মিসেস সালমা জামানের আন্তরিকতার কথাও স্মরণযোগ্য। এ পর্যায়ে আমি তাঁদের কৃতজ্ঞাচিত্তে স্মরণ করছি এবং তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

সুষ্ঠুভাবে গবেষণা সম্পাদনে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ স্টাডিজ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ন্যাশনাল আর্কাইভস বাংলাদেশ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মোঃ রাশিদুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মকর্তা জনাব মো: ছরোয়ার হোসেন ও সাজেদা সুলতানা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরির কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ মিলন হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে।

গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে মনে করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মোঃ ফকর উদ্দিন মোল্লাহকে। আমি তাঁর সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মা মরহুমা তারাবানু বেগমকে। আমার শৈশব জীবনেই তিনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তবে এখনো তাঁর স্মৃতি আমাকে প্রতিনিয়তই যেমন আবেগ তাড়িত করে, তেমনি উদ্যোম ও সাহস যোগায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার এ অর্জনে বেঁচে থাকলে আমার মা'ই সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। আমার সকল শুভ কামনায় আমার মায়ের সতত অবস্থান আছে। তারপরও এ সুযোগে আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমার মাতৃসম বড়বোন নাসরিন আক্তার এবং অনুজ সাবিনা ইয়াসমিন ফাতেমা। আমার দুঃখ-কষ্টের যেমন সমব্যাথী, তেমন সকল অর্জনেও আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়াই যাদের প্রধান কাজ। বিরামহীন স্নেহ, ভালোবাসা ও সেবা দিয়ে যারা আমাগে বলতে গেলে আগলে রাখেন। আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনেও তাদের অনেক ত্যাগ ও অবদান রয়েছে। আমি আমার এ পরম সুহৃদদের কেবল ধন্যবাদ দিয়ে দায় মোচন করতে চাই না। তাদের জন্য রইলো আমার অকৃত্তিম শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। এছাড়াও আমার পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা।

উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর

(The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

গবেষক

মোঃ কামাল হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি: নং- ৬৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই-২০২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে

পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের

সার সংক্ষেপ (Abstract)

উপস্থাপিত গবেষণার শিরোনাম

উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর

(The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century)

উনিশ শতকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় মুসলমানদের মধ্যেও এ ধারার প্রতিফলন দেখা যায়। বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার রাজ শক্তির পতন ঘটে এবং ব্রিটিশ রাজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে রাজ পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে সড়ে পড়ে। ফলে অশিক্ষাজনিত কারণে নৈতিক অধঃপতনের কবলে পড়ে এবং চিন্তাধারায়ও তারা পশ্চাতপদ অবস্থায় নিপতিত হয়। এ অবস্থায় উনিশ শতকের শুরুতেই বাংলার মুসলিম জাগরণের একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। যার প্রভাব বঙ্গ-ভারতীয় সমাজে পড়ে এবং বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও এ ধারা পরিলক্ষিত হয়। ১৭৫৭ খ্রীঃ ঐতিহাসিক পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে বিশেষত অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে মুসলিম সমাজ ও চিন্তাধারায় ব্যাপক অধঃপতন দেখা দেয়। সে সময় উপমহাদেশের মুসলমানগণ ইংরেজ, মারাঠা ও শিখদের অত্যাচারে ও নিপীড়নে জর্জরিত হচ্ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম জাগরণের বিষয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতাদর্শের অনুসারী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করেন। তাদের কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানের উন্নয়ন সাধন করা। হাজী শরিয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) পরিচালিত ফরায়েজী আন্দোলন এর একটি স্বার্থক উদাহরণ। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে বহুবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতিতে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় নৈতিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করা ছিল ফরায়েজী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় ও সামাজিক

আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলমান সমাজকে নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তৎকালীন বিখ্যাত মুসলিম পন্ডিত হাজী শরীয়তুল্লাহ সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিংহ পুরুষ বলে পরিচিত হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহাকুমার অন্তর্গত শ্যামায়েল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে তাঁর পিতা আব্দুল জলীল তালুকদার মারা যান। ধর্মীয় শিক্ষালাভের পর হজ্ব পালন শেষে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ বিশ বছর পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালে তিনি সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত তাহের সম্বলের নিকট ইসলাম ধর্মের উপর লেখা পড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মক্কায় এসময় হাজী শরীয়তুল্লাহ ওহাবী সংস্কার আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে উক্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে বহুবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি বাংলার মুসলমানদেরকে শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার, কবরপূজা,পীরপূজা ও অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যাবলি থেকে মুক্ত করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শে সচেতন করেন। সাথে সাথে ব্রিটিশ রাজ, অত্যাচারী হিন্দু, জমিদার ও অমিতাচারী সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ গ্রামে মৃত্যু বরণ করেন।

হাজী শরীয়তুল্লার সমসাময়িক মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) পরিচালিত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কমবেশি একই রকমের। সায়্যিদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সংগঠক, কুস্তিগীর ও সাহসী বীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৮১৯ সালে তিনি হজ্ব আদায় করেন। সেখানে সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁর আদর্শ ও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। স্বদেশে ফিরে তিতুমীর অত্যাচারী জমিদার, অত্যাচারী নীল কুঠিওয়ালা ও ব্রিটিশ দালালদের বিরুদ্ধে ১৮৩১ সালে নারিকেল বাড়িয়ার যুদ্ধ হয়। এসময় তাঁর বাঁশের কেল্লা ইংরেজদের কামানে বিধ্বস্ত হলে তিনি যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তার আদর্শ ও পরিকল্পনা মুসলিম চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের দোসরদের প্রতিরোধ করতে যেয়ে তিনি অনেক সমর্থকসহ নিজের জীবন উৎসর্গ করে বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের এক উজ্জ্বল প্রেরণার দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে রয়েছেন। তাঁর আদর্শ ও কর্ম-পরিকলাপনা মুসলিম চিন্তা চেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। হাজী শরিয়তুল্লাহর উত্তরসূরী মুহম্মদ মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়ারু (১৮১৯-১৮৬২) নেতৃত্বে পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন চরিত্রগত দিক থেকে তাঁর পিতার আন্দোলন থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন ছিল একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু দুদু মিয়া একে একটি সংগ্রমী ধর্মীয় সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টর মাধ্যমে বাংলার মুসলিম মানস চিন্তার জগতে একধাপ রূপান্তর প্রক্রিয়া সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। শাসক ও শাসিতের কর্মকাণ্ড এবং জীবন ব্যবস্থায় যে ইসলাম বিরোধিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে, তারই বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করতে গিয়ে তৎকালীন মুসলিম পন্ডিতগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। মুসলিম সমাজকে অনৈসলামিক চিন্তাধারা এবং কার্যকলাপ হতে মুক্ত করে ইসলামের মহান শিক্ষায় ও জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা অবশ্যই প্রয়োজন।

তবে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশে সিপাহী বিপ্লব মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করে। এর মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্রিটিশ ভারতে এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ পর্যায়ে মুসলিম সমাজ ধর্মীয় পুনর্জাগরণের প্রয়াস অপেক্ষা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে আধুনিক পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিজেদের পরিপুষ্ঠ করার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে উপলব্ধি করেন। সর্বভারতীয় পর্যায়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৩) এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য ও বহুবিধ সংস্কারমূলক কর্মপন্থার মাধ্যমে আলোর পথের সন্ধান দেন। তাঁর উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নতুন এক প্রাণ স্পন্দন দেখা দেয়। বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ছিলেন সৈয়দ আহমদ খানের সমসাময়িক। বাংলার মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত কর্মধারাও ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খানেরই মতো।

মুসলিম নব জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব আব্দুল লতিফ কর্তৃক ১৮৬৩ খ্রীঃ মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক ১৮৭৭ সালে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তার রূপান্তর ঘটে। সেই সময়ের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তি মুসলিম সমাজের চিন্তার জগতে

পরিবর্তন সাদনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে দেলোয়ার হোসেন আহম এবং মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রথমোক্তজন ছিলেন অধিকতর প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ। তিনি মুসলিম সমাজকে ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে আধুনিকতা ও প্রগতির পথে ধাবিত হতে অনুপ্রাণীত করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশদের অনুকম্পা লাভে মুখাপেক্ষিতা পরিহার করে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রেরণা দেন। তিনি মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেন। অন্যদিকে মেহেরুল্লাহ মুসলিম সমাজে ধর্মীয় নীতিবোধ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তাদের মধ্যকার সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রমের প্রয়াস নেন। তিনি মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক শিক্ষা ও ঐক্য গড়ার প্রয়াসেও অনুপ্রাণিত করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম মননজগতে যে পরিবর্তন এসেছিল এর প্রভাব ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকেও আন্দোলিত করেছিল। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো ফরায়েজি আন্দোলন এবং এ প্রসঙ্গটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে চিন্তার জগতে মুসলিম সমাজে রূপান্তর সাধনে নবাব আব্দুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহসহ অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম সংস্কারকগণ বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এসময় মুসলিম চিন্তাধারা রাজনৈতিক, সামাজিক, পাশ্চত্য শিক্ষার উন্মেষও ধর্মীয় চিন্তার উপর এর প্রভাব ফেলে। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে সবিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার মুসলিম সমাজ যে দুর্দশায় নিমজ্জিত ছিল তার চিত্র তুলে ধরা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য তৎকালীন মুসলিম মনীষীদের ভূমিকা চিহ্নিত করা আলোচ্য অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য শক্তি কিভাবে এ দেশীয় সমাজ ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে ছিল তা অনুসন্ধান, মুসলিম বাংলার মানুষের মনে কি সচেতনাবোধ গড়ে উঠে এবং কিভাবে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো মজবুত হয় তা এ গবেষণায় নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও উনিশ শতকে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক নৈতিক পরিবর্তন আনয়নে যে সকল বিশিষ্ট মুসলমান পণ্ডিতগণ মুসলিম মানসে নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলেন তাদের কর্ম প্রয়াসের যথাযথ মূল্যায়ন এ গবেষণা কর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ সময় মুসলিম জাতি তাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব থেকে বিচ্যুত হয়ে অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন বিখ্যাত মুসলিম মনীষী, সুফি সাধক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা পাশ্চাত্য ভাবধারায় আধুনিক শিক্ষার আলোকে মুসলিম

সমাজ জীবনকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের অসামান্য অবদানের চিত্র অত্র গবেষণায় স্থান পেয়েছে। সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজের চিন্তা নানা ভাবদ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম চিন্তা ধর্মীয় পুনর্জাগরণের এবং কিছু পরিমাণে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি তৎপরতার মধ্যে সীমিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে এসে নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে ব্রিটিশ বিরোধী মুসলিম চিন্তায় সংগ্রামী ধারার অবসান ঘটানো হয় এবং নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ সময় থেকে আবেদন নিবেদনের রাজনীতি শুরু করে। এ শতকের শেষ দিকে মুসলিম চিন্তার গতিধারা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্যান ইসলামী ভাবাদর্শ ধারা প্রভাবিত হয়। অতএব, এ শতকের মনীষীগণের কর্মকাণ্ড ও চিন্তাচেতনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে হাজী শরীয়তুলাহ যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন সময়ে আবর্তে তার চরিত্র পরিবর্তন হয়। যুগ বাস্তবতা বিবেচনায় এনে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজকে নেতৃত্বদানকারী মনীষীগণ মুসলিম সমাজের জাগরণের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তনে নতুন ধারার সূচনা করেন। ধর্মীয় রক্ষণশীলতার গণ্ডি অতিক্রম করে এসময় মুসলিম সমাজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর ভাবধারার অনুসরণে ব্রতী হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনমান নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট হয়। "উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর" শিরোনামে বর্তমান অভিসন্দর্ভে এসব বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস রয়েছে।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ও আলোচ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে **উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর (The transformation of Muslim thoughts in Bengal in the nineteenth century)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এতে পরিশিস্ট হিসেবে কিছু প্রামাণিক তথ্যসূত্র এবং একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা: অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় আলোচ্য গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণসহ বিষয়বস্তু এবং গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিদ্যমান দ্বৈতায়িক সহায়ক তথ্য-উপাত্তেরও একটি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সংযোজন করা হয়েছে ভূমিকায়। প্রাসঙ্গিক কারণে এতে অভিসন্দর্ভের গঠন কাঠামো বা অধ্যায় বিন্যাসও স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজঃ একটি পর্যালোচনা**। এ অধ্যায়ে পর্যালোচনামূলক আলোচনার মাধ্যম্যে উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজঃ আর্থ-সামাজিক চিন্তনের স্বরূপ**। এ অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলমানরা কীভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে পিছিয়ে একটি দুর্দশাগ্রস্থ সম্প্রদায়ে পতিত হয়েছে এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেখান থেকে উত্তরণে জন্য মুসলিম মনীষী ও নেতৃবৃন্দ কী ব্যবস্থা নিয়েছেন তা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া এ অধ্যায়ে মুসলিম চিন্তার রূপান্তরে সংবাদ পত্রের ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় চিন্তনের রূপান্তর ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া**। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ট মনে করা হতো। ১৮৮১ সালের আদমশুমারির পর বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ হলে নানা ধরনের বিশ্লেষণ শুরু হয়। বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের আদি বৃতান্ত নিয়ে বহু গ্রন্থও রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতির ন্যায় মুসলমানরাও বিজিত হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। মুসলমান সমাজ জীবনে আচার-অনুষ্ঠান, জীবন বোধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, জীবনযাপনের ধরন ও পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রভাব বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলার সমাজে লক্ষণীয়। ফলে এখানে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মাধ্যমে মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার রূপান্তর ধারা সংগঠিত হয়। তাই এ অধ্যায়ে উক্ত সংস্কার আন্দোলন ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে মুসলিম চিন্তার রূপান্তর হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন**। এ অধ্যায়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৮০০-১৮৫৭) এবং ব্রিটিশ রাজকীয় শাসনামলে (১৮৫৮-১৯০০) বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তা বিরাজমান ছিল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে ব্রিটিশ আবেদন নিবেদনের রাজনৈতিক চিন্তন রূপান্তরিত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ ও রাজনৈতিক চিন্তার রূপান্তরের নেপথ্য ভূমিকা পালনকারী কয়েকটি সামাজিক-সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম **বাঙালি মুসলিম সমাজে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কৃতির রূপান্তর**। উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম চিন্তার রূপান্তর হয়েছিল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে। এ শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে বাংলায় পাশ্চাত্যের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, বিজ্ঞান চেতনা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বাংলার মুসলমানদের চিন্তা ও মননশীলতাকে আধুনিকতায় রূপান্তরিত করেছিল। তাই কীভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ চিন্তা ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম **পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট মুসলিম সমাজ গঠন ও তাঁদের চিন্তার রূপান্তর**। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানরা নানা রকম সংস্কার ও ভাব দ্বন্দ্বে আন্দেলিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের পরে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ তোষণনীতি গ্রহণ করে এবং সাধারণ মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠে, যাদের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এসব সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানরা অধিকার সচেতন হয় এবং তাদের চিন্তার রূপান্তর ঘটে। তাই এ অধ্যয়ে কী ভাবে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে এবং তাদের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি হয় তা তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার: অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সার নির্যাসসহ গবেষকের সার্বিক মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে উপসংহারে।

অভিসন্দর্ভের শেষদিকে একধিক পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকচিত্রসহ কিছু দলিলাদি যুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে রয়েছে এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জির একটি দীর্ঘ তালিকা।

গবেষকের নাম: **মোঃ কামাল হোসেন**

বিভাগের নাম: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি: নং- ৬৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রসঙ্গ কথা	iv-vii
ভূমিকা	১-১০
প্রথম অধ্যায়	
উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ: একটি পর্যালোচনা	১১-৫২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজ: আর্থ-সামাজিক চিন্তনের স্বরূপ	৫৩-৮২
তৃতীয় অধ্যায়	
উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় চিন্তনের রূপান্তর ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া	৮৩-১২৪
চতুর্থ অধ্যায়	
উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন	১২৫-১৫৯
পঞ্চম অধ্যায়	
বাঙালি মুসলিম সমাজে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কৃতির রূপান্তর	১৬০-২০৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	
পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট মুসলিম সমাজ গঠন ও তাঁদের চিন্তার রূপান্তর	২০৬-২৫৫
উপসংহার	২৫৬-২৬৫
পরিশিষ্ট -১	২৬৬-২৬৯
পরিশিষ্ট-২	২৭০-২৭৭
গ্রন্থপঞ্জি	২৭৮-২৯৭

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক অতীব গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব হিসেবে বিবেচ্য। এ শতকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গ-ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। এ সময়ে বাঙালি সমাজ বিশেষ করে মুসলমান সমাজেও বিশেষ রূপান্তর ঘটেছিল। বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলিম রাজশক্তির পতন ঘটে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশরা ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁ উজ্জীবিত শক্তি। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক বঙ্গ-ভারতে এক নতুন জীবনবোধ ও ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির ঔপনিবেশি শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এখানকার রাজনৈতিক-বিধি ব্যবস্থারই কেবল পরিবর্তন সাধনই করেনি, বাঙালির মানসজগতকেও প্রবলভাবে আন্দোলিত করে এবং কোম্পানি শাসন বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটায়। বাঙালি সমাজ এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। উল্লেখ্য যে, এ পরিবর্তিত অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য এদেশের সাধারণ মানুষ তো নয়ই, বরং বাংলার অভিজাত উচ্চশ্রেণিও প্রস্তুত ছিল না। ফলশ্রুতিতে কোম্পানি শাসনের অভিঘাত এদেশের মানুষের মানসপটে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বাঙালি হিন্দু সমাজ নব্য শাসকগোষ্ঠীকে স্বাগত জানিয়ে তাদের প্রবর্তিত বিধিব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে। নিজেদের শাসন ব্যবস্থার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোম্পানি সরকার তাদের সাদরে কাছে টেনে নেয়। নানা রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে মুসলিম সমাজের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিজেদের শাসনকে নিরাপদ রাখার নীতি গ্রহণ করে।

অন্যদিকে রাজ ক্ষমতা হারানোর ফলে মুসলিম সমাজ সঙ্গতকারণে শুরু থেকে কোম্পানি সরকারের সাথে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। কোম্পানি সরকারও সচেতনভাবে তাদের দূরে রাখার নীতি গ্রহণ করে। রাজশক্তি হিসেবে ইতোপূর্বে মুসলিম সমাজ যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো একে একে তাদের কাছ থেকে সেগুলো কেড়ে নিতে থাকে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজকে যে সব নতুন নতুন সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল মুসলমানদের সেগুলো থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হয়। অন্যদিকে মুসলিম সমাজ কিছুটা জাত্যাভিমান ও নতুন পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারাও ইংরেজ প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ থেকে দূরে থাকে। বস্তুত সুদীর্ঘকাল ধরে মুসলিম রাজত্বকালে মুসলমানরা যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিল সেগুলো তারা দ্রুত হারাতে থাকে। ইংরেজ বড়লাট স্যার জন শোর লিখিত বিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, দেশের প্রশাসন কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে চলে যাবার ফলে প্রাক্তন মুসলমান শাসকদের অগণিত পরামর্শদাতা ও তাদের পোষ্য হারিয়েছে তাদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি; তার সঙ্গে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জনের সুযোগ সুবিধা এবং এর ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অভিজাত বংশীয় পরিবার যারা এককালে ছিল বিত্তশালী তারা বিত্ত ও প্রতিপত্তির উৎস থেকে

বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়েছে।[১] তিনি স্বীকার করেন যে, এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[২] এভাবেই ব্রিটিশ শাসনাধীনে রাজপৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে সড়ে পড়ে। ফলে অশিক্ষাজনিত কারণে তাদের নৈতিক অধঃপতনসহ চিন্তাধারায়ও তারা পশ্চদপদ অবস্থায় নিপতিত হয়। এ অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে উনিশ শতকের শুরুতেই বাংলার মুসলিম জাগরণের একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ জাগরণ প্রয়াসকে মোটা দাগে দুটি ধারায় ভাগ করা যায়। যথা: (ক) ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী ধারা এবং (খ) পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ঠ চিন্তাধারা।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম মানস ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন ছিল। বাংলার মুসলিম সমাজে শাহ ওয়ালীউল্লাহর (১৭০২-১৭৬৩) অনুসরী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রথম পর্যায়ের এ জাগরণ প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন। তাদের কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের উন্নয়ন সাধন করা। হাজী শরিয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন এর একটি স্বার্থক উদাহরণ। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে বহুবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতিতে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় নৈতিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করা ছিল ফরায়েজি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। হাজী শরিয়তুল্লাহর সমসাময়িক মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) পরিচালিত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল প্রায় একই রকমের। তবে তিতুমীর মনে করতেন, মুসলমান সমাজের এ দূরবস্থার জন্য ইরেজ শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের দোসর জমিদার ও নীল কুঠিয়ালরাও দায়ী। এ জন্য তিনি মুসলিম জাগরণের অংশ হিসেবে বাংলার মুসলিম সমাজকে পূর্বোক্ত রাহুশক্তির গ্রাস থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের দোসরদের প্রতিরোধ করতে যেয়ে তিনি তাঁর অনেক সমর্থকসহ নিজের জীবন উৎসর্গ করে বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের এক উজ্জ্বল প্রেরণার দৃষ্টান্তে পরিণত হন। তাঁর আদর্শ ও কর্ম-পরিকল্পনা মুসলিম চিন্তা চেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

হাজী শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন বৈশিষ্ট্যগতভাবে বিশুদ্ধ ধর্মীয় আন্দোলন। তবে তাঁর উত্তরসূরী মুহম্মদ মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়ার (১৮১৯-১৮৬২) নেতৃত্বে এ আন্দোলনে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে কিছু পরিমাণে সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্র যুক্ত হয়েছিল। দুদু মিয়া একে একটি সংগ্রমী ধর্মীয়–সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম মানস চিন্তার রূপান্তর

---

১. *Bengal Secret Consultation*, No. 11, 22 June 1795.

২. R. Hehber,*Narative of a Journey through the Upper Provinces of Indis from Calcutta to Bombay,1824-25*; with an account of a Jurney to Madras and Southern India, London,1828,iii. p. 298.

প্রক্রিয়া একধাপ সামনে এগিয়ে যায়। তবে এর মাধ্যমে মুসলিম মানস তথা চিন্তাজগত ভারতীয় বাস্তবতার সাথে তখনো খাপ-খাওয়াতে পারেনি।

বস্তুতঃ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের জাগরণ প্রয়াসের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারাপুষ্ট আধুনিক চিন্তাধারা দেখা যায় না। এ সময় তাদের কর্মকাণ্ডে মূলত ধর্মভিত্তিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এ সময় মুসলমানদের পরিচালিত আন্দোলনগুলো ছিল বিশেষভাবে আঞ্চলিক, সম্প্রদায়গত ও পেশাভিত্তিক। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সমাজ। তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনগুলোর মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আকুতি ছিল প্রধান। তবে এতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি যুক্ত হওয়ায় এসব আন্দোলন কিছুটা মিশ্ররূপ ধারণ করেছিল। এসব আন্দোলনে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ প্রয়াস মুখ্য হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্যান ইসলামিজমের ধারণার বীজ বপিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল, তাতে জিহাদি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির উৎখাত করাকে তাঁদের কেউ কেউ ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তবে উত্তর ভারতের মতো বাংলায় জিহাদি প্রবণতা এতটা প্রকট ছিল না। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতাকে যারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে এ ধারায় মুসলমান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের এ চিন্তা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত ছিল বলে মনে হয় না। কারণ ভারতে কোম্পানি সরকার তখন একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি। এ শক্তিকে বল প্রয়োগে বিতাড়িত করার সামর্থ্য তখন এদেশীয় মুসলমানদের ছিল না। তাই তাদের উচিৎ ছিল ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাসমূহ গ্রহণ করে প্রথমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা এবং এরপর নিজেদের সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু তাঁরা এটি করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত এ সময় মুসলিম সমাজের নেতৃত্বদানকারীগণের যুগ-বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। চিন্তাধারায় তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল এবং অনেকাংশে পশ্চাদমুখী। তাঁরা অতীতের গৌরবময় স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তাই ভবিষ্যতের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য উপযোগী করণীয় নির্ধারণে তাঁরা ব্যর্থ হন। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে নতুন আদর্শ, ভাবধারা ও জীবনবোধের জন্ম হয়েছিল, কোম্পানি শাসনের সূত্র ধরে উনিশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় এর আগমন শুরু হয়। কিন্তু বাংলার মুসলিম সমাজে নেতারা এর মর্মার্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় এটি গ্রহণ না করে নিজেদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়ে থাকেন। ফলে এর দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধনে তাঁরা ব্যর্থ হন। তবে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের নেতাগণ এদেশে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের মনে অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, এর ফল হিসেবে এদেশে সাধারণ মানুষ কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে লড়াই সংগ্রামে প্রেরণা পেয়েছে। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৮৫৯-৬০ সালে পরিচালিত নীল বিদ্রোহ এবং ১৮৭২-৭৩ সালে পরিচালিত পাবনার কৃষক বিদ্রোহে।

পুনশ্চঃ উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম সমাজ যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তাঁদের করণীয় নির্ধারণে অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও হিন্দু সমাজে তা হয়নি। তাঁরা ব্রিটিশদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শুরু থেকে তৎপর ছিল। এজন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে তাদের উৎখাতের জন্য যখন জিহাদি তৎপরতায় লিপ্ত, তখন হিন্দুরা ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। কোম্পানি সরকার প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রি.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এ তৎপরতা দেখা যায়। স্বসমাজের প্রতি ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদ তাঁরা করেছেন, তবে তা কোনো সোচ্চার প্রতিবাদ বা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই তাঁরা বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'Zamindary Association' (ভূম্যধিকারী সভা) ছিল এরূপ একটি সংগঠন। পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'Landholders Society'। এটি ছিল প্রথম জনসংস্থা যেটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয়েছিল।[৩] ১৮৫১ সালে 'British Indian Association' নামে আর একটি নতুন সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের সনদ আইনকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় হয়ে উঠে। নতুন সনদ প্রাপ্তিকে সামনে রেখে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগগুলোর প্রতি ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আশু ফল লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকাসহ কিছু সংবাদ মাধ্যমের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই উচ্চ-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম সমাজে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট চিন্তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়নি।

ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহাম্মদী বা তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলিম মানসে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ[৪] একে আরো প্রবল করে তোলে। ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় এটি ছিল এক বিরাট প্রতিরোধ সংগ্রাম বা গণ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের উপক্রম হয়। কিন্তু নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ সফল হয়নি। সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে এ বিদ্রোহ দমন করে। তবে এ বিদ্রোহের সূত্র ধরে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হয় এবং ব্রিটিশ রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহের পরবর্তী সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজ অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ দুঃসময়ে

৩. B.B.Majumdar, *Indian Political Association and Reform of Legislatures 1817-1917*, Calcutta, 1905, p.23.

৪. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উৎস ও ঘটনাবলির বিবেচনায় কারও মতে এটি ছিল নিছক একটি সিপাহী বিদ্রোহ, কারও মতে জাতীয় সংগ্রাম এবং কেউ কেউ একে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : R C Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857,* Calcutta, 1957; রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী বিদ্রোহ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

পতিত হয়। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় যোগদান করলেও সরকার এর জন্য মুখ্যত মুসলমানদের দায়ী করে। সরকার বিদ্রোহের সার্বিক দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে তাদের উপর নানা ধরনের উৎপীড়ন ও চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে থাকে। এমনিতেই ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুর্দশার কারণ হয়েছিল; নবতর পরিস্থিতিতে এ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় রাজনীতির একটি দিক পরিবর্তনকারী ঘটনা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ একে মহাবিদ্রোহ বা ভারতীয়দের ইংরেজ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এটি ছিল কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় বিদ্রোহ। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান কোম্পানি সরকার এ মহাবিদ্রোহ দমনে সফল হলেও এর প্রতিক্রিয়া ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতে ব্রিটিশ রাজকীয় ঔপনিবেশি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্রিটিশ ভারতে এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ পর্যায়ে মুসলিম সমাজের চিন্তা দর্শনেও এক রকমের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও তৎপরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের উপর সরকারি আক্রোশ ইত্যাদির ফলে মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ নেতৃত্ব ছিল নগরবাসী ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভকারী উদার মনোভাবাপন্ন। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উলব্ধি করেন যে, ধর্মীয় পুনর্জগরণের প্রয়াস অপেক্ষা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় নিজেদের পরিপুষ্ট করার একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম সমাজের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তির উৎখাত কোনোভাবেই মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, এতদিন মুসলিম সমাজের যে অংশটি জিহাদের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের স্বপ্নে বিভোর ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে তাঁদের সে স্বপ্নেরও সমাধি রচিত হয়েছিল। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের নতুন নেতৃত্ব জিহাদি তৎপরতা পরিহার করে নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা ব্রিটিশ মানস থেকে মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অনাস্থা ও সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণেও প্রয়াসী হন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজের জাগরণে সর্বভারতীয় পর্যায়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৩) পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও বহুবিধ সংস্কারমূলক কর্মপন্থার মাধ্যমে আলোর পথের সন্ধান দেন। তাঁর উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা মুসলমান সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নতুন এক প্রাণ স্পন্দন সৃষ্টি করে। তার সৃষ্ট আলীগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান উত্তর ভারতে যা করেন বাংলায় প্রায় সমার্থক কাজই করেন নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮২-৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ। বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব আব্দুল লতিফ ছিলেন সৈয়দ আহমদ খানের সমসাময়িক। বাংলার মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত কর্মধারা ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতোই। নওয়াব আব্দুল লতিফ কর্তৃক ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা' করে মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত এবং তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নতুন জীবন চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়াস নেন। তিনি বাংলার মুসলিম সমাজকে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব পরিহার করে তাদের প্রতি অনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তাদের দেয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রহণের তাগিদ দেন। তাঁর নিজের অবস্থানের সপক্ষে মুসলিম জনমতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তিনি সমকালীন ধর্মবেত্তাদের কাছ থেকেও সহযোগিতা গ্রহণ করেন। এভাবে নবাব আবদুল লতিফের কর্মপ্রয়াস বাঙালি মুসলিম সমাজে এক নতুন ভাবদর্শনের জন্ম দেয়।

নবাব আবদুল লতিফের প্রায় সমসাময়িক ছিলে সৈয়দ আমীর আলী। পাশ্চাত্য শিক্ষিত এ মুসলিম নেতা বাংলার মুসলমানদের উনিশ শতকের ভারতীয় বাস্তবতার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ জীবনবোধে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে নানাবিদ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজের মানসজগতের পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রচনা করেন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ও যুগোপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ। মুসলিম সমাজকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৮৭৭ সালে তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এ সংগঠনটি কেবল একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনই ছিল না, বরং এর একটি রাজনৈতিক চরিত্রও ছিল। এখানে নবাব আবদুল লতিফের চিন্তা দর্শনের সাথে সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাগত পার্থক্য ছিল। নবাব আবদুল লতিফ মনে করতেন ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে যুক্ত হওয়া সমীচীন নয়। কেননা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব দৃঢ় করতে পারে। আর এটি হলে তারা আবারো ব্রিটিশ সরকারের বৈরী আচরণের শিকার হবে। ফলে তাদের পশ্চাদপদ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়াস ব্যাহত হবে। অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী মনে করতেন মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া ও অধিকারসমূহ আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা এর ফলে তারা সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থাতেই তাদের দাবি দাওয়া আদায় করতে সক্ষম হবে। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তার যৌক্তিকতা আরো জোরালো হয়। দৃশ্যতঃ কংগ্রেস একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হলেও কার্যতঃ এটি অমুসলিম বিশেষ করে হিন্দু সমাজের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ছিল। এ অবস্থায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম সমাজকে কংগ্রেসের সংশ্লিষ্টতা পরিহার করার পরামর্শ দেন। শুধু তাই নয়, সৈয়দ আহমদ খান কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক

প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কয়েকটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর এসব সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী ও সফল হয়নি। তবে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এসব প্রয়াস বাংলার মুসলমান সমাজের চিন্তার জগতে একটি পরিবর্তন ঘটায়। ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনী চিন্তার পরিবর্তে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ঠ চিন্তায় উদ্দীপ্ত হয়। তাদের মধ্যে রাজনীতি সচেতনতাও জাগ্রত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে শুরুতে মতভিন্নতা থাকলেও সৈয়দ আমীর আলী এ বিষয়ে অনেককে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় এক দশক পূর্বে তাদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হয়। তবে এ রাজনৈতিক সংগঠনটির মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক তৎপরতা দেখা যায় না। বরং মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটি আবেদন নিবেদনের রাজনীতি করে। আর এটিই ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম চিন্তার মূলধারা। লক্ষণীয় যে, উনিশ শতকের মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা দর্শনে বৈপ্লবিক তৎপরতা না থাকায় ব্রিটিশ সরকারও নতুন অনুগত মুসলমান নেতাদের সহযোগিতার মনোভাবকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।[৫]

সার্বিক ঘটনা প্রবাহ বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঊনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজের চিন্তা নানা ভাবদ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম চিন্তা ধর্মীয় পুনর্জাগরণের এবং কিছু পরিমাণে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি তৎপরতার মধ্যে সীমিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে এসে নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে ব্রিটিশ বিরোধী মুসলিম চিন্তায় সংগ্রামী ধারার অবসান ঘটানো হয় এবং নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ সময় থেকে আবেদন নিবেদনের রাজনীতি শুরু করে। এ শতকের শেষ দিকে মুসলিম চিন্তার গতিধারা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্যান ইসলামী ভাবাদর্শ ধারা প্রভাবিত হয়। অতএব, এ শতকের মনীষীগণের কর্মকাণ্ড ও চিন্তাচেতনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে হাজী শরীয়তুল্লাহ যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা দুদু মিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দান করেন। ১৮৫৭'র প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রমে মুসলমানদের পরাজয়ের পর নবাব আব্দুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলি, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহসহ অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম সংস্কারক, সুফি সাধকগণ মুসলিম সমাজের জাগরণের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরবর্তীতে রাজনৈতিক চিন্তনকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসময় মুসলিম চিন্তাধারা রাজনৈতিক, সামাজিক, পাশ্চত্য শিক্ষার উন্মেষ ও ধর্মীয় চিন্তার উপর এর প্রভাব ফেলে।

'উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর' শীর্ষক শিরোনাম নিয়ে আলোচ্য গবেষণা। আলোচ্য গবেষণাকর্মে মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার মুসলিম সমাজ যে দুর্দশায় নিমজ্জিত ছিল তার চিত্র তুলে ধরা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য তৎকালীন মুসলিম মনীষীদের ভূমিকা চিহ্নিত করার প্রয়াস রয়েছে। পাশ্চাত্য শক্তি কিভাবে এ দেশীয় সমাজ ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে ছিল তা অনুসন্ধান এবং বাংলার মানসের উপর এর অভিঘাত চিহ্নিত করে এ থেকে উত্তরণে

৫. ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩১।

গৃহীত প্রয়াসের প্রকৃতি নির্ণয় এবং সর্বোপরি উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তরের ধারা পর্যালোচনার প্রয়াস রয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে। আলোচ্য গবেষণায় বাংলা বলতে উনিশ শতকের অভিভক্ত বাংলাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রাথমিক ও দ্বৈতায়িক তথ্যসূত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তর বিষয়ে পরিপূর্ণ কোনো একক ও সার্বিক গবেষণা বা রচনা আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত বলতে গেলে হয়নি। ফলে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সমসাময়িক তথ্যসূত্রের বাইরে ব্যাপকভাবে দ্বৈতায়িক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের লেখা গ্রন্থের তথ্যসূত্রকে পর্যালোচনামূলক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার পটভূমি বিনির্মাণে ইতিহাসবিদ আবদুল করিমের *Social History of the Muslims in Bangal* (down to A.D. 1538, (Dhaka, 1985) গ্রন্থটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল আবদুর রহিম এর দু'খণ্ডে রচিত *Social and Cultural History of Bengal* (Karachi, 1963, 1967), *The Muslim Society and Politics in Bengal, A. D. 1757-1947* (University of Dhaka, reprint, 2011), Muinuddin Ahmed Khan রচিত *History of the Faraidi Movement in Bengal,1818-1906 (Karachi, 1965)* এবং এ. এফ. সালাউদ্দীন আহমদ রচিত *Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835)*, (Calcata-1976) মূল্যবান তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার সংশ্লিষ্ট তথ্য রয়েছে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আজিজুর রহমান মল্লিক রচিত *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1857)*,(Dacca-1961), সুফিয়া আহমদ রচিত *Muslim Community in Bengal 1884-1921 (Dacca, 1974), A.K. Nazmul Karim* রচিত *Changing Society in India and Pakistan (Dacca, 1956),* আনিসুজ্জামান রচিত *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৪), ওয়াকিল আহমদ রচিত *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকা, ১৯৯৭), মুনতাসীর মামুন রচিত *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* (ঢাকা, ১৯৮৬), মোঃ আব্দুল্লাহ-আল মাসুম *রচিত বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি* (ঢাকা, ২০০৭), বিনয় ঘোষ রচিত *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (ঢাকা, ২০১৩)* এবং আবদুল মওদুদ রচিত *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা, ১৯৬৯) ইত্যাদিসহ আরো অনেক গ্রন্থে। উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন: এসময় অধিকাংশ গবেষকের গবেষণার বিষয় ছিল বাংলা ও বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যারা গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা সম্ভবত তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের মনোভঙ্গি দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁদের চিন্তার পটভূমিতে ছিল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমাজের সমীকরণ। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, পূর্বোক্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সমকালে পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকের বাংলা সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা

প্রায় ক্ষেত্রে সচেতন বা অসচেতনভাবে হলেও হিন্দুদের কর্মকাণ্ডকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে এ অঞ্চলে (পূর্ববঙ্গে) যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মানসেও একই ধরনের চেতনা কাজ করেছিল এবং তাঁরাও সচেতন বা অসচেতনভাবে হলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টারত ছিলেন। সে জন্য বলা যায়, সামগ্রিকভাবে সমাজকে বিচার বিশ্লেষণ না করার ফলে তাদের ইতিহাস হয়েছে খণ্ডিত, অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের ইতিহাস মাত্র। অবশ্য মুনতাসীর মামুন এক্ষত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁর পূর্ব বাংলা সম্পর্কিত গবেষণা ও আলোচনায় মুসলিম সমাজ সম্পর্কি বর্ণনা যৎসামান্য। যদিও সংখ্যগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর আলোচনা আরো বিস্তৃত ও গভীর হওয়া প্রয়োজন ছিল।

ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত অভিসন্দর্ভটি কে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হলো:

প্রথম অধ্যায়: প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ: একটি পর্যালোচনা**। এ অধ্যায়ে বাংলার মুসলমানদের তদানিন্তন অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক চিন্তনের স্বরূপ**। এ অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলমানরা কী ভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে পিছিয়ে একটি দুর্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়ে পতিত হয়েছিল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেখান থেকে উত্তোলনের জন্য মুসলিম মনীষীগণ কী ব্যবস্থা নিয়েছেন তা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া এ অধ্যায়ে মুসলিম চিন্তার রূপান্তরে সংবাদ পত্রের ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় চিন্তনের রূপান্তর ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া**। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ট মনে করা হতো। ১৮৮১ সালের আদমশুমারির পর বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ হলে নানা ধরনের বিশ্লেষণ শুরু হয়। বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের আদি বৃতান্ত নিয়ে বহু গ্রন্থও রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতির ন্যায় মুসলমানরাও বিজিত হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। মুসলমান সমাজ জীবনে আচার-অনুষ্ঠান, জীবন বোধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, জীবনযাপনের ধরন ও পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রভাব বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলার সমাজে লক্ষণীয়। ফলে এখানে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মাধ্যমে মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার রূপান্তর ধারা সংগঠিত হয়। তাই এ অধ্যায়ে উক্ত সংস্কার আন্দোলন ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে মুসলিম চিন্তার রূপান্তর হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম **উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন**। এ অধ্যায়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৮০০-১৮৫৭) এবং ব্রিটিশ রাজকীয় শাসনামলে (১৮৫৮-১৯০০) বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তা বিরাজমান ছিল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে

ব্রিটিশ আবেদন নিবেদনের রাজনৈতিক চিন্তন রূপান্তরিত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ ও রাজনৈতিক চিন্তার রূপান্তরের নেপথ্য ভূমিকা পালনকারী কয়েকটি সামাজিক-সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম **বাঙালি মুসলিম সমাজে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কৃতির রূপান্তর**। উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম চিন্তার রূপান্তর হয়েছিল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে। এ শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে বাংলায় পাশ্চাত্যের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, বিজ্ঞান চেতনা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বাংলার মুসলমানদের চিন্তা ও মননশীলতাকে আধুনিকতায় রূপান্তরিত করেছিল। তাই কীভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ চিন্তা ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম **পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট মুসলিম সমাজ গঠন ও তাঁদের চিন্তার রূপান্তর**। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানরা নানা রকম সংস্কার ও ভাব দ্বন্দ্বে আন্দেলিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের পরে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ তোষণনীতি গ্রহণ করে এবং সাধারণ মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠে, যাদের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এসব সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানরা অধিকার সচেতন হয় এবং তাদের চিন্তার রূপান্তর ঘটে। তাই এ অধ্যয়ে কী ভাবে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে এবং তাদের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি হয় তা তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার: অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সার নির্যাসসহ গবেষকের সার্বিক মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে উপসংহারে।

অভিসন্দর্ভের শেষদিকে একধিক পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকচিত্রসহ কিছু দলিলাদি যুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে রয়েছে এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জির একটি দীর্ঘ তালিকা।

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ: একটি পর্যালোচনা

প্রাচুর্যে ভরা বাংলা অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে বারবার আকৃষ্ট করেছে।যে আকর্ষণের কারণেইভারতীয় উপমহাদেশে আগমন ঘটেছে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর।মুঘল শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটলে এ আগমনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৬০০ সালেভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের রাজকীয় সনদ লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। ব্যবসা-বাণিজ্য মূল লক্ষ্য হলেও কালক্রমে এদেশের রাজনৈতিকপরিস্থিতি তাদেরকে এতদঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রলুব্ধ করে। বাংলার অধিকাংশ শাসকের শাসনকার্যে দুর্বলতা, অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতার ও বিলাসিতার সুযোগে বিদেশি বেনিয়ারা এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করার স্বপ্ন দেখতে থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬১-১৯৪১)ভাষায়,"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে"।[১] বাংলার কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় ১৭৫৭ সালের প্রহসনমূলক পলাশী যুদ্ধ[২] এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে[৩]বাঙালিদের পরাজয় তাদের এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে। তবে ইংরেজরা বণিকরাজ হতে রাতারাতি শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। ধীরে ধীরে তারা বাংলার শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার ইতিহাস একতরফা ইংরেজ শাসনের ইতিহাস। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে, তাই পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপেব্রিটিশ সরকার বাংলার মুসলমান সমাজের উপর একের পর এক আঘাত হানতে থাকে। প্রথম আঘাত ছিল ১৭৬৩ সালে দেওয়ানি আদালতকে ফৌজদারি আদালত থেকে পৃথকীকরণ। যার ফলে বাংলায় রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত বাঙালি মুসলমানরা একনিমেষে নিঃস্ব ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৭৭২ সালে নবাবের সমস্ত ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস 'গভর্নর জেনারেল' উপাধি নিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বময় কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন।

১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিবাজি-উৎসব' পূরবী, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ষোড়শ খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৪

২.১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ দৌলা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সংগঠিত হয় এবং সিরাজ-উদ দৌলা পরাজিত হন। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙলী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২১; মুহাম্মদ আব্দুর রউফ,মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন,ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৯;

৩. ১৭৬৪ সালে মীর কাসিম ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধ বক্সার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হন। এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭; মেসবাহুল হক, *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩

১7৯৩ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক গ্রাম্য পুলিশ প্রথা রহিতকরণের ফলে হাজার হাজার মুসলমান বেকার হয়ে পড়ে।[৪] ১7৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের ফলে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ছয় শত বছরের প্রতিষ্ঠিত জমিদারি শাসনের রূপান্তরঘটে। পুরাতন হিন্দু ও মুসলমানদের জমিদারি চলে যায় নব্য হিন্দু বিত্তবানদের অধীনে। ১7৯৩ সালে যেখানে জমিদারির সংখ্যা ছিল ৩১৭ টি সেখানে ১৮৭২-৭৩ সালে বাংলা ও বিহারে মোট ৩৮টি জেলায় জমিদারের সংখ্যা দাঁড়ায়১,৫৪,২০০ জন; যাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের।[৫]

১৮০০ সালে ইংরেজ সরকার 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গকে ব্রিটিশ সরকার নিয়োগ প্রদান করে নির্দেশ দেয় যে,পাঠ্যবইয়ে কোনো আরবি, ফার্সি এবং তুর্কি শব্দবলি থাকবে না।[৬]১৮৩৫সালে টমাস বেরিংটন মেকলের পরামর্শে আইন প্রণীত হয় যে, কেবল ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, অন্য প্রতিষ্ঠান নয়।[৭] এমনিতেই শুরু থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের চরম অনাগ্রহ ছিল। এমতাবস্থায় নতুন শিক্ষা নীতি প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের শিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। তাদের পরিচালিত সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এর সাথে অনেক শিক্ষক, মৌলবি, মুন্‌শী চাকরি হারিয়ে চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হন। ১৮২৮ সালে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন প্রবর্তিত হয়, ১৮৩৭ সালে আকস্মিক ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে আদালতের ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৮]ফলে তখনকার দিনে মুসলিম চাকুরিজীবী, উকিল ও দলিল-দস্তাবেজ লেখকগণ চাকুরি হারায়। যারা ফার্সি ভাষায় তাদের কার্যাবলি পরিচালনা করতো ইংরেজি ভাষা না জানাতে তারা বেকার হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৮৪৪ সালে চাকুরির নিয়োগে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন[৯] এবং ১৮৪৭ সালের বাজেয়াপ্ত আইন (Resumption Act) প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে ১7৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে সমস্ত মুসলমান জমিদার অবশিষ্ট ছিলেন তাঁরাও তাঁদের জমিদারি হারান। কোম্পানি সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মুসলমানসমাজ সামরিক বাহিনী ও বিচার প্রশাসনে নিয়োগ লাভের একচেটিয়া অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়।এভাবে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় একপর্যায়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে তারা দেশিও বিদেশিসাহেবদের চাপরাশি,

---

৪.ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১; এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
৫.ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১
৬.দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, নাসির হেলাল (সম্পা.), *মুন্‌সী মেহেরউল্লা জীবন ও কর্ম*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৯
৭.এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২
৮.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩; দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ,নাসির হেলাল (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০
৯.দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

দপ্তরি, খানসামা প্রভৃতি অধস্তন শ্রেণিতে পরিণত হয়। নতুন ব্যবস্থাপনায় অনেক মুসলমান জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনেসমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের খালাসী, টেনটল, সারেং এবং কৃষিজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়।[১০]এভাবে বেকারত্ব, দারিদ্রের করালগ্রাসে নিপতিত হয়। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণেকুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধতা মুসলমানদের গ্রাস করতে থাকে। আলোচ্য অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসনামলেউনিশ শতকে বাংলার মুসলমানসমাজের অবস্থার একটি সাধারণ পর্যালোচনা উপস্থাপনেরপ্রয়াস নেয়া হয়েছে।

১.ক. অর্থনৈতিক অবস্থা

মুঘল আমলের প্রারম্ভে সামন্ততান্ত্রিক বাংলায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে 'বারভূঁইয়া'[১১] খ্যাত জমিদারদের প্রাধান ছিল। আর এই ভূঁইয়াদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সম্রাট আকবর বারভূঁইয়াদের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে বিজয়ে ব্যর্থ হলেও তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬১১ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার জমিদাররা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক পরাস্ত অনেক জমিদার তাঁদের জমিদারি সম্রাটকে জায়গীরস্বরূপ প্রদানের বিনিময়ে পুনরায় ভূ-সম্পত্তি লাভ করলে বাংলার সিংহভাগ জমিদারি মুসলমানদের অধীনস্ত থাকে।[১২] অবশ্য মুর্শিদকুলী খানের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে মুসলমান জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন হিন্দু বৃহৎ জমিদারি প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন।[১৩]তাঁর প্রবর্তিত 'মাল জামিনী'[১৪] প্রথা প্রবর্তন পুরাতন জমিদার শ্রেণির আধিপত্য খর্ব করে নতুন জমিদার শ্রেণির জন্ম দেয়; যারা 'রাজা', 'মহারাজ' প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়া রাজস্ব সংগ্রাহক ইজারাদার হিসেবে তিনি শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুদের নিয়োগ প্রদান করতেন।প্রথা অনুযায়ী উচ্চ সরকারি চাকুরিতে উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের নিয়োগ প্রদানের পরিবর্তে তিনি বাঙালি হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা তাঁর উত্তরসূরি নবাবগণ অনুসরণ করেছিলেন।[১৫]মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম সময়ে শাসক শ্রেণির দুর্বলতার কারণে সমগ্র ভারতব্যাপী এক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক

১০.দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০

১১.বার শব্দের অর্থ ১২ এবং ভুঁইয়া অর্থ জমির মালিক। অর্থাৎ 'বারভুঁইয়ার' অর্থ ১২ জন জমির মালিক বা জমিদার। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় এদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরা হলেন : ১. ঈশা খাঁ- খিজিরপুর; ২. প্রতাপাদিত্য- যশোহর; ৩. চাঁদ রায়, কেদার রায়-বিক্রমপুর; ৪. কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়- চন্দ্রদ্বীপ; ৫. লক্ষ্মণ মাণিক্য- ভুলুয়া; ৬. মুকুন্দরাম রায়- ভূষণা; ৭. ফজল গাজী ও চাঁদ গাজী-ভাওয়াল; ৮. বীর হাম্বীর- বিষ্ণুপুর; ৯. কংসনারায়ণ- তাহিরপুর; ১০. রামকৃষ্ণ- সাতৈর; ১১. পীতাম্বর ও নীলাম্বর- পুঁটিয়া ও ১২. ঈশা খাঁ লোহানী ও ওসমান খাঁ- উড়িষ্যা ও হিজলী।

১২.সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস* (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮

১৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৪.'মাল জামিনী' শব্দটি ফারসি শব্দ 'মাল' ও 'জামিন' হতে উদ্ভূত। 'মাল' শব্দের অর্থ যে কোন ধরনের সম্পত্তি; যা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশেষত ভূমি রাজস্বকে বোঝাত এবং 'জামিন' রাজস্ব বা ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা বা জমিদারকে বোঝাত। অতএব 'মাল জামিনী' হল রাজস্ব পরিশোধের নিশ্চয়তা বা জামিনদারি।

১৫.আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭

অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শাসন বিভাগের কর্মচারী, আমীর-ওমরা, সুবাদার, জায়গিরদার, জমিদার, তালুকদারদের প্রশাসনিক দুর্বলতার সাথে সাথে তাদের চারিত্রিক দুর্বলতাও প্রকট হয়ে উঠে। দেশের বৃহৎ সেনাবাহিনী ধ্বংসের সাথে সাথে তারা সর্বত্র লুণ্ঠন ও উৎপীড়নে মত্ত হয়।[১৬] ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশি শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস তাঁর'Future Results of British Rule in India' প্রবন্ধে বলেছেন,

> মুঘল সাম্রাজ্যের যারা প্রতিনিধি ছিল, তারাই ক্ষমতার লোভে সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধ্বংস করে ফেলে। এসব প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ধ্বংস হয় মারাঠাদের হাতে। মারাঠা শক্তি খর্ব হয় আফগানদের দ্বারা, এভাবে সবাই যখন পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ব্রিটিশ শক্তি ক্ষিপ্রগতিতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে এবং সহজে দুর্বল শক্তিগুলোকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখলে সক্ষম হয়।[১৭]

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করে ব্রিটিশ শক্তির বিজয়ের ফলে বেনিয়ার জাত হিসেবে খ্যাত ইংরেজরা এদেশের শাসনভার কুক্ষিগত করে। পরের ধারাবাহিক পটভূমি হল- এদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র একের পর এক তাদের অধীনস্ত হতে থাকে। ১৭৬৫ সালে তাঁরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে এবং বাংলার শাসক মীরজাফরের নিকট থেকে ইংরেজ গভর্নর লর্ড ক্লাইভ উৎকোচ হিসেবে গ্রহণ করেন দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড।[১৮]১৭৬৪-৬৫ সালে মীরজাফর বাংলা হতে রাজস্ব আদায় করেন ৮,১৭,৫৫৩ পাউন্ড।[১৯] ১৭৬৫ সালের পর ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার নবাবকে প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে ভাতা হিসেবে প্রদান করা হত ৫৩,৮৬,০০০ টাকা; যা ১৭৭০ সালে পরিমাণ কমে ৩২,০০,০০০ টাকা এবং ১৭৭২ সালে মাত্র ১৬,০০,০০০ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়। মূলত এভাবে নবাবদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের পাশাপাশি আয়ের পথকে রুদ্ধ করা হয়। ফলে সমাজে নবাবদের সাথে সাথে বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণির কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয় এবং তাঁদের আভিজাত্যের অহংকার ভূলুণ্ঠিত হয়। কারণ সে সময় মুসলমানগণ দেশের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন এবং শাসন ব্যবস্থা তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হত। উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেছেন, মুসলিম শাসনামলে দেশের অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের তিনটি স্রোতধারা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সিন্দুকে স্থায়ীভাবে জমা ছিল। এগুলো হচ্ছে- সৈন্য বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ এবং বিচারবিভাগ।

মুসলমানদের আয়ের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল সৈন্য বিভাগ; যেখানে তাঁদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পরিবর্তিত অবস্থায় নবাব মীরজাফর নিজে ৮০ হাজার

১৬.মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১

১৭.K. Marx and F. ENGELS, *On Colonialism,* Moscow, 1954,p. 85.

১৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১৯. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

সৈন্যকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর পুত্র নাজিমউদ্দৌলা ইংরেজদের নিকট হতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে ঠিক যত সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন ঠিক তত সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন।[২০] ফলে বাংলা ও বিহারে মুসলমান সৈন্যদের এক বিরাট অংশ চাকুরি হারিয়ে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়ে। এছাড়া নবাব মীরজাফর নবাবী লাভের নজরানা হিসেবে ইংরেজ কর্মচারীদের উৎকোচ প্রদান করেন ৩০ লক্ষ পাউন্ড ।[২১] ১৭৬৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে জানা যায়, ১৭৫৭ হতে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা ও বিহার হতে গ্রহণকৃত উৎকোচের মোট পরিমাণ ৯ কোটি টাকা। ১৭৫৭ হতে ১৭৭১ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা বাংলার জনগণের নিকট হতে বিভিন্ন খাতে মোট ২,৯৪,৮২,৯১৩ পাউন্ড গ্রহণ করেন।[২২]১৭৬৫-৬৬ সালে কোম্পানি বাংলা হতে রাজস্ব আদায় করে ১৬,৮১,৪২৭ পাউণ্ডপাউন্ড ।[২৩]১৭৭২ সালে 'সিলেক্ট কমিটি' বাংলা হতে ব্রিটিশদের প্রদেয় উৎকোচের এক হিসাব বিবরণী প্রদান করে যার মোট পরিমাণ ছিল ১২,৫০,০০০ পাউন্ড । বাংলার নবাব মীরজাফরকেই এ অর্থ প্রদান করতে হয়েছে।[২৪] এভাবে বাংলা হতে ইংরেজদের এ সর্বগ্রাসী লুণ্ঠনের সহায়তাকারী ছিলেন এদেশেরই চাটুকার গোমস্তা, বেনিয়া, দালাল, মুৎসুদ্দিগণ; যারা পরবর্তীকালে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদেরকে জমিদাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং সাধারণ প্রজাদের মধ্যে অত্যাচারের বিভীষিকাময় পরিবেশ সঞ্চার করেছিল।[২৫]

বাংলা হতে ব্রিটিশ কোম্পানি অধিকর্তাদের উৎকোচ গ্রহণ ও বর্ধিত রাজস্ব আদায়ের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ১৭৭০ সালে বাংলায়নেমে আসে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষে মানুষ খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা ও মাঠের ঘাস খেয়ে জীবন ধারণের চেষ্টা করে এবং জীবিত মানুষ মৃত মানুষের গোস্ত খেতে শুরু করে।[২৬] এ দুর্ভিক্ষের তীব্রতা সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার তাঁর Annals of Rural Bengal গ্রন্থে বলেছেন, "১৭৭০ সালের মে মাস শেষ হওয়ার আগেই বাংলার মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। জুন মাসে প্রতি ষোল জনের ছয়জন মারা গিয়েছিল বলে ধরা হয়"।[২৭]অথচ এ বছর বাংলায় রাজস্ব আদায়ের কমতি পরিলক্ষিত হয়নি। ১৭৭২ সালের ৩ নভেম্বর ওয়ারেন হেস্টিংস বিলাতের

২০.Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856),* Dacca, 1977, pp. 35-36.
২১.মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪
২২.ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী(১৭৫৭-১৮০০)*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২১
২৩.এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬
২৪.Azizur Rahman Mallick,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫; বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, ঢাকা, ভাদ্র ১৩৮১, পৃ. ৩৪
২৫.মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪
২৬.ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *পল্লি বাংলার ইতিহাস* (ওসমান গণি অনূদিত), ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ২৩
২৭.উদ্ধৃত; প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

ডিরেক্টর বোর্ডকে অবহিত করেন যে, দুর্ভিক্ষে এ প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশের বেশি লোক মারা গেছে; তাদের চাষাবাদের খুব ক্ষতি হয়েছে; এ অবস্থা সত্ত্বেও ১৭৭১ সালে আদায়কৃত রাজস্ব ১৭৬৮ সালের রাজস্ব হতে অনেক বেশি হয়েছে।[২৮] তথ্যসূত্র মতে,১৭৭০-৭১ সলে বাংলা এবং বিহারে প্রকট দুর্ভিক্ষের প্রথম ছয় মাসে আদায়কৃত রাজস্ব পূর্ববর্তী বছর আপেক্ষা ছয় লক্ষ টাকা বেশি হয়েছিল এবং পরবর্তী বছরে আদায় হয়েছিল চৌদ্দ লক্ষ টাকা।[২৯] 'বোর্ড অব রেভিনিউ' কর্তৃক প্রদত্ত চার বছরের (১৭৬৮-১৭৭২) রাজস্ব আদায়ের বিবরণী নিম্নরূপ:[৩০]

সারণি-০১

সাল	টাকার পরিমাণ
১৭৬৮-৬৯	**১,৫২,৫৪,৮৫৬ টাকা**
১৭৬৯-৭০	**১,৩১,৪৯,১৪৮ টাকা**
১৭৭০-৭১	**১,৪০,০৬,০৩০ টাকা**
১৭৭১-৭২	**১,৫৩,৩৩,৬৬০ টাকা**

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার মুসলমান: ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা[৩১] প্রবর্তনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হয়। মূলত এ ব্যবস্থায় সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভূমি রাজস্বের নিশ্চয়তা বিধান। তাছাড়া জমিদারদের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ নিরাপদ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ বলে বিবেচিত হত।[৩২]এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, এ সময় বাংলা ও বিহারে মোট জমিদারির সংখ্যা ছিল ১,১০,৪৫৬ টি।[৩৩]এর মধ্যে ৯৭,৬৯৫ জন জমিদারের জমির পরিমাণ ছিল ৫০০ একরের নীচে, ১২,৩০৫ জনের ৫০০ থেকে ২০,০০০ একরের মধ্যে এবং ৪৫৭ জন জমিদারের জমির পরিমাণ ছিল

২৮.এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

২৯.Azizur Rahman Mallick, *op.cit.*, p. 33

৩০.এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬, গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড) (প্রাচীন ও মধ্য যুগ)*,মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৭, পৃ. ১৬৬

৩১.চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস প্রশাসন কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার ভূমি মালিকদের (সকল শ্রেণির জমিদার ও স্বতন্ত্র তালুকদারদের) মধ্যে সম্পাদিত একটি স্থায়ী চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় জমিদার উপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী হন। জমির স্বত্বাধিকারী হওয়া ছাড়াও জমিদারগণ স্বত্বাধিকারের সুবিধার সাথে চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় এক নির্ধারিত হারের রাজস্বে জমিদারিস্বত্ব লাভ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা সম্পর্কে সবিস্তার তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation, 1790–1819*, Bangla Academy, Dacca, 1979; সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩২.সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)*, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১

৩৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২০,০০০ একরের উপরে।[৩৪] ১৭৯০-৯১ সালে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যা হতে কোম্পানির আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল ২,৬৮০,০০০ পাউণ্ড; যা মুর্শিদকুলী খানের সময়ে ধার্যকৃত রাজস্বের দুইগুণ এবং নবাব মীরজাফর কর্তৃক ১৭৬৪-৬৫ সালে আদায়কৃত রাজস্বের তিনগুণ।[৩৫] ১৭৯৩ হতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বাংলার কয়েকটি জেলায় ভূমির খাজনা বৃদ্ধির হার ছিল নিম্নরূপ:[৩৬]

সারণি-০২

স্থান	বৃদ্ধির হার	স্থান	বৃদ্ধির হার
বর্ধমান	১.৫ গুণ	নদীয়া	১.৮ গুণ
মেদিনীপুর	১.৭ "	মুর্শিদাবাদ	১.৬ "
হুগলী	১.৫ "	দিনাজপুর	১.২ "
চব্বিশ পরগণা	১.৮ "	————	————

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং মুসলমানগণ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়,

> মুসলমান আমলে রাজস্ব আদায়ে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং ইহা হতে তাদের প্রচুর অর্থ সমাগম হত। পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন কর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাংলার মুসলমানদের আর্থিক জীবনে তীব্র আঘাত করে।[৩৭]

অন্যদিকে,নতুন ব্যবস্থায় নব্য ধনী হিন্দু সমাজের একাংশ জমিদার শ্রেণিতে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সুপ্রীম সরকারের অধীনস্থ সদস্য মেটকেফ মন্তব্য করেন,

> এ নীতি হচ্ছে অন্যায়-অবিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, কোনো দেশেই এরকম নীতির নজির নেই; যেখানে সমস্ত জমিজমা যাদের প্রাপ্য তাদেরকে না দিয়ে এক গোষ্ঠী বাবুর হস্তে তুলে দেয়া হয়। যে সব বাবুরা নানা দুর্নীতি ও উৎকোচের আশ্রয় নিয়ে দেশের ধনসম্পত্তি চুষে খেতে চায়।[৩৮]

এ প্রসঙ্গে জেমস ও কেনেলী মন্তব্য করেছেন,যে সকল হিন্দু কর্মচারী পূর্বে রাজস্ব বিভাগের সামান্য পদে ছিল, এ বন্দোবস্তে তারাজমিদার পদে উন্নীত হয়, তাদেরকেজমির মালিকানা স্বত্ব এবং অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ অর্থ মুসলমানদের শাসনকালে মুসলমানদের হাতে আসত।[৩৯]

---

৩৪. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

৩৫. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮

৩৬.সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

৩৭.Sir William Wilson Hunter, *The Indian Musalmans,*London, 1871 উদ্ধৃতি এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯

৩৮. দ্রষ্টব্যAzizur Rahman Mallick, *op.cit.*, p. 39

প্রাপ্ত তথ্য থেকেজানা যায় যে,এ সময় জমিদাররা ইংরেজ সরকারকে বাৎসরিক রাজস্ব প্রদান করতেন ৩৭,৫০,০০০ পাউন্ড । কিন্তু কৃষকদের নিকট হতে তারা খাজনা বাবদ আদায় করতেন ১,৩০,০০,০০০ পাউন্ড ।[৪০]ফলে অচিরেই জমিদারদের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠতা জন্মে; যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে স্তিমিত করে। ইংরেজ গভর্নর উইলিয়ামবেন্টিংক এর উক্তিতে বিষয়টির সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন,

> আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ বা গণ-বিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। অন্যান্য বহু দিক দিয়ে এমনকি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও, এর ফলে এমন একটি বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণি সৃষ্টি হল, যারা এদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল ছিল এবং জনগণের উপর যাদের অখণ্ড প্রভূত্ব বজায় রইল।[৪১]

এছাড়া গভর্নর লর্ড কর্নওয়ালিশইজমিদারদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই জমিদারদের আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে। যারা একটি লাভজনক ভূ-সম্পত্তি পরম আরামে ও নিশ্চিন্ত মনে ভোগ-দখল করবে, তাদের মনে পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা জাগতেই পারে না"।[৪২] অন্যদিকে, দেশীয় জমিদার শ্রেণির ইংরেজ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎকালীন জমিদার সংঘের সভাপতি ময়মনসিংহের মহারাজার উক্তিতে। তিনি বলেছেন, "শ্রেণি হিসেবে আমাদের (জমিদার শ্রেণির) অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে ইংরেজ শাসনকে সর্ববিষয়ে শক্তিশালী করে তোলা আমাদের কর্তব্য"।[৪৩]তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারকে আশ্বস্ত করে বঙ্গীয় জমিদার সংঘের (Bengal Land Holder's Association) সভাপতি বড়লাটকে বলেছিলেন,"মহামান্য বড়লাট বাহাদুর! আপনি জমিদারদের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারেন"।[৪৪] এভাবে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত জমিদার শ্রেণি অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইংরেজ প্রভূর জয়গান গেয়েছেন। মূলত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তিই ইংরেজ সরকারের প্রতি দেশীয় জমিদার শ্রেণির বশ্যতার মূল কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলাফল, ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অধিকাংশ জমিদারদের বিরোধিতা ও অসমর্থন। ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জমিদার

---

৩৯. উদ্ধৃতি M A Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal A.D. 1751-1947*, University of Dhaka, Dhaka, Second Ed. 2011. p. 36
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৪১. মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯
৪২. *ঐ*, পৃ. ১৮
৪৩. *ঐ*, পৃ. ২০
৪৪. *ঐ*, পৃ. ২০

শ্রেণির সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলার প্রখ্যাত বিপ্লববাদী সংগ্রামের নেতা হেমচন্দ্র কানুনগো বলেছেন, "এ কাজে (সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে) সরকারের ছোট-বড় কর্মচারীদের মধ্যে এমনকি পুলিশের কাছেও সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু জমিদার শ্রেণির মধ্যে সবচেয়ে কম সাড়া পেয়েছি"।[৪৫]

আর এ জমিদার শ্রেণির সিংহ ভাগ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং কৃষকদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান শ্রেণির।[৪৬] ১৭৯৩ সালে জমিদারির সংখ্যা ৩১৭টি থাকলেও ১৮৮৫ সালে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৫৫০টি। ইছামতী থেকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত জমিদারিগুলোর মালিকানা ছিল যথাক্রমে হিন্দু ৩,৮৫৫টি (৮৫%), মুসলমান ৬৪৩টি (১৪%) এবং ইউরোপীয়ান ৫২টি (১%)[৪৭]। এক্ষেত্রে মুসলমান জমিদারির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে উত্তরাধিকারী আইনের ফলে এগুলো ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে; অন্যদিকে হিন্দুদের জমিদারির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলার জমিদার ও কৃষক শ্রেণি : বাংলার কৃষক সম্প্রদায় ও জমিদার শ্রেণির মধ্যে সুসম্পর্কের ইতিহাস দুর্লভ। দেশীয় জমিদাররা প্রজাদের নিকট হতে বিভিন্ন অজুহাতে সব সময় বিভিন্ন প্রকার খাজনা আদায় করতেন। খাজনা অনাদায়ে কৃষকদের উপর নেমে আসত অমানুষিক অত্যাচার। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী ব্রিটিশ সরকার তিন কোটির এক দশমাংশ হিসেবে ৩০ লক্ষ টাকার অধিক জমিদাররা কৃষকদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে না বলে নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হতে আদায় করতেন ৩ কোটি টাকা। কারও কারও মতে, ১৭/ ১৮ কোটি টাকা; আবার কারও মতে ৩০ কোটি টাকা।[৪৮]।উনিশ শতকে জমিদারদের অবৈধ করারোপের চিত্র পাওয়া যায় তৎকালীন সম্বাদ কৌমুদী ও হিন্দু প্যাট্রিয়টপত্রিকার বিভিন্ন রিপোর্টে। ১৪ রকমের কর জমার তথ্য পাওয়া যায় পত্রিকাগুলোর রিপোর্টে।[৪৯] এভাবে জমিদারগণ কর্তৃক খাজনা ও বিভিন্ন প্রকার করের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি বঙ্গীয় কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে। গবেষণায় জানা যায়, ব্রিটিশ ভারতে একজন কৃষকের বাৎসরিক গড় আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮ থেকে ৪২ টাকা।[৫০]কিন্তু ট্যাক্স, খাজনা ও মহাজনের ঋণ বা ঋণের সুদ পরিশোধের পর কৃষকের নিকট অবশিষ্ট থাকত মাত্র ১৩ থেকে ১৭ টাকা। আয়ের এ এক-তৃতীয়াংশ অর্থ দিয়ে কৃষকের সমস্ত বছর জীবন-

---

৪৫. মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১
৪৬.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
৪৭.ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১
৪৮.মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩
৪৯.সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ (প্রথম খণ্ড)*, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৩৩
৫০.মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

যাপনের খরচ নির্বাহ করতে হত। ফলে শেষ পর্যন্ত কৃষক শ্রেণি যাদের বেশির ভাগ ছিল মুসলমান তারা মহাজনের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন কোনে পথ থাকত না।অধিকাংশ কৃষককে মহাজনের ঋণের উপর নির্ভর করে বাঁচতে হত। মহাজনের ঋণের সুদের হার ছিল প্রতিটাকায় ১ আনা ৬ পয়সা; যা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলত।[৫১] সুদের হার বৃদ্ধির একপর্যায়ে মহাজনের নিকট কৃষকের বন্ধকি জমি স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতে হত। ফলে চাষীপরিণত হত বর্গাচাষী অথবা দিনমজুরে। মূলত ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধিই ছিল চাষীদের দূরবস্থার মূল কারণ। জমিদারগণ কর্তৃক ধার্যকৃত বিভিন্ন প্রকারের খাজনা ছাড়াও মুঘল আমলের শেষ দিকে ভূমি রাজস্বের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৮,১৮,০০০ পাউন্ডে; যা ১৭৬৪-৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,৭০,০০০ পাউন্ডে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০,৯১,০০০ পাউন্ডে। ১৮০০-০১ সালে মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪,২০,০০০ পাউন্ডে, ১৮৫৭-৫৮ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১,৫৩,০০,০০০ পাউন্ডে, ১৯০০-০১ সালে এর পরিমাণ ছিল ১,৭৫,০০,০০০ পাউন্ডেএবং ১৯৩৬-৩৭ সালে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,৩৯,০০,০০০ পাউন্ডে ।[৫২] উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে জমিদার শ্রেণি কর্তৃক ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির একটি অন্যতম অপকৌশল ছিল যে, জমির খাজনা না বাড়িয়েও কৃষকদের ভূমি জরিপ করে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অধিক খাজনা আরোপ। অর্থাৎ পূর্বে যেখানে ভূমি পরিমাপের নলের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে ২৩ থেকে পৌনে চব্বিশ ইঞ্চি, কিন্তু পরে তারা জমি পরিমাপ করতে শুরু করে ১৮ ইঞ্চি নলের দ্বারা।[৫৩] ছোট মাপের নল বা মাপকাঠি দ্বারা অল্প জমিকে বেশি দেখিয়ে উদ্বৃত্ত জমিতে নতুন খাজনা আরোপ করা হত। ১৮৫৬ সালে যশোরের নড়াইল মহকুমার জমিদার রামরতন রায় এ পন্থায় ভূমি জরিপের পর খাজনা ২/৩ গুণ বৃদ্ধি করেন।[৫৪]। ১৮৩৩ সালে যশোরে অনুসন্ধানরত অফিসার এম. ফুনিকেন (M. Funicane) মন্তব্য করেন, "তথাকথিত জমি জরিপ খাজনা বৃদ্ধির কৌশল ছাড়া আর কিছু না" ।[৫৫] এভাবে জমিদার শ্রেণি কৃষকদের নিকট হতে অধিক হারে খাজনা আরোপ ও আদায়ের পর সরকারের নির্দিষ্ট অংশ

৫১. মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ৪৭
৫২. *ঐ*, পৃ. ৪৭-৪৮
৫৩ *ঐ*, পৃ. ৩৪
৫৪. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০
৫৫. *ঐ*

প্রদানের পরে অবশিষ্ট বৃহৎ অংশ কুক্ষিগত করত। ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব হতে প্রাপ্ত সরকারের আয়ের একটি পরিসংখ্যান এখানে উল্লিখিত হলো-[৫৬]

সারণি-০৪

বৎসর	রাজস্ব (টাকায়)	বৎসর	রাজস্ব (টাকায়)
১৮৭৫-৭৬	৩,৪৫,৫৫,৯২৯	১৮৭৮-৭৯	৩,৭৫,২৩,৫২৬
১৮৭৬-৭৭	৩,৬৭,২৭,৩৪১	১৮৭৯-৮০	৩,৭২,২৪,৩৪১
১৮৭৭-৭৮	৩,৬৮,৫৪,৯২৫	————	————

তবে খাজনা বৃদ্ধির পশ্চাতে জমিদাররা কতগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন; যেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- ক. জমিদার শ্রেণির জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় খরচ বৃদ্ধি পায়; খ. জমিদারদের পরিবার বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়; গ. নতুন সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়; ঘ. জমিদারি পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পায়; ঙ. জমিদারদের মামলা-মোকাদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সেই অনুপাতে খরচ বৃদ্ধি পায়; চ. জমিদারদের উপর আয়কর, রোডসেস, পাব্লিক ওয়ার্কসেস, চৌকিদারি ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর আরোপিত হয়েছিল।[৫৭]

খাজনা বৃদ্ধির পক্ষে যে যুক্তই দেখানো হোক না কেন, সার্বিক বিচারে দেখা যায় যে, এটি ছিল জমিদারদের প্রাত্যহিক কর্মের অংশ।আর এ বর্ধিত খাজনা আরোপের প্রতিক্রিয়ায় অচিরেই জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলায় বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।[৫৮]এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শান্তিপুরের তাঁতীদের বিদ্রোহ, মেদিনীপুরের মলঙ্গীদের (লবণ প্রস্তুতকারী) বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুর ও দিনাজপুরে 'কৃষক বিদ্রোহ', বাঁকুড়ায় 'প্রজা বিদ্রোহ', উত্তর বঙ্গে 'সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ', ১৮৩৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরের 'পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ', গারো পাহাড়ের 'হাজং বিদ্রোহ' ফরিদপুরের ফরায়েজী আন্দোলন ইত্যাদি।[৫৯]

লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও বাংলার মুসলমান : প্রাচীনকাল থেকেভারতবর্ষের শাসকগণ সাধারণ মানুষের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে লাখেরাজ সম্পত্তি মঞ্জুর করতেন। শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি পূজা-অর্চনার জন্যও তাঁরা

৫৬. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০
৫৭. ঐ, পৃ. ২৪
৫৮. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৮
৫৯. ঐ

নিষ্কর ভূমি প্রদান করতেন।[৬০] শাসকবর্গ অনেক কর্মচারী এবং বহু আলেম, ধার্মিক ব্যক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেও লাখেরাজ সম্পত্তি দান করতেন। দায়িত্বপূর্ণ অফিসারদেরকে তাঁদের চাকরির ভাতাস্বরূপ এবং কর্মক্ষমতা, সততা এবং অন্যান্য অতিরিক্ত গুণাবলির ভিত্তিতে লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করা হত। শুধু মুসলমানদের জন্য এ সময় ১৫ প্রকার আয়কর মওকুফের মঞ্জুরি ছিল। এছাড়া হিন্দুদের জন্য তিন প্রকার এবং নয় প্রকার ছিল দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য। ঐতিহাসিক বুকাননের ভাষায়,"বিহার ও পাটনা জেলায় একুশ প্রকার ভূমি কর মওকুফের ব্যবস্থা ছিল"।[৬১] শাসকগণ কর্তৃক কর্মচারীদের প্রদানকৃত ভূমিকে 'জায়গীর' বা 'আল-তামগাহ' এবং আলেম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ভূমিকে বলা হত 'তাহা আরমাহ্' ও 'মাদাদ-ই-মা'শ'।[৬২] এ বিষয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

মূলত প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তি প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। সমগ্র প্রকার নিষ্কর সম্পত্তিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হত। যথা- ক. আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর্মের নিমিত্তে নিষ্কর ভূমি, যেমন- নানকর, চাকরান, পাইকান, ঘাটোয়ালি ইত্যাদি; খ. গ্রামের বিবিধ পেশাদারী মানুষের সেবামূলক কর্মের প্রয়োজনে নিষ্কর সম্পত্তি যেমন- কুম্ভকার, কর্মকার, চর্মকার, নাপিত, হাকিম প্রভৃতি; গ. ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্তে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি যেমন- ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, আইমা, মাদাদিমাস, ওয়াকফ, বৃত্তি, মহত্তরান, মিল্লাকি প্রভৃতি।[৬৩] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকর্তৃক বাংলায় দেওয়ানি লাভের পর এ সকল নিষ্কর ভূমির উপর ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। লাখেরাজ সম্পত্তির পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, সরকার এক-চতুর্থাংশ ভূমি রাজস্ব হতে বঞ্চিত হতে থাকে।[৬৪]ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম এ জাতীয় ভূমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে তৎপর হন।[৬৫] ১৭৭৮ সালে সরকারকে প্রদানকৃত'আমিনি কমিশন'–এর এক রিপোর্টে ঘোষণা করে, বাংলার জমিদারগণ সরকারের অজ্ঞতার সুযোগে বহু জমি নিষ্কর বন্দোবস্ত দিয়েছেন। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৩ টি জেলায় মোট ২৯,৩৬,০০৮ বিঘা নিষ্কর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।[৬৬] কমিশন লাখেরাজ সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও এ প্রথার প্রসার রোধকল্পে সুপারিশ প্রদান করলে ১৭৮২ ও ১৭৮৩ সালে এ উদ্দেশ্যে সরকার একটি আইন পাশ করে।১৭৮৯ সালে

---

৬০. Azizur Rahman Mallick,*op.cit,*p.40
৬১.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
৬২.এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯
৬৩.সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩
৬৪.এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯; Azizur Rahman Mallick, *op.cit,*p.41
৬৫.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯; সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩
৬৬.সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ জন শোরের মাধ্যমে লাখেরাজ সম্পত্তি অধিগ্রহণপূর্বক সরকারের ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ সালের অধিগ্রহণ রেগুলেশনে দশ বিঘার বেশি জমি ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্টের পর (অর্থাৎ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর) লাখেরাজ বন্দোবস্ত হয়ে থাকলে তা অধিগ্রহণ ও করধার্যের আওতায় আনা হয়।[৬৭] এছাড়া আইনের ১৭ নম্বর এবং ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী করমুক্ত ভূমির ভোগদখলকারীদেরকে এক বছরের মধ্যে কালেক্টরেট অফিসে তাদের ভূমি মঞ্জুরি রেজিস্ট্রি করিয়ে নেবার নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৬৮]নিষ্কর ভূমির মালিকগণ যদি ভূমি রেজিস্ট্রি না করেন তবে রেজিস্ট্রিহীন দলিল-দস্তাবেজ কোর্টে গৃহীত হবে না এবং তাঁরা ভূমির স্বত্বাধিকার হতে বঞ্চিত হবেন বলেও নির্দেশনামায় বলা হয়। এছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রি না করলে কালেক্টরগণ যে কোন সাধারণ কোর্টে লাখেরাজদারদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।মামলায় কালেক্টরগণ বিজয়ী হলে প্রাপ্ত ভূমির প্রথম বছরের আয়কর থেকে তাঁদের শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও সরকারের এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে অধিকাংশ কালেক্টরগণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কালেক্টরগণের পক্ষে ভূমি রেজিস্ট্রির সমস্ত কর্ম সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শুধু বর্ধমান জেলায় ৭২,০০০ রেজিস্ট্রকর্মের মধ্যে মাত্র ৪/৫ হাজার রেজিস্ট্র সুসম্পন্ন হয়, বাকিগুলো কোর্টে হস্তান্তর করা হয়।[৬৯] মূলত আইনে কালেক্টরদের জন্য কোনটি বৈধ ও কোনটি অবৈধ তা স্থির করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল না। ফলে কালেক্টরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমিশনের জন্য নিষ্কর ভূমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত করার পক্ষপাতি ছিল। এভাবে কালেক্টরদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ফলে সরকারের ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং লাখেরাজদারদের উপর অযথা চাপ বৃদ্ধি পায়।সরকারের প্রত্যক্ষ তৎপরতায় অনেক লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হয় এবং খাস জমির ভোগদখলকারীদের নায্য রাজস্বের ৫০ শতাংশ হারে পুনরায় তাদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।[৭০]এ প্রসঙ্গে ১৮৩৯ সালের ৭ ডিসেম্বর*সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় বলা হয়,"গভর্নমেন্ট নিশ্চয় করেছেন যে উত্তরকালে কোন নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হলে তার উপস্বত্বের অর্ধেকের অধিক কর বসান যাবে না"।[৭১] ফলে অচিরেই সরকারের ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

৬৭.সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

৬৮.Azizur Rahman Mallick,*op.cit*,p.41; এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০

৬৯.*Ibid*

৭০.সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

৭১.উদ্ধৃত,সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

তাছাড়া ১৮২৮ সালের ১৯ জুন একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যারা লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে সরকারকে সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারবে তারা নির্দিষ্ট হারে কমিশনপ্রাপ্ত হবে।[৭২] উল্লেখ্য, এ কমিশন পূর্বে কালেক্টরগণরা প্রাপ্ত হতেন। ফলে তথ্য সংগ্রহকারীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য লাখেরাজদারদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে এবং সমাজে উৎকোচ ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। এভাবে ১৭৯৩ হতে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার লাখেরাজদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে থাকে। এর বিষময় ফল বাংলার মুসলিম সমাজের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। লাখেরাজ আইন প্রয়োগের ফলে বাংলার মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।[৭৩] উল্লেখ্য যে, এ আইনের ফলে বাংলার কোনো কোনো জেলায় শতকরা ৯৮ জনের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হয়। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে ১৮৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত সরকারের বাৎসরিক আয় হয়েছিল ৩৭,৯৮,৫০৯ টাকা এবং শেষ পর্যন্ত আর্থিক ফলাফলে দেখা যায় চার বছরে আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেকাংশে কম হয়েছে।[৭৪] উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, এ আয়ের অংকের একটি বৃহৎ অংশ মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হতে এসেছে।[৭৫] ১৮২৮ হতে ১৮৫১ সালের মধ্যে বাংলা ও বিহারে মিথ্যা সাক্ষী, তথ্য সংগ্রহকারী, নিষ্ঠুর পুনঃগ্রহণ অফিসার এবং নানা প্রকার ত্রুটিপূর্ণ কর্মে দেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এ কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে কোম্পানি সরকারের প্রবর্তিত রাজস্ব পুনঃপ্রবর্তন আইনের অরাজকতায় বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে তুলনামূলক বিচারে মুসলিম সমাজের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক অনেক বেশি। আগেই বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা মুসলিম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেস করে অভিজাত মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়েছিল।[৭৬]সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজের উপর এই ব্যবস্থার ফল ছিল মারাত্মক ক্ষতিকর। কেননা এই লাখেরাজ সম্পত্তি কেবল তাঁদের জীবিকা নির্বাহেরই মাধ্যম ছিল না, এর সাথে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আরও বিভিন্ন বিষয় জড়িত ছিল। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের ফলে শত শত মুসলমান পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং যে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিষ্কর ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হত তা ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ব্রিটিশসরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপের ফলে

৭২.Azizur Rahman Mallick,*op.cit*,p.44; এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১

৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪; মেসবাহুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪; মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৯৮৫-১৯২১)*, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৭৫. Azizur Rahman Mallick,*op.cit*,p. 52

৭৬. *Ibid*, p.53

মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়; এবং তাদের ঐশ্বর্যের উপর একের পর এক আঘাত আসতে থাকে। তারা সরকারি চাকুরি এবং এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা থেকে বিচ্যুত হয়। ফলে মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় পতিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে এক দুর্দশাগ্রস্ত ও পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত হয়। W.W. Hunterএরবক্তব্যেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। Hunterতাঁর সুবিখ্যাত *The Indian Musalmans*গ্রন্থে বলেছেন, "একশো সত্তর বছর আগে একজন বাঙালি মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, আর আজ তার পক্ষে ধনী হিসেবে টিকে থাকাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৭৭] হান্টারের এই বক্তব্য থেকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের ফলে বাংলার মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

সরকরি চাকুরি ও বাংলার মুসলমানঃ মুগল শাসকদের সময় বঙ্গে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানদের ধন-দৌলতের প্রধান দুটি উৎস ছিল সেনা ও দেওয়ানি বিভাগ; যেখানে ছিল তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।[৭৮] তাদের আয়ের তৃতীয় উৎস ছিল বিচার ও শাসন বিভাগে বেসামরিক চাকুরি। মুসলমান কালেক্টররা খাজনা তহসিল করতেন, ফৌজদার ও কোতয়ালরা পুলিশ বিভাগে কর্তৃত্ব করতেন।[৭৯] মুর্শিদাবাদ নাজিমের রাজপ্রাসাদের সদরে এবং সারা প্রদেশময় একদল মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারী ফৌজদারি আদালতে বিচারকার্য করতেন। এছাড়া কাজী অথবা মুসলমান আইনজ্ঞরা দেওয়ানি আদালতে বিচার করতেন। ইসলামী বিধি-ব্যবস্থায় এদেশের আইন-কানুন ছিল এবং সরকারি অফিসসমূহ মুসলমানদের অধীনে ছিল।[৮০] কারণ তারাই সরকারি ভাষা ফারসি লালন করতেন এবং ফারসি ভাষায় লেখা সরকারি নথিপত্র একমাত্র তারাই পড়তে পারতেন। কিন্তু ১৮৩৭ সালে সরকার কর্তৃক অফিস আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষার প্রচলন বাংলার মুসলমানদের উপর এক চরম আঘাত হানে।[৮১] কারণ কিছুটা জাত্যাভিমান এবং অধিকন্তু সুযোগের অভাবে তারা এতদিন ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দেননি। অন্যদিকে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় অনায়াসে ইংরেজিকে স্বাগত জানায় এবং ভাষাটি রপ্ত করে নেয়। ফলে রাজভাষা পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ দেশীয় হিন্দুরা চাকুরি ক্ষেত্রে প্রবেশের এক অবারিত সুযোগ লাভ করেন এবং দলে দলে বিভিন্ন সরকারি

---

৭৭. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* (আবদুল মওদুদ অনূদিত), ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৫৩
৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০
৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০
৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১
৮১. Azizur Rahman Mallick,*op.cit*,p. 54

অফিস-আদালতে প্রধান্য বিস্তার করেন। উল্লেখ্য যে, সরকারি চাকুরি তথা কোর্ট-কাছারিতে সাধারণ চাকুরির ক্ষেত্রে ইংরেজিতে দক্ষ ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল আরও আগেই ১৮২৬ সাল হতে।[৮২]এক দশক পর ১৮৩৭ সালে দাপ্তরিক ভাষা পরিবর্তনের ফলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। ইংরেজি ভাষা না জানায় মুসলমানদের সরকারি দপ্তরের চাকুরিতে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। মুসলিম সমাজের উপর এর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল উইলিয়াম হান্টারের বক্তব্যে সে কথাটিও জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।হান্টার উল্লেখ করেছেন যে,দশ বছর আগেও নাযীরের পদে কেবল মুসলমানদের আধিপত্য থাকলেও ভাষার পরিবর্তনের ফলে আজকাল জেলখানার দু'একটি সাধারণ চাকুরি ছাড়া ভারতের সাবেক ভাগ্যবিধাতাদের অদৃষ্টে আর কিছুই জোটে না।[৮৩]সরকারি অফিসের কেরানিগিরি, আদালতের দায়িত্বসম্পন্ন পদ, পুলিশের উচ্চবিভাগ, সরকারি স্কুলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যমী হিন্দু যুবকরাই চাকুরি লাভ করতে থাকে।[৮৪]১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী সরকারি চাকুরির সকল বিভাগেই ইংরেজিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের নির্দেশ প্রদান করা হয়।এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের চাকুরি লাভের সুযোগ আরও রুদ্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৮৪৫ হতে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় মুসলমানদের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ১৮৫৩ হতে ১৮৫৫ সাল ও এর পরবর্তী সময়ের চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকাতেও মুসলমানদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[৮৫]বস্তুত এই সময়কালে চাকুরির পরীক্ষার মান এত উঁচু ছিল যে, মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষা নিয়ে এসব পরীক্ষায় এবং চাকুরির প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হওয়া মুসলমানদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। ১৮৫১-১৮৫২ সালে চাকুরি লাভকারী ৭৭ জনের একটি তালিকায় মুসলমান ছিলেন মাত্র একজন।[৮৬]ঐ বছরে হুগলি কলেজের একটি চাকুরির তালিকাতেও মুসলমানদের নাম পাওয়া যায়নি।

অবশ্য ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করার পরও কয়েক বছর কয়েকটি বিভাগে মুসলমানদের উপস্থিতি দেখা যায়। একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮৫১ সালে মুসলমান উকিলের সংখ্যা হিন্দু ও ইউরোপীয় উকিলদের সম্মিলিত সংখ্যার সমান ছিল। তবে অচিরেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ১৮৫২ হতে ১৮৬৮ সালর মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয়কে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়; যাদের

---

৮২. Azizur Rahman Mallick, *op.cit,* p. 54(পাদটীকা-১)
৮৩. উইলিয়াম হান্টার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২
৮৪. *ঐ*, পৃ. ১৬২
৮৫. Azizur Rahman Mallick, *op.cit,*p. 56
৮৬. *Ibid*

মধ্যে হিন্দু ছিল ২৩৯ জন এবং মুসলমান ছিল মাত্র একজন। সরকারি অফিসসমূহে কদাচিৎ মুসলমান চাকরিজীবীর সাক্ষাৎ মিলত। সরকারি ভাষার পরিবর্তনে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "ইংরেজ শাসকদের এই ব্যবস্থার ফলে সরকারি চাকুরি প্রার্থীদের জন্য ইংরেজি জানার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তখনও সরকার ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া কোন আদেশ জারী করে নাই"।[৮৭]

১৮৬৪ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা আশা পোষণ করতেন যে, আরবি ও ফারসি শিক্ষা তাদের সরকারি চাকুরিতে ও আইন পেশায় প্রবেশে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। কারণ তখনও মুন্সেফগিরি ও ওকালতি পরীক্ষা উর্দু ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সম্পন্ন হত। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এক বছর পর সরকার এ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাকে পরীক্ষার মাধ্যমরূপে প্রবর্তন করে। ফলে প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থায় মুসলমানরা একচেটিয়াভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন,"মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার পূর্বেই সরকারি অফিসের দ্বার তাহাদের জন্য রুদ্ধ হয়"।[৮৮] ১৮৫৬-১৮৫৭ সালে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরিতে অথবা তারও উপরে আইন আদালত এবং রাজস্ব বিভাগের চাকুরিতে ৩৩৬ জন লোক নিযুক্ত করা হয়; যাদের মধ্যে মুসলমান ছিল ৫৪ জন, ৯ জন ছিল ইউরোপীয় এবং বাকি ২৭৩ জন ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। সরকারি চাকুরির অন্যান্য বিভাগেও মুসলমানদের অবস্থা সংকটজনক ছিল। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত সরকার পরিচালিত মেডিকেল কলেজের ৪৯ জন সহকারী সার্জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল মুসলমান। শিক্ষার অন্যান্য বিভাগের ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা একই প্রকার ছিল। তবে মাদ্রাসায় আরবি ও ফারসি শিক্ষার জন্য কিছু সংখ্যক মুসলমান চাকুরিতে নিয়োজিত ছিল। এভাবে ১৮৫৬ সালের দিকে সরকারি চাকুরির সমস্ত ক্ষেত্রে মুসলমানদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।[৮৯] তবে এ ক্ষেত্রে সরকারি ভাষারূপে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজির প্রচলনকে মুখ্য কারণরূপে দায়ি করা যায়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন,"ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি রাজভাষা করার পর হতে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের দুরবস্থা শুরু হয়। মিশনারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকগণ দলে দলে সরকারি অফিসে প্রবেশ করে। মিশনারি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষা মুসলমানদের মনঃপুত হয় নাই। এ জন্য তাহারা সরকারি অফিসে ঢুকতে পারে নাই। কয়েকটি নিম্নতম পদে তাহারা প্রবেশ করিতে পারিত; কিন্তু সেখানেও দিন দিন তাহাদের

---

৮৭. উদ্ধৃত, এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
৮৮. উদ্ধৃত, এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ৫৭-৫৮
৮৯. Azizur Rahman Mallick,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

সংখ্যা হ্রাস পায়”।[৯০]যথাক্রমে ১৮৬৭ ও ১৯০৩ সালে বাংলায় ১,৫০০ টাকা ও তার ঊর্ধ্বে উচ্চ পদে চাকুরির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের অবস্থান ছিল এরূপ:[৯১]

সারণি-০৫

সাল	মোট পদ	ইউরোপীয়ান	হিন্দু	মুসলমান
১৮৬৭	২১৮২	২০৪৮ (৯৩.৮%)	৯৯ (৪.৫%)	৩৫ (১.৬%)
১৯০৩	৩৮৬০	৩২৫৪ (৮৪.৩%)	৫০৮ (১৩.১%)	৯৮ (২.৬%)

উইলিয়াম হান্টার এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, “একশ বছর পূর্বে যে জাতির সরকারে ছিল একচেটিয়া অধিকার, আজ শাসনবিভাগের সকল স্তরেই তাদের আনুপাতিক সংখ্যা তেইশ ভাগের একভাগেরও কম হয়ে গেছে”।[৯২]মূলত সরকারই বাংলার মুসলমানদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ প্রদানে অনাগ্রহী ছিল।[৯৩]তাই চুক্তিবদ্ধ সরকারি চাকুরি ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি চাকুরি উভয় ক্ষেত্রেই বাঙালি মুসলমানদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। কারণ আবদুল লতিফের ভাষায়:

> ...in the beginning too much attention was directed to distinction of birth without proper test of educational qualifications and latterly the scale seems to have turned to the other extremity ...under either system the Mahomedans of Bengal proper have failed to obtain any share of the public patronage[৯৪].

১৮৮৭ সালে বিচার বিভাগে মুসলমানদের অবস্থা ছিল৩৭৫০ জন; তার মধ্যে ৫৩৯ জন ছিলেন ইউরোপীয়ান, ৩০৪৫ জন হিন্দু এবং মাত্র ১৬৬ জন ছিলেন মুসলমান।[৯৫] হিন্দুগণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[৯৬]সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়, “গত বিশ বৎসর যাবৎ মুসলমানগণ যোগ্যতা লইয়া চাকুরিতে ঢুকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন প্রত্যেক সরকারি চাকুরির দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখায় তাহাদের পক্ষে কোন অফিসে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে”।[৯৭]

---

৯০. উদ্ধৃত,এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮
৯১. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩
৯২. উইলিয়াম হান্টার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৪-৬৫
৯৩. মোঃ জহুরুল ইসলাম, *মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ: তাঁর জীবন ও কর্ম*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬৬
৯৪. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০
৯৫. শাহজাহান মনির,*বাংলা সাহিত্যে বাঙলী মুসলমানের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৩,পৃ. ১২
৯৬. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫
৯৭. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫),পঞ্চম খণ্ড*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৩,পৃ. ৮০-৮১

উপরের পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ শাসনাধীনে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বাংলার মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অবিশ্বাসের নীতি ছাড়াও এ দুরবস্থার মূলে অন্য যে সব কারণ ছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলমানদের: ক. ঐতিহ্যবাহী ভাষা ফারসির পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজি ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষারূপে প্রচলন। খ. ইংরেজি শিক্ষার যথার্থতা ও মর্ম অনুধাবনে মুসলমানদের ব্যর্থতা এবং ইংরেজি শিক্ষারপ্রতি বিমুখতা। গ.হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে মুসলমানদের নিয়োগ প্রশ্নেকঠোর বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র এবং ঘ. মুসলমানদের ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণের অনুকূল সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

খ. উনিশ শতকের বাংলায় সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও মুসলমান সমাজ

ভারতবর্ষ একটি বহু জাতি-ধর্ম অধ্যুষিত দেশ। ভারতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে দেশটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকগোষ্ঠী শাসিত ছিল। এরপর বহিরাগত ও বিভাষী মুসলিম সমাজ কর্তৃক তারা পরাভূত হয়। ভারতবর্ষ এক নতুন রাজশক্তির শাসনাধীনে আসে। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী কেবল ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে নয়, সংস্কৃতির দিক থেকেও স্থানীয় হিন্দুদের থেকে ভিন্ন ছিল। ফলে এই দুই ধর্মাবলম্বীদের এক প্রকারের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। উনিশ শতকে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারতে বিশেষ করে বাংলায় সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়। এ সাংস্কৃতিক বিরোধ কেবল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এতে ব্রিটিশ রাজশক্তিও সংশ্লিষ্ট হয়।

স্মর্তব্য যে, শক্তি দ্বন্দ্বে হিন্দুসমাজ মুসলমানদের কাছে পরাভূত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেও উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বিরাজমান ছিল।তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন বহুত্ববাদে বিশ্বাসী বাংলা হিন্দুধর্মাবলম্বীরা মূর্তিপূজারি এবং তাদের যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাদ্য-বাজনার ব্যবহার করে। অন্যদিক একেশ্বরবাদী মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসমতে এসব কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৯৮] মুসলমানগণ গো-মাংস ভক্ষণ করে। তাদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহায় গরু কুরবানি করা অপরিহার্য। অন্যদিকে হিন্দুসমাজে গো-মাংস ভক্ষণ শুধু নিষিদ্ধ নয়, বরং গো-জাত তাদের নিকট ভগবতীরূপে পূজনীয়। কাজেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে গো-জবেহ ও গো-রক্ষার বিষয়টি একটি গুরুতর ও স্পর্শকাতর সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।[৯৯] উল্লেখ্য যে, এ

---

৯৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৫

৯৯. সুফিয়া আহমেদ,(অনু. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ),*বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় (১৮৮৪-১৯১২)*, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০২,পৃ. ১০১

সমস্যাটি কেবল বাংলা হিন্দু-মুসলমানদের সমস্যা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি সর্বভারতীয় সমস্যা। গো-হত্যা রোধে ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গো-হত্যা নিবারণী সভা' গঠন করে গো-রক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন।[১০০]১৮৯১ সালে সমিতি একটি সংঘের রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দু সমাজের গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ১৮৮৬ ও ১৮৮৯ সালে লাহোর, অম্বল, ফিরোজপুর ও দিল্লিতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।[১০১]১৮৮৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদারির রাজা শশী শেখরেশ্বর রায় গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার প্রয়াসে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য নোটিশ প্রদান করেন।[১০২]তাছাড়া তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গো-হত্যা নিবারণী প্রচারণা অব্যাহত থাকে। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল-

> গবর্ণমেন্টের যে গোবংশ রক্ষার জন্য চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক ও কর্তব্য তাহা আমরা গত কয়েক সপ্তাহে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। গবর্ণমেন্টেরও উচিৎ তাঁহারা আমাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন; কিন্তু তাঁহারা যদি আমাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করেনএবং সম্ভবত করিবেনও না-তাহা হইলে কি আমারা হিন্দু হইয়া চক্ষের উপর মাতৃসমা গাভীকে বিনষ্ট হইতে দেখিব? যদি কাহারও ধমনীতে এক বিন্দুও আর্য্য শোনিত থাকে, তবে অবশ্যই 'না' উত্তর পাওয়া যাইবে।[১০৩]।

পত্রিকাটিতে আরো বলা হয়-

> অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, বিশেষত ম্লেচ্ছ গবর্ণমেন্টের দয়ার উপর ত নির্ভর করা যাইতেই পারে না। গবর্ণমেন্ট গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা না করিলে যে গোহত্যা নিবারণ হইতে পারে না এমন নহে। ভারতে বিশ কোটি লোকের মধ্যে ১৫ কোটি হিন্দু এবং অবশিষ্ট মুসলমান ও অন্য জাতি। অন্য জাতির মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধগণ অহিংসা ধর্ম্ম পরায়ন এবং মুসলমানগণের অধিকাংশ গোজাতির ধ্বংস কামনা করেন না। এমন অবস্থায় আমরা যদ্যপি স্বয়ং চেষ্টা করিতে থাকি গোহত্যা ভারত হইতে নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইতে পারিবে। গোহত্যা নিবারণের উপায়ও বড় কঠিন নহে। তবে গোহত্যা নিবারণার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, উদ্যোগ যত্ন, পরিশ্রম ও একতা চাই। এই সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়, গোহত্যা নিবারণ ত সহজ কথা।[১০৪]

গো-রক্ষা আন্দোলনের ফলাফল তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এটি ভারতে বসবাসরত প্রধান দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি এবং মাঝে মধ্যে প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপে উসকানি প্রদান করে। এই আন্দোলন সম্পর্কে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাব মুসলমান সমাজকে মর্মাহত

---

১০০. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১
১০১. শাহজাহান মনির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮
১০২. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১
১০৩. উদ্ধৃত; মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
১০৪. উদ্ধৃত; *ঐ*. পৃ. ৩৪

করে এবং কংগ্রেস হতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার পথে সুস্পষ্ট ইন্ধন জোগায়।[১০৫] গো-হত্যা এবং এর প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনাবলী জনমানুষের মননকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে। গো-হত্যা এবং এর নিবারণ আন্দোলনকে প্রধান উপজীব্য করে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন-মীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক রচিত 'গো-কুল নির্মূল আশঙ্কা' (১২৫১ বঙ্গাব্দ), 'গো-জীবন' (১৯১১ খ্রি.), মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লার 'শ্লোকমালা', ফজলুর রহমানের 'গো-কোরবানী' (১৯১৪ খ্রি.), মোহাম্মদ মোহসেনুল্লাহর 'বুধির সুতা', আইনুল ইসলাম খন্দকারের 'গরু ও হিন্দু-মুসলমান' (১৯১১ খ্রি.) প্রভৃতি।[১০৬]

লক্ষণীয় যে, গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধ কেবল-হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুসলিম সমাজের কেউ কেউ হিন্দুদের দাবির প্রতি সমর্থন জানালে মুসলমানদের মধ্যেও মতান্তর দেখা দিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মীর মশাররফ হোসেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হিন্দু সমাজের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন গো-হত্যার বিরোধিতা করে 'গো-জীবন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করলে *আকবারে এসলামিয়া* সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক মৌলবি নঈমুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর বিরোধের ঘটনা ঘটে এবং বিতর্ক বাঁধে। এ বিতর্কের এক পর্যায়ে মীর মশাররফ হোসেন মৌলবিনঈমুদ্দীনের নামে মামলা করলে বাংলার মুসলমানদের রণতূর্যবাদক, অদ্বিতীয় বাগ্মী যশোরের মুন্‌শী মহম্মদ মেহেরউল্লা মৌলবি নঈমুদ্দীনের পক্ষে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা ও মামলার ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন।[১০৭]

মূলতহিন্দু-মুসলমান পৃথক ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনা ছাড়াও মুসলমানদের জাতিগত আভিজাত্য, হিন্দুদের আর্যাভিমান, মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য এবং হিন্দুদের ধনগর্ভ ও শিক্ষার অহংকার উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ ওসাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।[১০৮]নানা স্বার্থ সংঘাতকে কেন্দ্র করে এ বিরোধের গতি উনিশ শতকের শেষাবধি অগ্রসরায়মান ছিল। অবশ্যউনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে নতুন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত বাঙালি হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ নিবারণে তাঁদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। যদিও এতে তারা পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। লক্ষণীয় যে, এ ব্যর্থতার জন্যতারা পরস্পরকে দোষারোপ করেছেন।

---

১০৫. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২
১০৬. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৪
১০৭. ঐ, পৃ. ৪৩৩; মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, *মুন্‌সী মেহেরউল্লাজীবন ও কর্ম*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২
১০৮. এম. এ. রহিম,পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮; এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৩৩

শিক্ষাব্যবস্থা ও বাংলার মুসলমান:মুগল আমলে ভারতীয় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী ছিল। শিক্ষাগ্রহণকে তাঁরা ধর্ম-কর্মের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতেন। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাস ছিল শিক্ষা গ্রহণে আল্লাহর আরাধনা হয়। মুসলিম শাসকগণ ছিলেন শিক্ষার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের লাখেরাজ বা খাস সম্পত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে দান করতেন।[১০৯] দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার প্রয়োজনেও তাঁরা ভূমি দান করতেন।[১১০] ।হিন্দু-মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ভূসম্পত্তি দানেই টোল-মক্তব গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষানীতি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত টোল-মক্তবই ছিল বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান প্রতিষ্ঠান। ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মি. উইলভারসর্বপ্রথমভারতবর্ষেশিক্ষা ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।প্রস্তাবটি পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেও কোম্পানির কয়েকজন প্রশাসক বিশেষত ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৪) ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। কলকাতার মুসলমান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সরকারি অর্থে 'কলকাতা মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন।[১১১] উদ্দেশ্য ছিল,"to promote the study of the Arabic and Persian Languages and of Muhammadan Law, with a view more especially to the production of qualified officers for the Courts of Justice."[১১২]

১৭৮৫ সালে হেস্টিংস-এর সুপারিশক্রমে সরকার কলকাতা মাদ্রাসার বার্ষিক ২,৯০,০০০ টাকাঅনুদানের ব্যবস্থা করে।[১১৩]১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[১১৪] ১৭৯২ সালে কাশীর প্রশাসক জনাথন ডানকান বারাণসী 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন করেন।[১১৫]১৭৮৪ সালের জানুয়ারিতে স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্যে শিক্ষার উন্নয়নকল্পে কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৮০০ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'[১১৬] প্রতিষ্ঠা করেন।[১১৭]

---

১০৯. Azizur Rahman Mallick,*op.cit.* p. 40
১১০. এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদে ইতিহাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮
১১১. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫; সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭
১১২. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭
১১৩. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫
১১৪. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭
১১৫. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫; সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪
১১৬. 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নবনিযুক্ত ইউরোপীয় আমলাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধনই ছিল এ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৫ হতে ১৭ বছর বয়সী তরুণ নবাগত অফিসারদেরকে স্থানীয় ইতিহাস, ভাষা ও শাসন-শৈলী সম্পর্কে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান

তবে ব্রিটিশ শাসনামলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থাগুলো। ইংল্যাণ্ডের 'The Society for Promoting Christian Knowledge'নামক সংগঠনটি ১৭১৯ সালে ভারতে আসে এবং ১৭৩১ সালে কলকাতায় প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপন করে; যেটি ছিল ভারতবর্ষে স্থাপিত প্রথম পাশ্চাত্য স্কুল।[১১৮]এখানে বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়া হত। ১৭৮০ সালে মি.আর্চার ভারতে বালকদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে পরবর্তীতে বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হয়। এ সময়ে মি.ব্রাউন কলকাতায় অপর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ১৭৮৯ সালে'The Free School Society' নামে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। এ সকল স্কুলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। অবশ্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার এবং শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৭৮৭ সালে মি.ব্রাউন কলকাতায় 'Orphan Institute' এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অভিযোগে তিনি অপসারিত হন।[১১৯] ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ চার্লস গ্রান্ট[১২০] ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে কোম্পানির সহযোগিতা কামনা

করা হত না বরং ওয়েলেসলী ঔপনিবেশিক প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় নবাগত অফিসারদের প্রস্তুতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। এভাবে একটি ট্রেনিং সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা থেকেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কলেজে এক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি বিভাগে ছিলেন একজন অধ্যাপক ও কয়েকজন সহকারী শিক্ষক। আদালতের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ফারসি শিক্ষাদানের জন্য এখানে একটি বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন সরকারের একজন ফারসি অনুবাদক নেইল বি. এডমনস্টোন। সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিশারদ এইচ. টি. কোলব্রুক। বাংলাসহ ভারতের অনেক ভাষা বিশেষজ্ঞ ও ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরীকে স্থানীয় ভাষা বিভাগের প্রধান নিয়োগ করা হয়। সব কয়টি বিভাগে কয়েকজন পণ্ডিত ও মুন্সী ছিলেন। বাঙালী শিক্ষকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ভারতবর্ষে কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত চাঁদা এবং সরকারি ছাপাখানার আয়ের একটি অনির্ধারিত বরাদ্দ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের পরিকল্পনা করা হয়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে কলেজে মোট ১২ টি অনুষদ খোলা হয়। অনুষদ অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল কলেজ প্রশাসন পরিচালনা করত। শৃঙ্খলামূলক বিষয়গুলো দেখাশোনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল দু'জন যাজক, প্রভোস্ট ও ভাইস-প্রভোস্টের উপর। কলেজ প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল। লর্ড ওয়েলেসলী নিজে ছিলেন একজন উঁচু মানের বিদ্যান ব্যক্তি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন কলেজটি প্রাচ্যের অক্সফোর্ট এর মর্যাদায় উন্নীত হবে। বস্তুত কলেজটি দ্রুত প্রাচ্যের অক্সফোর্ট হয়ে উঠেছিল। ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২; দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১; সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলা* পিডিয়া (ষষ্ঠ খণ্ড), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০

১১৭. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫; শাহজাহান মনির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

১১৮.মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

১১৯. *ঐ*, পৃ. ৫

১২০. চার্লস গ্রান্ট একাধারে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র চেয়ারম্যান, পরিচালক, রাষ্ট্রনায়ক, প্রাচ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ১৭৬৭খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন এবং কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ গোমস্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে যান। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে 'কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স' এর পরিচালক এবং ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। 'ব্রিটিশ বাইবেল সোসাইটি', 'ফরেন বাইবেল সোসাইটি' এবং 'প্রপ্যাগেশন অব গসপেল অ্যান্ড চার্চ মিশনারী সোসাইটি'র মতো খ্রিস্টান সংস্থাগুলোর উন্নয়নে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি *Observation on theState of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain*- গ্রন্থটি রচনা করেন। চার্লস গ্রান্ট ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলা পিডিয়া (দশম খণ্ড)*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০১

করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি কর্তৃক তার আবেদন গৃহীত না হওয়ায় ১৭৯০ সালেস্বদেশে ফিরে যান। জন থমাস ভারতবর্ষে চিকিৎসার পাশাপাশি শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার করায় কেম্পানি সরকার তাঁকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করেন।[১২১]১৭৯৩ সালের অক্টোবরে জন থমাস, উইলিয়াম কেরি এবং চার্লস গ্রান্ট 'ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির সভ্যগণ ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ভারতবর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, কন্যা সন্তান হত্যা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার দূরীভূতকরণে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিকল্প নেই বলে তারা মত প্রকাশ করেছিলেন।[১২২]

১৭৯২ সালে চার্লস গ্রান্ট সরকারকে দু'টি প্রস্তাব প্রদান করেন-১. ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার এবং ২. ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন দ্বারা ভারতীয়দের হৃদয়ে 'আলো' ও 'জ্ঞান' বিকিরণের সুযোগ প্রদান।[১২৩] প্রস্তাব দু'টি কোম্পানি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এ অবস্থায় সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই আঠারো শতকের শেষ দশকে উইলিয়াম কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারিগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচারার্থে ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৮০০ সালে 'শ্রীরামপুর মিশন' প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে উইলিয়াম কেরি ১৭৯৪ সালে মালদহ জেলার সদনহাটি নীলকুঠিতে একটি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি শ্রীরামপুর মিশনারি সোসাইটিতে যোগদান করেন এবং সেখানে একটি ছাপাখানা স্থাপনপূর্বক *সমাচার দর্পণ* নামে প্রথম বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন।[১২৪] উনিশ শতকের সূচনাতে ইলার্টন নামক একজন নীলকর মালদহ জেলায় বেশ কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। ভারতবর্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত এ সময়কার ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং তিনি উইলিয়াম কেরিকে 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ'-এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।১৮১৩ সালে খ্রিস্টান মিশনারিদের জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার চার্টারে ভারতবর্ষের শিক্ষা খাতে এক লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানি কর্তৃক মিশনারি কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধকরণের নির্দেশ প্রদান করে।[১২৫] ১৮১৩ সাল নাগাদ খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতায় এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮১৪ সালে মে নামক একজন মিশনারি ওলন্দাজ উপনিবেশ চিনসুরায় একটি বিদ্যালয়সহ একই বছরে ১৬টি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি চিনসুরায় ২৬টি এবং অন্যত্র আরও ১০টি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১২৬]১৮১৫ সালে ভারতে ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড হেস্টিংস এ বিদ্যালয়গুলোর জন্য মাসিক ৬০০ টাকা হারে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

১২১. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫
১২২. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬
১২৩. *ঐ*, পৃ. ৬
১২৪. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২
১২৫. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬
১২৬. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তখ্রস্টান মিশনারি কর্তৃক ঢাকা, কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, চুচুঁড়া, যশোরসহ সমগ্র বাংলায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮০টি; যেখানে অধ্যায়নরত ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩,৩৪৭ জন।[১২৭]

এ সময় 'ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি' এবং 'চার্চ মিশনারী এসোসিয়েশন' এর উদ্যোগে কলকাতায় অনেকগুলো বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮১৭ সালে কলকাতার 'কলিকাতা স্কুল অব সোসাইটি'প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কয়েকজন ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিয়ে এর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়; যার উদ্দেশ্য স্বল্প খরচে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক, তথা খ্রিস্টধর্ম প্রচার সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করা। ১৮২১ সালে সরকার সংস্থাটির জন্য এককালীন ৭,০০০ টাকা এবং মাসিক ৫০০ টাকা হারে অনুদানের ব্যবস্থা করেন। একই বছরে সংস্থাটি প্রধানত প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ১,২৬,৪৪৬ কপি পুস্তক প্রকাশ করে।[১২৮] ১৮২১ সালে 'চার্চ মিশনারী এসোসিয়েশন' এর সহযোগিতায় মিসকুক কলকাতায় কয়েকটি বালিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২টিতে। ১৮২৫ সালে কলকাতায় সেন্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরামপুর মিশনারিদের চেষ্টায় বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য স্থানে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৩ সালে শ্রীরামপুর মিশনারিগণের উদ্যোগে ঢাকায় কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এর সংখ্যা ছিল ২৫ টি; যেখানে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১,৪১৪ জন।এসব বাংলা বিদ্যালয়ে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত পুস্তক পাঠ্যতালিকায় বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে মুসলমান ছাত্রদের এ সকল স্কুলের প্রতি নিরাসক্তি লক্ষ্য করা যায়।[১২৯]

মিশনারিগণ শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশীয় জনগণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করে। ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম থেকেই ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন ও ইংরেজি শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে। কলকাতার প্রভাবশালী হিন্দুদের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় এবং কোম্পানির সাথে হিন্দু ব্যবসায়ীরা যোগাযোগ স্থাপন করে। ১৮০০ সালে তাঁরা কলকাতার ভবানীপুরে এবং ১৮১৪ সালে ম্যাজিস্ট্রেট ফর্বিসের পৃষ্ঠপোষকতায় চিনসুরায় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে।[১৩০] ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দু নেতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ'[১৩১] প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড হেয়ার ও তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড

---

১২৭. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭

১২৮. এ.এফ. সালাউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ -চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা ২০০০,পৃ.২৫-২৮ ; এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

১২৯. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

১৩০. *ঐ*

১৩১. হিন্দু কলেজ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চবংশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদের ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাসমূহ, ইউরোপ এবং এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান ছিল কলেজটির প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর ও গোপীমোহন ঠাকুর উভয়েই কলেজ প্রতিষ্ঠায় দশ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজটি পাঠশালা ও কলেজ; এই দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল। পাঠশালায় ইংরেজি, বাংলা, ব্যাকরণ, পাটিগণিত এবং কলেজে ভাষা,

হাইউড হিন্দু কলেজে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করেন। এ কলেজে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়। মূলত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে কলেজটির জন্ম। রামজয় দত্ত, রামনারায়ণ মিশন, অনন্দীরাম দাস, রামলোচন ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ সময় বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩২] দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে কলকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানে বেশ কয়েকটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কয়েকটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৫-৩৬ সালে কলকাতা সংলগ্ন ২০টি ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল; যার ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,০০০ জন।[১৩৩] তবে এদের মধ্যে সম্ভবত কোনো মুসলিম ছাত্র ছিল না। এ সময় 'স্কুলবুক সোসাইটি' ও 'স্কুল সোসাইটি' বাঙালি হিন্দু সমাজের ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রামপ্রসাদ মিত্র, জয়নারায়ণ ঘোষ, মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রমুখ কোম্পানির বেনিয়ারা ছিলেন প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি।[১৩৪] ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইংরেজদের তুষ্ট করে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করাই ছিল ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায়ের ইংরেজি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এক পর্যায়ে কোম্পানি ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের স্বার্থ অভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণে তারা একসাথে কর্ম সম্পাদনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এক্ষেত্রে কবি 'হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়' এর ইংরেজ প্রভূর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রচিত কবিতার কয়েকটি চরণ উল্লেখ্য-

"না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ- কে শেখাতো, কে দেখাতো
কে বা পথে লয়ে যেতো
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জন।"

এ প্রসঙ্গে এম.এন. রায় বলেন, "It is a historical fact that a very large section of the Hindu community welcomed the advent of the English power."[১৩৫]

ইতিহাস, ভুগোল, ক্রনোলজি বা কালনিরূপণ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা প্রদান করা হত। উদ্বোধনী দিনে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০ জন; কিন্তু পরবর্তী তিন মাসে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৬৯ জনে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন প্রেসিডেন্সি কলেজ আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।এ.এফ. সালাউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ -চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন*,পৃ(www.banglapedio.org)

১৩২. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭; শাহজাহান মনির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

১৩৩. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

১৩৪. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭;এ.এফ. সালাউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮-৯

১৩৫. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭; হুমায়ুন আব্দুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৪

১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে বলা হয়,"প্রাচ্যের বদলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান প্রদান করা হবে এবং ভারতীয় কোন ভাষার পরিবর্তে ইংরেজিতে এ জ্ঞান দেওয়া হবে"।[১৩৬] সিদ্ধান্তটি বাংলার হিন্দুসমাজ আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলেও মুসলমানদের পক্ষে এটি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা, একটি নতুন ভাষার প্রচলন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি হিন্দুদের নিকট ছিল শুধুই প্রভূ-বদল।[১৩৭]অন্যদিকে, মুসলমানদের নিকট হতে ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক ক্ষমতা দখল, ১৮৩৭ সালে রাজকার্য পরিচালনায় ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, সবই ছিল মুসলমানদের জন্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ফলে তারা নতুন শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি। সরকারও এ ব্যাপারে মুসলমানদের উৎসাহিত করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে সরকারিপৃষ্ঠপোষকতা এবং হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের সমর্থনের অভাবে ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। এ চিত্র সর্বভারতীয় হলেও সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল বাংলার মুসলমানগণ। ডব্লিউ.ডব্লিউ. হান্টারের ভাষায়, এ প্রদেশের ঘটনাবলির সাথেই আমি বিশেষভাবে পরিচিত। তার ফলে আমি যতদূর জানি, তাতে করে ইংরেজ আমলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এখানকার মুসলমান অধিবাসীগণ।[১৩৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নতুন সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুসমাজের একনিষ্ঠভাবে ইংরেজি ভাষা গ্রহণ ছিল শুধুই ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি শেখা। অন্যদিকে, মুসলমানদের আরবি ও ফারসি ভাষা ত্যাগ করে ইংরেজি ভাষা গ্রহণের অর্থ ছিল সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে হারানো।[১৩৯] উল্লেখ্য যে, আরবি, ফারসি ভাষা মুসলমানদের ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। মুসলমান সন্তানদের বাল্যশিক্ষা শুরু হত আরবি অর্থাৎ পবিত্র কোরআন শিক্ষার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আরবি-ফারসি ভাষার মধ্যকার সাদৃশ্যের জন্য ফারসি ভাষাকে তাঁরা ধর্মীয় ভাষার মর্যাদায় শিখত। তদুপরি ফারসি ছিল মুসলমান শাসকদের ভাষা। মুসলিম শাসক কর্তৃক ভারতবর্ষ বিজয় এবং দীর্ঘদিনের শাসনের গৌরবময় ঐতিহ্যের সাথে ফারসি ভাষা নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। তাই মুসলমানদের নিকট ফারসি যেমন ছিল প্রিয় ভাষা তেমনি উক্ত ভাষা লালন করাকে অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার হিসেবে মনে করা হত।[১৪০] ভাষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের এ ধরনের

---

১৩৬. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

১৩৭. ঐ

১৩৮. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২

১৩৯. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫; ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০

১৪০. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

চিন্তাধারা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাঁদের অনীহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা সম্পর্কে স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, "মুসলমানদের নিকট ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হওয়ার অর্থ ছিল, তাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন বিদেশী ব্যবস্থার নিকট প্রতিরোধবিহীন আত্মসমর্পণ অথচ উচ্চমানের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও গুণগত গরিমার জন্য মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা একদা খ্যাতি অর্জন করেছিল। মুসলমানরা যদি তা করত তাহলে সে কাজটা স্বাভাবিক হতনা।"[১৪১]এ প্রসঙ্গে মুসলিম শিক্ষাবিদ আব্দুল করিম বলেন,

> মুসলমানেরা সময়ের এই পরিবর্তনের অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন, আমাদের শিক্ষা প্রণালিই শ্রেষ্ঠ। এই ভাবিয়া বাঙালি মুসলমানেরা প্রাচীন পন্থায় বিদ্যানুশীলন করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের উপযোগিতা হৃদয়াঙ্গম করিয়া প্রথম হইতেই ইংরেজি শিক্ষায় রত হইলেন। এই সময় হইতে বাঙলী মুসলমানেরা অর্থে ও প্রভাবে ক্রমশ হীন এবং হিন্দুরা উন্নত ও শক্তিশালী হইতে লাগিলেন।[১৪২]

বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,

> যে জাতির হাতে এক কালে রাজশক্তি ছিল, তারা পরাধীন হয়েও পরাধীনতার জোয়াল সহজে ঘাড়ে নিতে পারেনি। তারপর যারা নিজেদের রাজভাষা ফারসির ঝাণ্ডাবাহী ছিল, তারা বিদেশী ভাষা ইংরেজির নিকট সহজে মাথা নত করতে পারেনি। তার উপর তারা চোখের সামনে হিন্দু সমাজের ইংরেজি শিক্ষার কুফল দেখতে পাচ্ছিল। ফলে আধুনিক গৌরব এবং ধর্মের গৌরবের জন্যই মুসলমানের এ দুর্গতি হয়। এজন্য আমি মুসলমানকে নিন্দা না করে বরং প্রশংসাই করি।[১৪৩]

খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপের প্রতি সন্দেহ পোষণও মুসলমানদের পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহার অন্যতম কারণ ছিল। ভারতবর্ষে কোম্পানির আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এ মিশনারিদের শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। অর্থাৎ "To produce a change in the opinions on the fallacy of their religion"[১৪৪]. ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবিদার হলেন চার্লস গ্রান্ট। তাঁকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারিত হলে ব্রিটিশ সরকারের যে রাজনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি হবে; সে দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৪৫]তিনি বলেন,

---

১৪১. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

১৪২. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*,(ডক্টর মুস্তফা নূরউল উসলাম অনু:) বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ.৭-৯

১৪৩. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭ (তথ্যনির্দেশ)

১৪৪. *ঐ*, পৃ. ১২

১৪৫. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬

"ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতে এক শ্রেণির লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা রক্ত ও বর্ণে ভারতীয় থাকিবে, কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হইয়া পড়িবে।"[১৪৬]তিনি আরো বলেন, "প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান বিচ্ছুরিত হইলে হিন্দুধর্মের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িবে; যান্ত্রিক আবিষ্কারের জ্ঞানের আলোকে ভারতীয়গণ উদ্ভাসিতহইবে এবং ক্রমশ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের স্থলে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।"[১৪৭]

চার্লস গ্রান্টের প্রাচ্যশিক্ষার প্রতি ধারণা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল। প্রাচ্য শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন,"একটি ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক সেলফের বইয়ের মূল্য ভারতীয় ও আরবি সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল্যের সমান।"[১৪৮] ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে চার্লস গ্রান্ট তাঁর মাতাকে লিখেছিলেন,"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করি তাহা হইলে ত্রিশ বৎসর পরে ভারতবর্ষে কোন পৌত্তলিক থাকিবে না।"[১৪৯] মূলত কোম্পানির আমলে ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মূল কেন্দ্রস্বরূপ। ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন পৌত্তলিকতার অবসান হবে এবং খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার ঘটবে এমন চিন্তা অনেক ব্রিটিশ পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকের মধ্যে ছিল। প্রসঙ্গত মি.উইলভার ফোর্স-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি এমন কথাই বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।"[১৫০]

বাংলার মুসলমানদের পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাসক্তির আর একটি বিশেষ কারণ ছিল আর্থিক অসচ্ছলতা। আর্থিক অসঙ্গতি অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ হতে বঞ্চিত করে।ইংরেজ সরকার কর্তক প্রবর্তিত নতুন ভূমিব্যাবস্থায় মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এতে তারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এ আর্থিক দৈন্যদশা তাদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত করে। ডব্লিউ.ডব্লিউ. হান্টার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হবার পেছনে আর্থিক দূরবস্থাকে দায়ী করেছেন।[১৫১] রিপোর্ট প্রণয়নকারীগণ লক্ষ্য করেছেন সাধারণত স্কুলে ভর্তি হবার পূর্বে মুসলমান ছাত্রদের মসজিদভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ফলে সমবয়সী একজন হিন্দু ছাত্রের তুলনায় সে বিলম্বে স্কুলে ভর্তি হয়। অন্যদিকে, পিতা-মাতার আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তাকে হিন্দু ছাত্রের পূর্বে স্কুল ত্যাগ করতে হয়। এছাড়া মুসলমান অভিভাবকগণ

---

১৪৬. উদ্ধৃত, *ঐ*, পৃ. ১০৬
১৪৭. উদ্ধৃত, এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬
১৪৮. উদ্ধৃত *ঐ*, পৃ. ১০৬
১৪৯. উদ্ধৃত, পৃ. ১০৭
১৫০. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২
১৫১. *ঐ*, পৃ. ১৩

তাদেরসন্তানদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত, যাতে সন্তানটি শিক্ষিত হয়ে বড় কর্মকর্তা বা আধুনিক পেশার পরিবর্তে আপন সম্প্রদায়ের গুণীজনদের মাঝে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। হান্টার মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অনুসৃত ভূমি পুনরাধিকার মামলার কুফলকেও দায়ী করেছেন।[১৫২] বস্তুত এ বছর লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলে মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কারণ মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিষ্কর-লাখেরাজ সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর করে টিকে ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি বাঙালি মুসলমানদের এ শিক্ষা গ্রহণে পশ্চাদপদ করে রেখেছিল সত্য, তবে আর্থিক অসঙ্গতির বিষয়টি যে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে দায়ী ছিল একথা আনিসুজ্জামানও বলেছেন।তাঁর ভাষায়-

> "আর্থিক সঙ্গতির অভাবই বাঙলী মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এই সঙ্গতি ছিল বলেই যুক্তপ্রদেশের মুসলমানেরা এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন– ধর্মীয় গোঁড়ামি বা আত্মাভিমান বাঙলী মুসলমানের চাইতে তাঁদের কম ছিল না।[১৫৩]

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বাংলার মুসলমানদের বিমুখতার অপর একটি কারণ ছিল তৎকালীন মুসলিম উলেমাগণের ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিতকরণ। এ সময়কার মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাতেও একই ধরনের বিতর্ক অব্যাহত ছিল। তাছাড়া উনিশ শতকে বাংলার কয়েকজন সমাজ সংস্কারক যেমন-তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সুযোগ্য নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। তাঁরা আন্দোলনের স্বার্থে ঘোষণা করেছিলেন, যতদিন দেশ ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকবে ততদিন মুসলমানদের জন্য তা 'দারুল হরব' (শত্রু কবলিত দেশ) বলে গণ্য হবে।[১৫৪] ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে তাঁরা মুসলমানদের জন্য 'কুফরে কালাম' বা 'হারাম' এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা 'এলমে বেদিন' (যে বিদ্যা অর্জন অসিদ্ধ) বলে প্রচার করেন।[১৫৫]স্বভাবতই সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাব জন্ম নেয়। বাংলার মুসলিম পুনর্জাগরণের দিকপাল মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে, ইংরেজি পড়িলেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। পাক না-পাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাটো করিয়া নানাভাবে ছাঁটে, সাহেবি পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারেনা।[১৫৬]

---

১৫২. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

১৫৩. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬

১৫৪. Muin-ud-din Ahmed Khan,*History of the Fara'idi Movement.* Islamic Foundation, Bangladesh, Second Edition,October, 1984,p.151;ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪;মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩;মোশাররফ হোসেন খান,*সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪১

১৫৫. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪

১৫৬. উদ্ধৃত; মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানে সরকারও যে আন্তরিক ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্য।বস্তুত ব্রিটিশ শাসকগণ মুসলমানদের অবিশ্বাস করত। তাঁরা ধারণা পোষণ করত যে, মুসলমানদের শাসনক্ষমতা হতে বঞ্চিত করে তাঁরা শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং মুসলমানরা তাঁদের বিরোধিতা করবে এবং সুযোগে তাঁদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তাঁদের এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, হিন্দুগণ ভারতবর্ষের আদি জনগোষ্ঠী। সুতরাং হিন্দুদের বিভিন্নক্ষেত্রে উৎসাহদান ও বিশেষ সুবিধা প্রদান করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য। এভাবে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করত। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মুসলিম বিদ্বেষের উৎকৃষ্ট নমুনার প্রমাণ মেলে তৎকালীন বেঙ্গল সিভিলিয়ন 'Henry Harrington Thomas'-এর '*The Late Rebellion in India and our Future Policy*'নামক গ্রন্থে। এতে বলা হয়.

> In India the Mohammadans had other motives for seeking our destruction besides their rooted anti Christian feeling. They could not forget that they had been the masters of the Country for many generations and they never ceased to persuade themselves that if the British power were thoroughly destroyed, they would recover their lost position and once more lord it over the Hindus.[১৫৭]

এছাড়া ১৮৪৩ সালে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড এলিনবরা 'Duke of Wellington'-কে লিখেছিলেন,"I cannot close my eyes to the belief that the race (the Muslims) is fundamentally hostile to us and therefore our true policy is to conciliate the Hindus."[১৫৮]শিক্ষাক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিদ্বেষমূলক নীতির পরিচয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে ছাত্রবেতন কমাবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরকারি মন্তব্যে লেখা হয়– নিঃস্ব লোকের ও মজুরদের উপকারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। যে সকল লোক তাদের অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থা হতে উপকার পেতে পারে তাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবলমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের শিক্ষানীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।[১৫৯]

১৮৩৬ সালে মহসীন ফন্ডের টাকায় হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমসমাজেরশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মহসীন ফান্ডের টাকায় নির্মিত হুগলি কলেজেও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। সেখানে ইংরেজি বিভাগে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৩১ জন এবং অন্যদিকে হিন্দু ছাত্র ছিল ৯৪৮

---

১৫৭. উদ্ধৃত মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪
১৫৮. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,ঢাকা, জুন, ২০০৬, পৃ. ৩০
১৫৯. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১

জন।[১৬০]উল্লেখ্য যে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের অনাগ্রহ ছিল এ কথা যেমন সত্য, অন্যদিকে এটিও বাস্তবতা ছিল যে, তখনও তাদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল খুবই অপ্রতুল। স্মর্তব্য যে, মুসলমান শিক্ষার্থীদের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা মাদ্রাসাতেও ১৮২৯ সালের পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করা হত না। ইচ্ছা থাকলেও অনেকের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিমুখ মুসলমানরা তাদের সন্তানদের মিশনারি বা সরকারি স্কুলে প্রেরণ না করে দেশজ মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষা গ্রহণ করাতে থাকে।[১৬১]এ অবস্থায় সরকারের দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের ও মুসলমানদের আধুনিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার এর কোনোটিই করেনি। আর এ কারণেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষা বিশেষ করে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। ১৮৩৫ সালেWilliam Adam ভারতবর্ষের শিক্ষা বিষয়কএক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে ছিল। এতে বলা হয়, ১৮০১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের ধর্মীয় বিধান ও আইন শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ছিল ২০টি; কিন্তু মুসলমানদের আরবি-ফারসি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র ১টি। একই বছরে ময়মনসিংহ জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটিও প্রতিষ্ঠান ছিল না। অথচ এ জেলার প্রত্যেক পরগণায় হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৮০৮ সালে দিনাজপুর জেলায় মোট ৩০ লক্ষ লোকেরমধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ। অথচ মুসলমানদের লেখাপড়ার জন্য কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ঢাকা জেলায় হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও মুসলমানদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা রিপোর্টে উল্লেখ নেই। ত্রিপুরা জেলায়ও মুসলমানদের ধর্ম বা আইন শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৩৪ সালে রাজশাহীর নাটোর মহাকুমায় ৪৮৫ টি গ্রামে মোট জনসংখ্যা ছিল মুসলমান ১,২৯,৬৪০ জন এবং হিন্দু ৬৫,৬৫৫ জন।[১৬২] এ জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও হিন্দুদের ৩৮ টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩৯৭ জন হিন্দুছাত্র লেখাপড়া করত। জন এডামস এর তৃতীয় রিপোর্ট বিশ্লেষণে জানা যায়, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বাংলা পাঠশালাতে হিন্দু ছাত্র ছিল ১৯,৫৩১ জন, কিন্তু মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ১,০৮৩ জন।[১৬৩] উল্লেখিত এসব তথ্য পরিসংখ্যান থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে পশ্চাদপদতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

---

১৬০. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৬২. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১; ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

১৬৩. মুর্শিদাবাদে- হিন্দু ৯৯৮ ও মুসলমান ৬২, বর্ধমানে- হিন্দু ১২,৪০৮ ও মুসলমান ৭৬৯ এবং বীরভূমে- হিন্দু ৬,১২৫ ও মুসলমান ২৩২ জন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮

উপর্যুক্ত বাস্তবতার মধ্যেই ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ কর্তৃক এক প্রস্তাব অনুযায়ী সকল সরকারি নিয়োগে ইংরেজি ভাষা জ্ঞানসম্পন্নদের অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৬৪] এ সিদ্ধান্তটি ছিল বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের জন্য মারাত্মক। এর ফলে ইংরেজি ভাষা জ্ঞান না থাকায় মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকুরির দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। অন্য দিকে নতুন সিদ্ধান্তে হিন্দু সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। কারণ ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রচলন হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের জন্য ছিল অধিক সুবিধাজনক। সরকারি চাকুরিতে তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠিত হয়। সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের আরো বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করে। অন্যদিকে হিন্দুরা সঞ্চয় করে জ্ঞান, ধন ও মান। শিক্ষাবঞ্চিত মুসলমানরা সমাজে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

গ. বাংলার রাজনীতিমুসলমান ও মুসলমান সমাজ

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলা মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর বাংলায় মুসলিম শাসন বলবৎ ছিল। মুসলিম শাসনের সূচনাকাল থেকে গোটা ত্রয়োদশ শতকে বাংলা কখনো কখনো দিল্লি সালতানের অধীনতা মুক্ত থাকলেও সাধরণভাবে এটি ছিল দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন একটি প্রদেশ। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে বাংলা দিল্লি অধীনতা মুক্ত হয়ে স্বাধীন সালতানাতে পরিণত হয়। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে আংশিকভাবে এবং সতের শতকের শুরুর দিকে সম্পূর্ণরূপে বাংলা মুগল আগ্রাসনের শিকার হয়। এর মাধ্যমে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের অবসান ঘটে এবং এটি মুগল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে একটি সুবাহ বা প্রদেশে পরিণত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) মৃত্যুর পর মুগল কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলী খানের নেতৃত্বে বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনতঃ বাংলার নবাবগণ মুগল সম্রাটের সার্বভৌমত্বের অধীন হলেও নিজেদের শাসিত অঞ্চলে তাঁরা কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। তাই অনেকে নবাব শাসিত বাংলাকে স্বাধীন নবাবী বাংলা হিসেবেই গণ্য করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বঙ্গ-ভারতে কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনের ভীত রচিত হয়। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধেনবাব মীর কাসিমের পরাজয়ের ফলে ইংরেজ কোম্পানি শাসনের সূত্রপাত হয়। বঙ্গ-ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যাপ্তিকাল ছিল প্রায় দু'শ বছর। এর মধ্যে প্রথম একশ বছরের কাছাকাছি ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৮৫৮ খ্রি. পর্যন্ত) এবং অবশিষ্ট সময় ছিল ব্রিটিশ রাজশাসন।

১৬৪. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫; হুমায়ুন আব্দুল হাই, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

ব্রিটিশদের নিকট রাজক্ষমতা হারানোর ফলে শুরু থেকেই মুসলমানরা তাদেরকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে ব্রিটিশরাও মুসলমানদের আস্থায় নেওয়ার চেষ্টা করেনি। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সম্পর্ক বজায় থাকে। এ সময় বাংলার মুসলিম সমাজ ইংরেজ কোম্পানি শাসন উৎখাতের জন্য সশস্ত্র জিহাদী তৎপরতায় অবতীর্ণ হওয়ায় তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক আরো অবনতি ঘটে। ফলে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মুসলিম সমাজ অনেকটা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার বিস্তার ঘটে। সংস্কারাচ্ছন্ন ও জাত্যাভিমানী মুসলিম সমাজ এর মর্ম ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় তারা নতুন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকে। ফল স্বরূপ মুসলিম সমাজ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় যে নিয়মতান্ত্রিক পশ্চিমা ধাঁচের রাজনীতির বিকাশ ঘটেছিল, তার সাথে নিজেদের সংযোগ তৈরিতে ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে, বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় দ্রুততার সাথে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। কোম্পানি শাসনকে সাদরে গ্রহণের মাধ্যমে রাজপৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারাকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করে। পাশ্চাত্য ভাবধারায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বসমাজের মানুষদের জীবনমানের পরিবর্তনে প্রয়াসী হন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে তারা সংঘ রাজনীতির পথে ধাবিত হন। ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এবং ১৮৭৬ সালে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা তারই সাক্ষ্য বহন করে।[১৬৫]এ সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল বাংলার শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেরাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে নিজেদের ন্যায্য দাবি ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করা।

বাঙালি হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা গ্রহণের মাধ্যমে পশ্চিমা ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য যখন প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে অবতরণ করে, তখনও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক সচেতনতার কোনো লেশমাত্র চিহ্ন দেখা যায়নি। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক কোন প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেনি।[১৬৬]মুসলমান সমাজ এসময় তাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক কর্তৃত্বও অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য যে, মুঘল শাসকগণের পক্ষ থেকে কোম্পানির নবাগত গভর্নর জেনারেলকে 'খেলাত' প্রদানের একটি রীতি অনুসরণ

---

১৬৫. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩
১৬৬. ঐ, পৃ. ৫২

করা হত। বস্তুত, এটি ছিল ভারত সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ সূচক চিহ্ন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৮১৩) শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহের (১৮৩৬-১৮৩৭) নিকট হতে 'খেলাত' গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। সাথে সাথে ভারতে মুঘল সম্রাটগণের নামমাত্র সার্বভৌমত্বও বিলুপ্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৮৩৫ সালে ভারতীয় মুদ্রা হতে মুঘল সম্রাটের নাম প্রত্যাহার করত পূর্বতন প্রথা অনুযায়ী মুঘল সম্রাটগণকে অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনের রীতি বিলুপ্ত হয়[১৬৭]। ১৮৪৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির ঘোষণা অনুযায়ী সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের উত্তরসূরীগণকে 'বাদশা' উপাধি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং 'শাহ' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়।[১৬৮]

এরূপ প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলার জনগণ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে উজ্জীবিত হয়েছিল হারানো স্বাধীনতার গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই অংশ নিয়েছিলেন। তবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণের পেছনে তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। উভয়ের মধ্যে একটি অভিন্ন লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি শাসনের অবসান। তবে মুসলমানরা এর মাধ্যমে পূর্বতন শাসন ব্যবস্থা তথা মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখেছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ ছিল বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। এ বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ গবেষক শশীভূষণ চৌধুরী লিখেছেন,"সিপাহী যুদ্ধ একটি নবযুগের সূচনা করে যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে।"[১৬৯] বিদ্রোহী সিপাহী জনতা ১৮৫৭ সালের ১১ মে ৮২ বছর বয়স্ক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে এবং 'দসতুরুল আমাল' নামে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়।[১৭০] এ কারণে সিপাহী বিদ্রোহকে 'মহাবিদ্রোহ' এবং 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে অস্বীকার করা যায় না, এ বিদ্রোহ বাংলার জনগণকে জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণ ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল; যা তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথকে সুগম করে। তাছাড়া ১৮৫৭ সালের ৮ জুলাই লর্ড ক্যানিং আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘোষণা করলে ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ

---

১৬৭. রতনলাল চক্রবর্তী,*সিপাহিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬,পৃ. ৫

১৬৮. *ঐ*, পৃ. ১৪২

১৬৯. *ঐ*

১৭০. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান,*সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০০৭, পৃ. ১৮

থেকেভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।[১৭১]মহারাণী ঘোষণা করেন, "ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যোগ্যতানুসারে তাহাদিগকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করা হইবে এবং আইন প্রণয়নের কাজে তাহাদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে।"[১৭২]ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'ভারতের উৎকৃষ্টতম শাসন ব্যবস্থার নির্মাণ' (Act for the Better Government for India) প্রণীত হয় এবং ভারতের গভর্নর জেনারেল 'ভাইসরয়' উপাধি লাভ করেন। ভারত শাসনের জন্য একজন ভারত সচিবের (Secretary of state for India) নেতৃত্বে পনের সদস্যের একটি কাউন্সিল গঠিত হয়। লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬৫) ছিলেন ভারতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির' শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল এবং সর্বপ্রথম 'ভাইসরয়'।

ব্রিটিশ রাজকীয় ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৮৮৫ সালেসর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বৃহৎ প্রচেষ্টা। প্রকৃতিগতভাবে এটি ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্ধ্বে ওঠে সকলকে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত করা এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের কাছ থেকে ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায় করা সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল। অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বে হিন্দু একাধিপত্য এবং হিন্দুসমাজের স্বার্থ রক্ষায় সংগঠনটির অধিকমাত্রায় তৎপরতা ইত্যাদি নানা কারণে শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের একই সূত্রে গ্রথিত করতে ব্যর্থ হয়। অবশ্যকংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণপরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ১৭ জন, ১৮৯০ সালের অধিবেশনে ১৫ জন, ১৮৯৬ সালের অধিবেশনে ৩৯ জন, ১৯০১ সালের অধিবেশনে ৩৪ জন এবং ১৯০৬ সালের অধিবেশনে ২২ জন মুসলমান প্রতিনিধি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।[১৭৩]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত বাস্তবতায় মুসলিম মানসেও পরিবর্তন দেখা যায়। বাংলার মুসলমানদের সার্বিক সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের পথ নির্দেশক হিসেবে কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮), নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এসব মনীষী মুসলমানদের

---

১৭১. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭; মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১; শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১

১৭২. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭

১৭৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.১৫৫-১৬০

ভাগ্যোন্নয়নেরজন্য প্রথমত দু'টি পথনির্দেশ প্রদান করেন। যথা- ১. মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত করা ও ২. তাদের মধ্যে ইংরেজি তথা পশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করা। তাঁরা অনুধাবন করেন যে, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ণাই মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ। তাই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাঁদের মধ্যে নতুন ভাবধারা সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগামী করে তোলার নিরলস সাধনার মধ্য দিয়ে এক উন্নত জাতি গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা অনুধাবন করেন যে, ইংরেজি শিক্ষার বিকাশ ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পথ আরও উন্মুক্ত ও বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[১৭৪] এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপান্তরিতকরণের মানসে তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে স্যার সৈয়দ আহমদের ১৮৬৬ সালে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। এছাড়া শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৮৭৫ সালে 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' এবং 'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের জন্য ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' গঠন, সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার প্রত্যাশায় ১৮৭৭ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।[১৭৫]বাঙালি মুসলমান নেতাদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলীই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সৈয়দ আমীর আলীর উক্তিতে:"আমি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিপত্তি দেখতে পাই। এই জন্য আমি ১৮৭৭ সালে ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করি"।[১৭৬]

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। অসম্প্রদায়িক সংগঠন হলেও কংগ্রেসের কর্মতৎপরতার মধ্যে হিন্দুসমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের অতিশয় প্রয়াস দেখে মুসলিম সমাজের পূর্বোক্ত নেতৃবৃন্দ শুরু থেকেই কংগ্রেসের সংশ্রব এড়িয়ে চলেন। শুধু তাই নয়, তারা মুসলিম সমাজকেও কংগ্রেসের সাথে যুক্ত না হতে পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা স্যার সৈয়দ আহমদ গুরুত্বপূণভূমিকা পালন করেন। কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলিম সমাজকে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াসে ১৮৮৯ সালে'United Indian Defence Association' এবং'Muhammedan Anglo Oriental Defence Organisation of Upper India' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৮৬ সালে 'মোহামেডান এডুকেশন্যাল

১৭৪. জাফর আলম,*স্মরণীয় বরণীয়*,ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৯৯,পৃ. ৩৩
১৭৫. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮; জাফর আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১
১৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩; মোহাম্মদ আলী চৌধুরী,*মুসলিম বাংলার মনীষা*,ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ,দ্বিতীয় সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, পৃ. ৫৬

কনফারেন্স' ও ১৮৮৮ সালে 'মুসলমান ইন্ডিয়ান প্যাটরিওটিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন এবং ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে উত্তর ভারতের মুসলমানদের কর্তৃক 'মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এ সংগঠনগুলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো গ্রহণযোগ্য ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ছিল না, তথাপি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরিতে এসব সংগঠন বিশেষ অবদান রাখে।[১৭৭] যার চূড়ান্ত অর্জন হলো ১৯০৬ সালের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' গঠন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের তৎপরতায় মুসলিম সমাজ সাধারণভাবে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত না হলেও কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানদের কেউ কেউ কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেলোয়ার হোসেন, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল এবং আবুল কাসেম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে না হলেও দ্বিতীয়র্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজ ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা পূর্বসূরিদের ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি মনোভাব পরিহার পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে যুক্ত হন। পূর্বসূরিদের জঙ্গি মনোভাব ও তৎপরতা ত্যাগ করে ব্রিটিশদের সাথে আনুগত্যের রাজনীতি গ্রহণ করে নিজেদের সম্প্রদায়ের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

ঘ. ধর্ম ও মুসলমান সমাজ

বাংলা তথা ভারতবর্ষের তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনার প্রয়োজন। অতি প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বিদ্রোহ হতে ভারতে এক ধর্ম বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। এ বিপ্লবকে ধর্মের আবরণে সামাজিক অসন্তোষ এবং চিন্তার জগতে মুক্তবুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। বৈদিক ধর্মের জটিলতা, বাহ্যিক আড়ম্বর-সর্বস্ব ধর্মীয় বিধি, রক্তপাত, পুরোহিত শ্রেণির প্রাধান্য, ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞাদিপূর্ণ ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে সেই সময় ভারতে বেশ কয়েকটি ধর্মের উৎপত্তি ঘটে; যার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৭৮]মূলত দুর্বোধ্যশ্রেণি বৈষম্য প্রথা প্রভাবিত সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য শ্রেণির মানুষের ক্ষোভ ও আত্ম-সচেতনতা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের

---

১৭৭. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

১৭৮. অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৯

অভ্যুত্থানের সহায়ক হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের নাগপাশ হতে পুরোপুরি মুক্ত হতে না পেরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অনেকে পুনরায় পৌত্তলিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে। বাংলায় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল, উদার ধর্ম ইসলামের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতেদেখা যায়, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা ১,৭৬,০৯,১৩৫ এবং হিন্দুদের সংখ্যা ১,৮২,০০,৪৩৮। কিন্তু ১৮৮১ সালের পরিসংখ্যানে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা ১৫ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পায়।[১৭৯] মূলত এ হ্রাসবৃদ্ধি ধর্মান্তরিত হওয়ার ফল। এম. গ্রেসীন দ্যা তেসীর মতে,

> This change is attributed by some to the great simplicity of Islam for a country like India, where an idolatrous and allegorical religion, appealing to the senses and imagination rather than to the mind and heart, was prevalent.[১৮০]

মুগল আমলে ভারতবর্ষে পুরো সময়ব্যাপী ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ফলে এ সময় ইসলাম ধর্মের মধ্যে নানা বিকৃতরূপ পরিলক্ষিত হয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী হিন্দুধর্মের সঙ্গে পাশাপাশি সংস্পর্শের ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সকল ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার উপর ভিত্তি করে এ রূপ পরিগ্রহ করে।[১৮১]মুসলমানদের কোরআনের সঙ্গে এ রীতি-নীতির বিরোধ ছিল সুস্পষ্ট। বিধবা বিবাহ নামক হিন্দুসমাজে প্রচলিত প্রথাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, বিধবাবিবাহ দেওয়া বা করা নিতান্ত অবজ্ঞাজনক কাজ মনে করা হত। মহৎ ব্যক্তির সমাধিস্থলে অসংখ্য পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হত। দূরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তির আশায় পীর-দরবেশের সমধিস্থলে সিজদা করা, নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত করে সন্তান লাভের আশায় সমাধিকে স্পর্শ করে কান্নাকাটি করা ইত্যাদি কুসংস্কার বহুল প্রচলিত ছিল। এছাড়া হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন- সূফী-পীরপূজা, কবর পূজা, মানত মানা, দরগাহ বানান, তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা করা, মার্সিয়া গাওয়া, মনসা-শীতলার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া, যাত্রা-মেলায় অংশগ্রহণ, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, বিবাহাদিতে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা ইত্যাদি কুসংস্কার ও রীতিনীতি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। [১৮২]এসব আচরণ আজও বাংলার গ্রামীণমুসলমানদের মধ্য থেকে তিরোহিত হয়নি। এসব সংস্কৃতিতে কেবল যে প্রজারা জড়িত ছিল তা নয়,

---

১৭৯. ওয়াকিল আহমদ,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

১৮০. উদ্ধৃত,Azizur Rahman Mallick,*op.cit.* p. 1

১৮১. Azizur Rahman Mallick,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১

১৮২. Muhammad Mohar Ali,*History of the Muslims of Bengal*.Vol.I3,Imam Muhammad Bin Saud Islamic University, Riyadh,1985,p.803

বরং মুসলিম শাসকগণও আসক্ত ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর আরবি শাবান মাসের পূর্ণিমা রাত্রে তিনি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে রাখীবন্ধন-পার্বণ পালন করতেন। সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর দেওয়ালি পূজানুষ্ঠান করতেন। শিবরাত্রীতে তিনি একসঙ্গে আহার করবার নিমিত্তে যোগীদের নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁর রাজত্বের অষ্টম বছরে তিনি সিকান্দ্রার মসোলিয়ামে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করেছিলেন। নবাবী শাসনামলে মুর্শিদাবাদেরমোতিঝিল প্রাসাদে শাহ্মত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ সাত দিনব্যাপী 'হোলী' উৎসবের আয়োজন করতেন এবং মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সানন্দে 'হোলী' উৎসব পালন করতেন।[১৮৩] শুধু তাই নয়, মীরজাফরও হোলীতে অংশগ্রহণ করতেন এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দেবী কীটেশ্বরীর পাদোদক পান করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি। এছাড়া মুবারকউদ্দৌলা সাড়ম্বরে ভেলা ভাসানো পর্ব ও হোলী উৎসবের আয়োজন করতেন এবং আরও কয়েকটি অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড অভিজাত মুসলমানদের প্রিয় ছিল। শ্রীম্যান পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, মনোহর নাথের মন্দিরে হিন্দুদের মতো মুসলমানরাও পূজা-প্রার্থনা করতো।[১৮৪] পাঞ্জাবে বসন্ত রোগের দেবী 'দেবীমাতার পূজা' এবং ভারতবর্ষের অনুন্নত অঞ্চলে শীতলা দেবীর পূজায় সকল শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করত। ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলা হয় যারা হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়; তারা উভয় ধর্মানুসারী। এভাবে উনিশ শতকে মুসলমানরা ইসলাম ধর্ম হতে কত দূরে সরে গিয়েছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। জনৈক ইউরোপীয়ান গবেষক ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিস্তারের প্রধানত চারটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। যথা- ১. হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ (বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ মুসলমানদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল); ২. মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্যত্ব গ্রহণ; ৩. মুসলিম-মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব (আকবর ও দারাশিকো যার প্রতিভূ) এবং ৪. ধর্ম-গ্রহণের অসম্পূর্ণতা (ধর্মীয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ব্যতিরেকেই ইসলাম গ্রহণ)।[১৮৫]তবে ইসলাম ধর্মের উপর শুধু যে হিন্দুধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের উপরও ইসলাম ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। হজরত মুহম্মদ (স.) এর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শাহাদৎ বরণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মহরম উৎসবে মুসলমানদের সাথে হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করত। মহরম উপলক্ষ্যে ইমাম হোসেনের সমাধির প্রতীকস্বরূপ তাজিয়া নির্মিত হত। জানা যায়, দুর্গাপূজায় মুসলমানরা যেমন চাঁদা প্রদান করতো, তাজিয়া নির্মাণের ক্ষেত্রেও হিন্দুরা তেমন চাঁদা প্রদান করত। পাটনা ও বিহারে সারা বছরব্যাপী প্রায় ১৪,০০০ তাজিয়া নির্মিত হত; যার মধ্যে ৬০০ নির্মিত হতো হিন্দুদের দ্বারা।

---

১৮৩. Azizur Rahman Mallick,*op.cit*, p. 4
১৮৪. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫
১৮৫. Azizur Rahman Mallick,*op.cit*, p. 8

বিহারের পূর্ণিয়ায় মহরমের উৎসব পৌত্তলিক পূজাদর্শে উদ্‌যাপিত হত। ভারতবর্ষের স্বনামধন্য পীর খাজা মঈন উদ্‌দীন চিশ্‌তীর মাজার আজমীর শরীফে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তরা ভীড় জমায়। তাছাড়া হিন্দুদের দূর্গাপূজার সঙ্গে মুসলমানদের তাজিয়া নির্মাণের অভূতপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষণীয়। হিন্দুরা দশমীতে মা দূর্গাকে পানিতে বিসর্জন দেয়, অন্যদিকে মুসলমানরা মহরমের দশম দিনে তাজিয়া বিসর্জন দেয়। জেমস্ ওয়াইজ মুসলমানদের মহরম উৎসবকে হিন্দুদের রথযাত্রার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজেছেন। মিসেস এইচ.আলী গবেষণা করে দেখিয়েছন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রচলিত তা হিন্দুদের আদর্শে প্রভাবিত।[১৮৬]

বাংলা তথা ভারতে নবগঠিত মুসলমান সমাজ কাঠামোতেও হিন্দুদের বর্ণবৈষম্যবাদ স্থান পেয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র শুধুমাত্র নাম পাল্টিয়ে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ, আরজল প্রভৃতি নামে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের উপরিউক্ত বর্ণের মানুষের মধ্যে রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো মুসলমান সমাজে এ শ্রেণিভেদ প্রথা বিধি-নিষেধের কঠোর প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি। তৎকালীন সময়ে হিন্দু সম্প্রদায় প্রধান চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল।[১৮৭]

মানব সভ্যতার ইতিহাসে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক অতীব গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব হিসেবে বিবেচ্য। এ শতকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গ-ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। এ সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি শাসিত বাঙালি সমাজ বিশেষ করে মুসলমান সমাজেও বিশেষ রূপান্তর ঘটেছিল। এ রূপান্তর প্রক্রিয়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধ্বে হাজী শরীয়তউল্লাহ, মীর নিসার আলী তিতুমীর, দুদু মিয়া, মৌলবি এনায়েত আলী ও মৌলবি বেলায়েত আলী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এরা ছিলেন মূলত মুসলিম রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতিনিধি। বাঙালি মুসলিম সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে তাঁরা ধর্মীয় পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও আন্দোলন মূলত একে কেন্দ্র করেই পরিচিলিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে তাঁর মুসলমানদের জাত শত্রু বলে মনে করতেন এবং সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাদের ভঙ্গ-ভারত থেকে বিতাড়িত করা ছিল তাদের জীবনব্রত। অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম সমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এরা ধর্মীয় পুনর্জাগরণের পরিবর্তে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য

১৮৬. Azizur Rahman Mallick, *op.cit*, p. 11
১৮৭. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

শিক্ষা ও ভাবধারায় পরিপুষ্টি অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সাংগঠনিক প্রয়াসসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি মনোভাব পরিহার করে তাদের আনুগত্য প্রকাশ এবং সমন্বয়ধর্মী তৎপরতার মাধ্যমে রাজপৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করেন। মুসলিম সমাজে রাজনীতি সচেতনতাবোধ সৃষ্টি এবং তাদের পশ্চিমাদের মতো নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এজন্য মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠাসহ নানা উপায় অবলম্বন করা হয়।উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলি মুসলিম সমাজে নবচিন্তার বিকাশে নেতৃত্ব দানকারীদের অন্যতম ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ। তাদের সমসাময়িক উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানও একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মক্ষেত্র উত্তর ভারত হলেও তাঁর চিন্তন ও সংস্কার আন্দোলন বাঙালি মুসলিম সমাজকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজঃ আর্থ-সামাজিক চিন্তনের স্বরূপ

বঙ্গ-ভারতের রাজনৈতিক সীমারেখায় উনিশ শতকের দু'টি বিভাজন স্পষ্ট– ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমল (১৮০০-১৮৫৭ খ্রি.) এবং ব্রিটিশ রাজকীয় শাসনামল (১৮৫৮ খ্রি. থেকে)। তবে কর্তৃত্বের হাতবদল হলেও উভয় আমলেই এদেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্ববাদী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায়ই বলবৎ ছিল। উভয় যুগেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের ক্ষমতার বলয়কে নিরাপদ রাখার জন্য নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের চিরায়ত 'ভাগ কর এবং শাসন কর'– নীতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে তারা এ অঞ্চলের দু'টি বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে অনেকটাই নিরাপদে নিজেদের শাসন ক্ষমতা বহাল রাখে।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ কোম্পানি ও রাজকীয় শাসনাধীন ঔপনিবেশিক বাংলায় হিন্দু মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং এর বিকাশ একই রকম ছিল না। এদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিপরীতমুখী। সাধারণভাবে হিন্দুসমাজ কোম্পানি সরকারকে স্বাগত জানিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। কোম্পানি সরকারও এদেশে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের সামাজিক ভিত্তি সুসংহত করার উদ্দেশ্যে হিন্দুসমাজকে সাদরে কাছে টেনে নেয়। রাজপৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তাদেরকে মুসলিম সমাজের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে।

১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান লর্ড ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। ফলে রাজক্ষমতা হারানো মুসলিম সমাজ প্রথম থেকেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তাদের সাথে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। এ সময় মুসলমানদের একাংশ মনে করতেন যে, ইংরেজ শাসন এদেশে পঞ্চাশ বছরের অধিক স্থায়ী হবে না। ব্রিটিশ কোম্পানি শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে এদেশে আবারো মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ ভাবনা ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের একটি বড় অংশ শুরু থেকেই অসহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী থেকে সচেতনভাবেই দূরে

থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হারানো রাজক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। জানা যায় যে, সংখ্যায় অতি অল্প হলেও মুসলমানদের একটি অংশ ব্রিটিশদের সংসর্গে ছিলেন, তবে তারাও পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার না করায় কাঙ্ক্ষিত রাজপৃষ্ঠপোষকতা তারা পাননি। আঠোরো শতকের শেষ থেকে উনিশ শকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এটিই ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজের সাধারণ চিত্র। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা মহা বিদ্রোহের পর বাঙালি মুসলিম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মনন জগতে পরিবর্তন ঘটে। তারা সময়ের দাবি এবং যুগ বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি বিদ্রোহাত্মক ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব পরিহার করে আনুগত্য ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে তাদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা চালায়। ব্রিটিশ সরকারও তাদের শাসন ক্ষমতার রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি সুসংহত করার প্রয়োজনেই মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমন-পীড়ন হ্রাস করে অনুগ্রহ বিতরণের মাধ্যমে আনুগত্য আদায়ের নীতি গ্রহণ করে।[১] উভয় পক্ষের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক বঙ্গ-ভারতীয় সমাজ ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এক নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

তেরো শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম শাসকদের অধিকারে আসার পর বাংলা প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর মুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়। উল্লেখিত সময়ে বাংলায় আরব, আফগান, পাঠান ও মুঘল বংশোদ্ভূত মুসলমানদের আগমন-নির্গমন ঘটে। এদের অনেকেই বাংলায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এ দীর্ঘকালে মুসলিম ধর্ম প্রচারকের দ্বারা স্থানীয় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মুসলমানদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। উনিশ শতকের শেষদিকে মুসলমানরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।[২] বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারিতে দেখানো হয় মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ মুসলিম।[৩] পরবর্তী দশ বছর পরে ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে মুসলিম সংখ্যা হিন্দু সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। বাংলার ৫টি বিভাগেই মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৪] এ অবস্থায় মুসলমানদের এ সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে তাদের উৎস ও আদি বৃত্তান্ত নিয়ে পণ্ডিত সমাজে বিতর্ক দেখা দেয়।[৫] মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু না হলেও এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর

---

১. স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২০৯

২. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৬৭।

৩. *Report on the Census of Bengal*, 1872, p. 81.

৪. *Report on the Census of Bengal*, 1881, p. 74.

৫. এই বিতর্ক সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Indentity*, Delhi, 1981.

প্রভাব লক্ষণীয়। একটি সনাতন সমাজ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য মুসলমান সমাজের সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন, যা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের কারণে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে সমাজে বিকশিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বাংলার মুসলিম সমাজে আমরা প্রধানত দুটি শ্রেণির উপস্থিতির লক্ষ করি। সনাতন বা Traditional ধারা এবং আধুনিক বা Modern ধারা। সনাতন শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কে. এম. আশরাফ এ শ্রেণিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) উলামা ও সাধারণ ধর্মীয় গোষ্ঠী, (খ) আহল-ই-কালাম বা বুদ্ধিজীবী এবং (গ) আহল-ই-তিঘ্ বা সৈন্যবাহিনী।[৬] এ তিনভাগের সদস্যরা অভিজাত শ্রেণির অন্তর্গত এবং সাধারণভাবে শাসকদের দেওয়া অর্থায়নে অথবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে স্থান করে নেয়।[৭]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল বাংলার মুসলিম সমাজের জন্য একটি গৌরবহীন অধ্যায়। এ সময় সমজ-জীবনের সর্বস্তরে অবক্ষয় ও অধঃপতনের কালোছায়া পড়েছিল। এ সময় মুসলিম মানস ছিল স্থবির ও নানাবিদ কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। অমানবিক শাস্ত্রবিধি ও জঘন্য দেশাচারের যুপকাষ্ঠে বলিপ্রাপ্ত ছিল গোটা সমাজ-মানস। দেশাচার-লোকাচারের ছদ্মবেশে শাস্ত্রবিধিই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। মুক্ত চিন্তার সুযোগ ছিল না। সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও নানা অসামাজিক কার্যকলাপে পুরো সমাজ আচ্ছন্ন ছিল।[৮]

১৭৫৭ সালের পলাশীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বিজয় এবং ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার অর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। নবাব নামে মাত্র থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কোম্পানির হাতে। এ সময় মুসলিম সমাজ প্রশাসনিকভাবে দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পরে। প্রথমত অভিজাত শ্রেণি যারা মুঘল শাসনামল থেকে প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত এবং দ্বিতীয়ত সাধারণ শ্রেণি যারা স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান।[৯] এ দেশের অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পিছনে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বা ধর্মবোধ ছাড়াও সামাজিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে করা হয়।[১০] এ প্রসঙ্গে জগদীশ নারায়ণ সরকার বলেন:

> The lower classes adopted Islam to escape from social injustice or secure social statues. To the poor ... untouchables, sparned and neglected by the

---

৬. K. M. Ashraf, *Life and Conditions of the People of Hindustan*, New Delhi, 1970, p- 59.
৭. খন্দকার ফজলে রাব্বী (অনুবাদ : মু. আবদুর রাজ্জাক), *বাংলার মুসলমান*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৯১।
৮. ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৬।
৯. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১-১২।
১০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), *'ধর্ম ও সমাজ'*, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৩১-২৩২।

caste proud Brahmanical Hindu society, Islam came as a revolation with its message of monotheism and social equality... Further the material advantages of embracing Islam were tempting... .[১১]

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পৃথক ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কাঠামোর দিক দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যেই স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর প্রয়াসে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের সামাজিক শ্রেণিসমূহকে প্রায় হিন্দুদের চতুর্বর্ণ বিভাজনের অনুকরণে বিন্যস্ত করে।[১২] সাধারণভাবে আমাদের ধারণা সামাজিক শ্রেণি বা বর্ণ শুধু হিন্দু সমাজেই দেখা যায়। কিন্তু বর্ণপ্রথা শুধু হিন্দু সমাজেই নয়, বরং মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পারসি সমাজেও এর অস্তিত্ব রয়েছে।[১৩] সাম্প্রতিক গবেষণায় রফিউদ্দিন আহমদ বাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে বলেন, "এদের (মুসলমানদের) সামাজিক শ্রেণীর সদস্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হতো আরোপিত বংশগত পরিচয়ের দ্বারা, অনেক দিক দিয়ে হিন্দু জাতির মতোই।"[১৪] ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো বাংলাদেশের মুসলমান সমাজেও এক ধরনের বর্ণবাদ দৃষ্ট হয়। বিশেষ করে উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রতিপত্তি ও মর্যাদা নির্ভর বিভক্তি মুসলিম সমাজে বর্ণবাদ দৃঢ়মূল ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা রক্তভিত্তিক চতুর্বর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পাল্টিয়ে মুসলিম সমাজে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ ও আরজাল প্রভৃতি নাম গ্রহণ করে।[১৫] ইসলাম ধর্মের প্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে হিন্দুদের মতো কঠোর বর্ণ বৈষম্য এবং পুরোহিত শাসন ছিল না, তথাপি কার্যত মুসলমান সমাজ ভারতের সর্বত্র বংশগৌরবকে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট বৈষম্যবোধ গড়ে তুলেছিল।[১৬] এ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা হিসেবে ইমতিয়াজ আহমদ বলেন, "ভারতে বৃহৎ সংখ্যক মুসলমান মূলত সমাজের মধ্যে এবং নিম্ন পর্যায় থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, যে পর্যায়ে সমাজে কঠোরভাবে জন্মসূত্রে মর্যাদার সংজ্ঞা নির্ণয় করা হতো এবং কড়া সামাজিক অনুমোদন দ্বারা সেই মর্যাদা বজায় রাখা হতো। এ কারণে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে যে নিয়ম-কানুন তাদের আচর নিয়ন্ত্রণ করতো সেগুলোর একটি স্থায়ী প্রভাব তাদের মধ্যে থেকে যায়।"[১৭]

---

১১. Jagadish Narayan Sarkar, *Islam in Bengal*, Calcutta, 1972, p. 23-24.

১২. এ. কে. নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১।

১৩. A. F. Eman Ali, *'The Concept of Castes: A New Prespective'*, *Chattagong University Studies*, vol. 8, No. I, 1985, p. 47.

১৪. R. Ahmad, *op. cit.*, p. 7.

১৫. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫।

১৬. R. Ahmad, *op. cit.*, p. 7.

১৭. Imtiza Ahmad (ed.), *Caste among Indian Muslims*, Delhi, 1973, XXIX, উদ্ধৃত, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৪৭)*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৩।

বাংলার হিন্দুদের অনুরূপ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) মুসলামনরা 'কাল্পনিকভাবে' নিজেদেরকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে বিভক্ত করত : যথা- (১) সৈয়দ, (২) মুঘল, (৩) শেখ এবং (৪) পাঠান। এ প্রসঙ্গে জে. ডি. কানিংহাম মন্তব্য করেন, "ভারতী মুসলমানরা হিন্দুদের অনুকরণে কাল্পনিকভাবে নিজেদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে, যেমন : সৈয়দ, শেখ, মুঘল এবং পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, এরা সকলই সম্ভ্রান্ত, কিন্তু প্রথম দুটো হযরত মোহাম্মদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং হযরত আলীর প্রত্যক্ষ বংশধর, যিনি তাঁর মেয়ের জামাই; তাই এঁরা সকলই বিশিষ্ট। অনুরূপভাবে এটা সত্য যে, অন্তত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু ধর্ম থেকে কোন ক্ষত্রিয় কিংবা শিখ ধর্ম থেকে যে কোন কেউ ধর্মান্তরিত হলে তারা শেখ হিসেবে গণ্য হত। নিঃসন্দেহে, একজন ব্রাহ্মণ মুসলমান হলে তাকে তৎক্ষণাৎ উচ্চ শ্রেণিভুক্ত করা হত।"[১৮] জাফর শরীফ রচিত *Islam in India* (১৮৩২) নামক গ্রন্থের পর্যালোচনা করে উইলিয়াম ক্রুক বলেন, "গোঁড়া ইসলাম তার অনুসারীদের বিভিন্ন জাতিবর্ণে পৃথকীকরণ অনুমোদন করে না। অন্ততপক্ষে, তত্ত্বগতভাবে সকল মুসলমানই পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য এবং পঙ্‌ক্তিভোজনে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যদিও কতক জাতি ও বর্ণের মধ্যে আন্তঃবিবাহ নিয়ম প্রচলিত ছিল না, বিশেষ করে, যে সব পরিবার আরব কিংবা ফারসি বংশধরভুক্ত বলে দাবি করত। তবুও ভিন্ন গোত্রের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিল না। হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃবিবাহ এবং বহির্বিবাহের রীতি এখনও বহাল রয়েছে এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে পঙ্‌ক্তিভোজনে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয়।"[১৯]

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণি বিভাজন থাকলেও তা কোনো ভাবেই হিন্দুদের বর্ণবাদী ব্যবস্থার মত ছিল না। এদের মধ্যে সামাজিক ভেদ রেখা থাকলেও তা কোনোভাবেই হিন্দুদের বর্ণবাদের কঠোর বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল না। তারা প্রায়ই স্বাধীনভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত। সামাজিক বিধি নিষেধের কঠোরাতা যে খুব বেশি ছিল না এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে সমাজিক শ্রেণি বিভাজন যে, হিন্দু সমাজের মত অলঙ্ঘনীয় ছিল না, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জানা যায় যে, অবস্থাভেদে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। 'প্রথম বছর আমরা ছিলাম কসাই, পরের বছর শেখ, এ বছর যদি মূল্যহ্রাস পায় তাহলে আমরা হব সৈয়দ'- প্রচলিত এ ব্যঙ্গাত্মক প্রবাদের মাধ্যমে উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলাম সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্য শিক্ষা দেয়। পবিত্র কোরআনে জাতি, বর্ণ, এলাকা নির্বিশেষে সকল মুসলমানদেরকে সমান ঘোষণা করা হয়েছে।[২০] ইসলাম ধর্ম যে কানো ধরনের সামাজিক বৈষম্য অস্বীকার

---

১৮. Z. D. Kaningham, *A History of the Shiks*, Calcutta, 1903, p. 31; উদ্ধৃত, এ. কে. নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১।

১৯. উদ্ধৃত, এ. কে. নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১-৮২।

২০. আল-কুরআন, সুরা XLIX ১৩-১৫ : ১৪০৭।

করলেও কালের বিবর্তনে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি প্রবেশ করে। বাঙালি মুসলিম সমাজের সমাজিক শ্রেণি বিন্যাস এরই ফল।

সর্বময় কর্তা বাংলার নবাব ১৭৫৭ সালে ক্ষমতা হারানোর পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রীড়নকে পরিণত হয়। সাথে সাথে কোম্পানি নবাবের ব্যক্তিগত আর্থিক সুযোগ-সুবিধার উপর নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেয়।[২১] নবাবের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হারানোর অর্থনৈতিক আঘাত অভিজাত শ্রেণির উপরও আসে। বাংলার মুসলিম অভিজাত শ্রেণির আয়ের তিনটি প্রধান উৎস বিচার বিভাগে নিয়োগ পর্যায়ক্রমে বন্ধ হতে থাকে।[২২] অভিজাত শ্রেণির মুসলমানদের জীবিকার অন্যতম উৎস ছিল সামরিক বাহিনীতে চাকুরি। হান্টারের মতে, সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আরও মন্তব্য করেন, কোন উচ্চবংশজাত মুসলমান এখন আমাদের সেনাদলে প্রবেশাধিকার পায় না।[২৩] সামরিক বাহিনীর চাকরির সুযোগ বন্ধ হলে অভিজাত মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া অনেক অভিজাত মুসলমান খ্রিস্টান শাসকদের অধীনে চাকুরি করা অবমাননাকর মনে করতেন। এমতাবস্থায় বহিরাগত মুসলমানদের একটি বড় অংশ ভাগ্যান্বেষণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরের উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করেন। আবার সামরিক বেসামরিক কিছু প্রাক্তন কর্মকর্তা নবাবি আমলে প্রাপ্ত তাদের জায়গির নিয়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেন।[২৪] সুতরাং ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের প্রভাবে মুঘল আমলের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত অবসান ঘটতে থাকে।[২৫] ব্রিটিশদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর থেকে বাংলার মুসলিম শাসক তথা অভিজাত শ্রেণি সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ আর্থ-সামাজিকভাবে ক্রমাগত হারে বঞ্চিত হতে থাকে। ব্রোমফিল্ড এ অবস্থায় নিপতিত বাংলার মুসলমানদের Depressed Group বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৬]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব নীতি বিশেষ করে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজস্ব পুনঃপ্রবর্তন নীতি ইত্যাদি বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। উল্লেখ্য যে, চিরস্থায় বন্দোবস্তের অভিঘাত অভিজাত মুসলমানদের উপর ব্যাপক না হলেও এর দ্বারা মুসলমান সাধারণ রায়ত বা কৃষক শ্রেণি অনেক বেশি ক্ষতির শিকার হয়।[২৭] বৃহৎ জমিদার এবং কৃষক শ্রেণির মধ্যবর্তী বাংলায় একটি ছোট জমিদার শ্রেণির

---

২১. A. R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*, Dhaka, 1961, p- 35.

২২. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার (অনূদিত : আবদুল মওদুদ), *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, ঢাকা, ১৯৬৮,পৃ. ১৫৩।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

২৪. A. R. Mallick, *op.cit.*, p-36.

২৫. A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society*, New Delhi, 1980, p-67.

২৬. J. H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society*, Bombay, 1968, p-44.

২৭ . চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা পুরাতন জমিদাররা তাদের জমিদারি হারায়। এ জমিদার শ্রেণিতে মুসলমনদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। ১৭৭৭-৭৮ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সে সময় হিন্দু-মুসলিম জমিদারের হার ছিল যথাক্রমে ৮৯% এবং ১১%। A. K. Nazmul Karim, *op. cit.*, p-49.

অস্তিত্ব ছিল; বাংলার এ শ্রেণিটিকে 'তালুকদার' ও 'মুকাররারিদার' বলা হত।[২৮] ব্রিটিশপূর্ব যুগে বৃহৎ ও মাঝারি যোকোন প্রকারের জমিদারি হস্তান্তরের সময় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হত। কিন্তু ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য আইন কানুন ঐ পুরোনো নীতির বিলোপ বিলোপ সাধন করলে মুসলিম তালুকদারগণ ভূমির মালিকানায় তাদের অবস্থান বজায় রাখতে পারেনি। এ অবস্থায় কোম্পানি সরকারের ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত কতগুলো আইন পাশ করে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা রাজস্ব পূনঃপ্রবর্তন পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে মুসলমান সমাজের উপর আঘাত হানা হয়।[২৯] রাজস্ব পূনঃপ্রবর্তন পদ্ধতি মুসলিম সমাজে 'মরার উপর খাড়ার ঘাঁ' হিসেবে দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে নগদ টাকা হাতে থাকায় বিত্তশালী হিন্দুরা একই প্রক্রিয়ায় পুনর্প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ পায় মুসলমানেরা তা লাভ করতে পারেনি।"[৩০] সৈয়দ আমীর আলীর ভাষ্য মতে, "এই ধরনের আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের অধিকারকে শুধু খর্ব করা হয়নি বরং তাদের উপর অবিচার করা হয়েছে"।[৩১] লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে কতগুলো ভূমি সংশ্লিষ্ট সনাতন পদের বিলোপ সাধন করা হয়। এগুলোর মধ্যে আমিন, রয়, বায়ন, কানুনগো উল্লেখযোগ্য। এস. এন মুখার্জী মনে করেন, এর ফলে কোনো কোনো দফতরে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[৩২] হান্টারের মতে, এ নীতির পরিবর্তন দ্বারা গোমস্তা এবং সরকারের মধ্যবর্তী উচ্চপদগুলো মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়।[৩৩]

১৮৩৭ সাল থেকে সরকারি অফিস আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন ছিল মুসলিম সমাজজীবনের উপর আরও একটি আঘাত। এর ফলে বিচার প্রশাসনেও মুসলমানদের কর্তৃত্বে অবসান ঘটে। ১৮৪৪ সালের ১৪ অক্টোবর সরকারি পদে ইংরেজি শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দানের নীতিটি গৃহীত হলে সরকারি চাকরির দরজা মুসলমানদের জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত সরকারি শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্য যেসব পরীক্ষা নেয়া হয়, তাতে একজন নিয়োগ প্রাপ্ত মুসলমানেরও নাম পাওয়া যায় না।[৩৪] এভাবে সরকারি চাকরির দরজা যখন মুসলমানদের সামনে ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসে, সেই সময়ে ১৮৫৫ সালে সরকার ঘোষণা করে, যাঁরা ওকালতি বা মুন্সেফির পরীক্ষায় বসবে, তাঁদের

---

২৮. B. B. Misra, *The Indian Middle Class*, London, 1961, p-88.
২৯. খন্দকার ফজলে রাব্বী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০।
৩০. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৭।
৩১. K. K. Aziz, *Ameer Ali : His life and works*, Lahore, 1968, p-183.
৩২. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪।
৩৩. হান্টার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬।
৩৪. A. R. Mallick, *op.cit.*, p-258.

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে বা স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতবিদ্যার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। এ নির্দেশের ফলে মুসলমানদের জন্য আইন ব্যবসার পথও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সরকারের এ আদেশকে 'Unjust and impolitic' বলে বর্ণনা করেছে। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮৫৫ সনে এক আবেদনে মুসলমানদের সংগঠন 'আঞ্জুমানে ইসলামী' উল্লেখ করে যে,

> নানা কারণে মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি– ভালোভাবে ইংরেজি শেখার উপযুক্ত সুযোগও তারা পায়নি– ইংরেজি জ্ঞানের অভাব তাঁদের দায়িত্ব পালনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি– ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ইংরেজি না জানা সত্ত্বেও তারা সার্বিকভাবে পালন করেছে– কিন্তু এই নির্দেশের ফলে সরকারি চাকরির দরজা তাদের কাছে বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে।[৩৫]

এতদসত্ত্বেও ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি পুস্তকে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশটি বাতিল না হলে তারা বলেন,

> That class of Mahomedans which has hitherto maintained a respectable station by means of offices under Govt, which they have so creditably filled, will henceforth be sunk and depressed to the lowest level to the manifest injury as well as discredit of the state.[৩৬]

অবশ্য এ আবেদন পাবার আগেই সরকার তাঁদের নির্দেশটি আংশিকভাবে সংশোধন করেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক নীতি পরিবর্তনের ফলে শিক্ষিত ভারতীয়রা চাকরির ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক পিছিয়ে যায়। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় এগিয়ে থাকায় সরকারি দপ্তরে করণিক ও নিম্ন পদস্ত প্রশাসনিক কর্মচারীদের পদগুলোও তারা দখল করে নেয়।[৩৭] সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণের যে চিত্র ছিল তা জানা যায় ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মন্তব্য থেকে। তাঁর প্রদত্ত তথ্য মতে, সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের অবস্থান ছিল হিন্দুর অনুপাতে সাত ভাগের এক ভাগেরও কম এবং ইংরেজদের তুলনায় চৌদ্দ ভাগের এক ভাগেরও কম।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হলেও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের অনীহার কারণে এ প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ১৮৬৯ সালের সরকারি হিসেবে এম.ডি. এবং এম.বি. উপাধিধারীদের মধ্যে একজনও মুসলমান ছিল না। একশত চারজন এল.এম.এফ. উপাধি প্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান।[৩৮] প্রশ্ন উঠতে পারে মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিখতে এগিয়ে এলো না কেন? সচেতনতার অভাব এবং ধর্মান্ধতাকে এর কারণ বললে সম্পূর্ণ হবে

---

৩৫. স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২১০-২১১।
৩৬. Judicial Pros. No. 123, 27.9.1855.
৩৭. Amalendu De, *Roots of Seperatism in Ninettenth Century Bengal*, Calcutta, 1974, p. 31.
৩৮. হান্টার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৮।

না। কারণ মুসলমানরা ছিলেন শাসকশ্রেণি। সে কারণে মুসলমান আমলে হিন্দুদের মুসলমানদের তুলনায় নিম্নস্তরের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হত। অমুসলমানের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো মুসলমানদের দণ্ড হত না।[৩৯]

মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল সাধারণ এবং নিম্নশ্রেণি নিয়ে গঠিত। এদের অধিকাংশই ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং পেশায় কৃষিভিত্তিক সমাজের লোক। আধুনিক গবেষক সিরাজুল ইসলাম 'রায়ত'দের চিহ্নিত করেছেন 'খুদখাস্ত' এবং 'পাইকাস্ত' রূপে। 'খুদখাস্ত' রায়তদের জমির উপর বংশানুক্রমিক অধিকার ছিল এবং 'পাইকাস্ত' রায়তদের জমির উপর স্থায়ী কোনো স্বত্ব ছিল না। রায়তদের মধ্যে সর্বনিম্ন শ্রেণি ছিল 'আধিয়ার' এবং 'বর্গাদার,' এদের নিজস্ব জমি ছিল না। এরা ফসলের উপর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে চাষাবাদ করতেন।[৪০] সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মুসলমানদের মধ্যে জেলে, তাঁতি এবং বিভিন্ন শ্রেণির কারিগরও ছিল। এরা বাস করতেন বাংলার গ্রামীণ জনপদে। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, মুসলমানদের ৩.৫ শতাংশ শহুরে নাগরিক এবং অবশিষ্ট ৯৬.৫ শতাংশই গ্রামে বসবাস করেন। মুসলমান সমাজের কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বসতি ছিল পূর্ব বাংলার ধান উৎপাদশীল জেলাসমূহে।[৪১] বাংলার সাধারণ কৃষকশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হলেও পরবর্তী ষাট বছরেও বাংলার কৃষকরা প্রশাসন থেকে তাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য পায়নি।[৪২] তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্ট নব্য জমিদার শ্রেণির শোষণের কবলে পতিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নব্য জমিদার শ্রেণিকে জমির বংশানুক্রমে প্রকৃত মালিক করা হলে তারা ভূমি রাজস্ব ছাড়াও আরও অনেক রকমের কর রায়তদের উপর চাপিয়ে দেয়। সেগুলো আদায়ের জন্য জমিদারদের নিজস্ব পাইক-পেয়াদা, নায়েব, গোমস্তারা কৃষকদের উপর বিরামহীন অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এ প্রসঙ্গে রজনী পাম দত্ত মন্তব্য করেন, অমানবিকভাবে এবং সর্বোচ্চ হারে খাজনা আদায়ের ফলে কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কৃষকদের এবং কৃষির উন্নতির জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* জমিদারদের রাজস্ব সংগ্রহ প্রসঙ্গে (শ্রাবণ ১৩৭২) লিখেছে, "রাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপূর্ব কৌশল, কি পরিপাটি নিয়ম, কি অদ্ভুত নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন! প্রজারা নিঃস্ব ও নিরন্ন হউক, তথাপি তাহারদিগকে নিরূপিত রাজস্ব দিতেই হইবে, ভূস্বামীর সর্বস্বান্ত হউক, তথাপি তিনি ত্রি-মাসের পর কপর্দ্দক মাত্র রাজস্বও অনাদায়ী রাখিতে পারে না। অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদয় শস্য শুষ্ক হউক, জল প্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন যাউক,

---

৩৯. B. B. Misra, *op.cit.*, p. 203.

৪০. Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal, A Study of its Operation 1790-1819*, Dhaka, 1979, p. 5.

৪১. P. Hardy, *The Muslims of British India*, London, 1972, p. 5.

৪২. Latifa Akanda, *Social History of Muslim Bengal*, Dacca, 1981, p. 96.

রাজস্বদানে অক্ষম হইয়া প্রজারা পালন করুক, তথাপি নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তাঁহাকে সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ পরিশোধ করিতে হইবে।"[৪৩]

১৮৫০-৫১ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, মোট রাজস্বের ০.৮ ভাগ কৃষি খাতে ব্যয় করা হয়; যা কৃষির উন্নতির জন্য ছিল অতি সামান্য।[৪৪] বস্তুত নব্য জমিদার তথা ব্রিটিশ প্রশাসন রায়তদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা তো দূরের কথা, কৃষির উন্নতির জন্যও বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অথচ এটি করার জন্য তাদের উপর আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল। ১৮৬৪ সালে জাস্টিস জর্জ ক্যাম্বেল, ১৮৬৫ সালে জাস্টিস শম্ভু নাথ ও জাস্টি সিটনকারের প্রদত্ত মন্তব্যেও উপর্যুক্ত বক্তব্যের সপক্ষে সমর্থন পওয়া যায়।[৪৫] জমিদার ও তাদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা রায়তদের পীড়ন শোষণের এমন আরো হাজারটা দৃষ্টান্ত উপস্থান করা যাবে। গ্রামের জমিদাররা প্রজাদের উপর যে নির্যাতন-অত্যাচার করত তার একটি ১৮ দফা তালিকা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশ করেছিল।[৪৬]

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের ফলে উনিশ শতকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নীলকরদের আবির্ভাব ঘটে। নীল চাষ ছিল সামন্তবাদী শোষণের আরেক নির্মম হাতিয়ার। উল্লেখ্য যে, আমেরিকা এবং পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ উপনিবেশ হিসেবে হাতছাড়া হয়ে যাবার পর ইংরেজ নীলকররা বাংলার বিভিন্ন এলাকায় নীল চাষের প্রয়াস নেয়। বেশ পূর্বকাল থেকেই বাংলায় নীলচাষ হতো। সতেরো শতক থেকেই এখান থেকে নীল ইউরোপে রপ্তানি শুরু হয়।[৪৭] নীল চাষ প্রচুর লাভজন হওয়ায় ক্রমান্বয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলা বিশেষ করে ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, রাজশাহী, নদীয়া এবং মুর্শীদাবাদ ইংরেজ পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নীল চাষ বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়।[৪৮] আগেই বলা হয়েছে যে, নীল চাষ ছিল সামন্ত শোষণের আরেক নাম। নীলচাষের ব্যাপারে নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ীরূপে নয়, এক অভিনব অত্যাচারী হিসেবে সমধিক পরিচিত। চাষের ক্ষেত থেকে শুরু করে নীলকুঠি পর্যন্ত তারা ছিলেন বিচিত্র রাজ্যের অধীশ্বর। তারা ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিভূ, কাজেই দেশীয় জমিদার, তালুকদার-পত্তনিদারদের চেয়ে শতগুণ বেশি প্রভাব, প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালী। নীলচাষী তো দূরের কথা খোদ দোর্দান্ত প্রতাপশালী জমিদাররাও তাঁদের অধীন নীলকর সাহেবদের যথেষ্ট সমীহ ও ভয় করত।[৪৯] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নীলকরদের অত্যাচার চরমে

৪৩ উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৪।

৪৪. Rajani Palme Dutta, *India Today*, Calcutta, 1970, p.78.

৪৫. দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, পৃ. ২৩-২৪।

৪৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ২৫-২৭।

৪৭. A.R. Mallick, *op.cit.*, p. 53.

৪৮. J.H.E. Garret, *Bengal District Gezetteers, Nadia*, Callcutta, 1910, p. 32.

৪৯ বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।

উঠে। বিনয় ঘোষ বলেন, "উনিশ শতকের বাংলা ও ইংরেজি সাময়িকপত্রে নীলকরদের দৌরাত্ম ও দুর্বিনীত আচরণের কাহিনী এতো প্রকাশিত হয়েছে যে শুধু বাংলা পত্রিকার রচনাগুলো সংকলন করলে একটি হাজার পৃষ্ঠার বড় বই হতে পারে।"[৫০] দীনবন্ধু মিত্র রচিত *নীল দর্পন* নাট্য গ্রন্থে নীলকরদের শোষণের জ্বলন্ত বর্ণনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, যেহেতু রায়ত বা কৃষকদের সিংহভাগই ছিলেন মুসলমান কৃষক, তাই অত্যাচারের খড়্গটি তাদের উপরেই পড়েছিল বেশি। তবে নীলকর ও তাদের দোসরদের নির্মম অত্যাচার বাংলার রায়ত শ্রেণি বিনা প্রতিবাদে বেশি দিন মেনে নেয়নি। এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নদীয়া, যশোর, মালদাহ, রাজশাহী ও ফরিদপুর জেলার রায়তরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মুসলিম সমাজের নেতৃত্ববৃন্দের কেউ কেউ এ বিষয়ে রায়তদের উদ্বুদ্ধও করেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুসলিম সমাজের নব্য শিক্ষিত ও নব্য ধারার অগ্রণী নেতা নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) নাম উল্লেখ করা যায়। যা'হোক নীলকরদের অত্যাচারে অসন্তুষ্ট নীল চাষিদের অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত ১৮৬০ সালে বিদ্রোহের রূপ লাভ করে। বাংলার ইতিহাসে যা 'নীল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।[৫১]

সরকারের সহায়তায় নীলকররা বিদ্রোহ দমনে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কারণ ইতোমধ্যে বাংলায় অবস্থানরত খ্রিস্টান মিশনারি এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা নীলচাষ এবং বিশেষ করে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। খোদ ইংল্যান্ডেও এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্টের বাইরে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে একটি নীল কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলার চাষীদের নীল চাষের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে।

কোম্পানি সরকারের শাসনামলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পেরও বিনাশ ঘটে। ব্যক্তিগত রুচি, শখ ও বিলাসিতা চরিতার্থ করার জন্য ইতোপূর্বে বাংলার অভিজাত শ্রেণির লোকেরা বাঙালি কারুশিল্পীদের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নতুন ব্যবস্থাপনায় পুরনো অভিজাত শ্রেণির পতন ঘটে, নব্য অভিজাত শ্রেণি এবং সরকার কেউই কারুশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেননি। বরং এসময় ইংল্যান্ডের শিল্পোদিত পণ্যের অবাধ আমদানির ফলে স্থানীয় বাঙালি কারুশিল্পের পতন ঘটে। বাংলাদেশের কারুশিল্পের অবনতির কথা *সোমপ্রকাশ*সহ সমকালীন সংবাদপত্র ও অন্যান্য রচনায় প্রতিভাত হয়েছে। বাংলার বস্ত্র শিল্পের বিশ্ব জোড়া

---

৫০. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫।

৫১. নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারি দ্রষ্টব্য, প্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৭২; মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন, *নীল বিদ্রোহের নানাকথ*, ঢাকা, ১৯৯০; প্রমোদ সেনগুপ্ত, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা, ১৯৮০; Subhas Bhattacharya, "The Indigo Revolt of Bengal". *Social Scientist*. 5 (60): 17. JSTOR, July 1977; Kunal Chattopadhyay & Muntassir Mamoon, "Indigo Rebellion", *The International Encyclopedia of Revolution and Protest*, New Jersey, 2009

খ্যাতির কথা সকলেরই জানা। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে এ শিল্পেরও ধ্বংস সাধিত হয়। রমেশ দত্ত বলেন, "ম্যানচেস্টার কেন্দ্রিক শিল্পপণ্য আমদানির ফলে, তাঁতিরা পেশা ত্যাগ করে কৃষিকাজে যেতে বাধ্য হয়।"[৫২]

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রতিক্রিয়াসহ অন্যান্য আরো কিছু কারণে এবং আঠারো শতকে বাংলার জন-জীবনে দুর্যোগের কালো ছায়ার বিস্তার ঘটে। বাংলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ দুর্দশার শিকার হলেও তুলনামূলক বিচারে মসলিম সমাজের উপর এর প্রভাব ছিল অধিকতর ধ্বংসাত্মক। উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ ধর্মীয় বাধা না থাকায় জন্ম হার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। সে তুলনায় আয়ের নতুন পথ উন্মুক্ত না হওয়ায় আয়ের সবচেয় বড় উৎস কৃষিতে নির্ভরশীলতাও বাড়তে থাকে। জাত্যাভিমানজনিত করণে অনীহা এবং অন্যান্য কিছুকারণে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় জীবিকা অর্জনের পুরনো ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত এবং নতুন উন্মুক্ত ক্ষেতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে বাংলার মুসলমান সমাজ আর্থ-সামাজিক দীনতায় নিপতীত হয়।[৫৩]এর প্রভাব পড়েছিল তাদের মনন জগতেও।

বাংলার মুসলিম সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা যারা আশরাফ হিসেবে কথিত তারা ছিলেন প্রধানত বিদেশ থেকে বিশেষ করে আরব, পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে আগত এবং স্থানীয় হিন্দু উচ্চবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত। উচ্চবর্ণের হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমগণ পূর্বপুরুষেরা ঠাকুর, বিশ্বাস এ ধরনের পদবির ব্যবহার করতেন। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও তারা তাদের কুল-মান আঁকড়ে ছিলেন।[৫৪] বহিরাগত আশরাফ মুসলমানদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে মুসলিম মানসে যে সমস্যা ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আভিজাত্যবোধ।[৫৫] এ আভিজাত্যবোধের কারণেই নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত 'আতরাফ' নামীয় সাধারণ কৃষিজীবী স্বধর্মাবলম্বী মুসলমানদের তারা 'রযিল' (অকর্মণ্য) 'আরজাল (অতি নিম্নমানের ব্যক্তি), 'কমিনা' (ইতর) বা ছোটজাত বলে সম্বোধন করতেন।[৫৬]

ইসলাম ধর্ম মুসলমানদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়। কিন্তু বাংলার মুসলিম সম্প্রদাদের আশরাফ ও আতরাফদের মধ্যকার সম্পর্কে ইসলামের উপর্যুক্ত মহান নীতি আদর্শের

৫২. Romesh Dutt, *The Economic History of India*, Vol. II, Routledge and Kegan Paul, London, 1956, p. VI.

৫৩. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-১৯।

৫৪. খন্দকার ফজলে রাব্বী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫।

৫৫. *ইসলাম প্রচারক*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১২৯৯ (বঙ্গাব্দ)।

৫৬. *Census of India*, 1901, vol. 1, Part-1, p. 543. প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, সাধারণত ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আতরাফ, আজলাফ ও আরজাল শ্রেণির মুসলমান বলে গণ্য করা হত। তবে পেশাগত কারণে মুঘল-পাঠানদের মধ্যেও কিছু লোক আতরাফ, আজলাফের স্তরের আন্তর্ভুক্ত ছিল।

অনুসরণ দেখা যায় না। অভিজাত্যবোধের কারণে আশরাফগণ আতরাফ মুসলমানদের শুধু হেয় দৃষ্টিতেই দেখতেন না তাদের বিভিন্নভাবে নির্যাতনও করতেন। আতরাফদের মধ্যে সর্বনিম্নের জাত 'আরজাল' শ্রেণির 'হালালখোর' (পায়খানা পরিষ্কারক), ঝাড়ুদার, কালাল তথা মদ প্রস্তুতকারক, কসাই, বেদে ইত্যাদি পেশার লোকদের কবরস্থান ব্যবহার ও মসজিদে প্রবেশ বিধি-নিষেধ ছিল।[৫৭] সমসাময়িক পত্রিকা আবদালদের প্রসঙ্গে লিখেছে, "আবদালগণ পুকুর, খাল, বিল ও নদী হইতে ঝিনুক তুলিয়া তাহা পোড়াইয়া চুন প্রস্তুত করে। তাহারা এমন শরা-বিরুদ্ধ কার্য করে না যাহাতে আমরা তাহাদিগকে অমুসলমান মনে করতে পারি। আজকাল দেখিতেছি আবদালগণকে পাটনির্মিত কূপ হইতে পানি তুলিতে নিষেধ করা হইতছে।"[৫৮] *সাম্যবাদী* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে মুসলিম সমাজের কথিত আতরাফ সমাজভুক্ত 'সান্দর'দের প্রতি আশরাফ মুসলমানদের সামাজিক অবিচারের কথা জানা যায়। ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি পালন করেও পেশার বা বৃত্তির কারণে তারা গুরুতর সামাজিক অবিচারের শিকার হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় পত্রিকাটিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের লেখক 'সান্দার'দের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।[৫৯]

উনিশ শতকের বাংলায় তথাকথিত অভিজাত ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পূর্বোক্ত সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহারণ স্বরূপ চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা যায়। *আল এসলাম* পত্রিকায় পরিবেশিত তথ্য মতে, "চট্টগ্রামে, 'রোসাংগী', 'দাড়ালিয়া', 'সারালিয়া', 'সন্ধীপী' ও 'চট্টগ্রামী' নামে পরিচিত গোত্র আছে। ছোট বড় জ্ঞানে তাহারা পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বা বরযাত্রীরূপে একাসনে বসিয়া আহার করিতে আপত্তি করে।"[৬০]

ইসলাম ধর্মের অনুশাসন প্রতিপালনেও আশরাফ শ্রেণির মনোভাব সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হতো না। জানা যায় যে, ধর্মকে আভিজাত্য বা প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহার তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার ছিল। কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) বিখ্যাত *আবদুল্লাহ* উপন্যাসের চরিত্র সৈয়দ কুদ্দুস তাঁর অর্থনৈতিক অবক্ষয় সত্ত্বেও তালুক বিক্রি করে মসজিদ তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়। অথচ আভিজাত্যবোধের অহমিকার কারণে তিনি পেয়াদা চাপরাশিদের সঙ্গে নামাজ পড়তে রাজি ছিলেন না। দেখা যায় যে, আভিজাত্যের মোহে তিনি ইসলামের সাম্যনীতিতে আঘাত হানতেও পিছপা হননি।[৬১]

---

৫৭. R. Lavi, *op.cit.*, pp. 67-68.

৫৮. মৌলভী মোহাম্মদ জশমত উল্লাহ, 'আবদাল ও ওস্তাদশ্রেণীর কথা', *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০০ (বঙ্গাব্দ)।

৫৯. মৌলভী আহসান উল্লাহ, *'সান্দারদের প্রতি অবিচার'*, সাম্যবাদী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০০ (বঙ্গাব্দ)।

৬০. *আল এসলাম*, ৪র্থ বর্ষ, ১১-১২শ সংখ্যা, ১৩২৫।

৬১. আবদুল কাদির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. দ্রষ্টব্য।

এ আভিজাত্য সংরক্ষণের জন্য আশরাফরা আতরাফদের মসজিদ তৈরিতেও বাধা দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না বলে জানা যায়।[৬২]

শিক্ষা বিষয়েও আশরাফ শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। নিজেরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকলেও দুর্মর আভিজাত্যের কারণে আতরাফ মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়টি তারা সুনজরে দেখতেন না। পূর্বোক্ত *আবদুল্লাহ* উপন্যাসের চরিত্র সৈয়দ সাহেব এর প্রমাণ। তিনি লোক দেখানোর জন্য নিজ বাড়ির মক্তবে আতরাফ ছেলে-মেয়েদের পড়াতে নিষেধ করতে পারছেন না। কিন্তু মক্তবের শিক্ষক মৌলভী সাহেবকে ঐ ছেলে-মেয়েদের সবক কম দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী ছিলেন।[৬৩] তাই তিনি এই বৈষম্যবোধ লালন করেছেন। অন্য একটি উপন্যাসে উল্লেখ রয়েছে, "চাষার ছেলে পড়লে আশরাফেরা অপমানিত হয়।"[৬৪]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মুসলিম সমাজের সংখ্যালঘু আশরাফ শ্রেণি আতরাফ নামে খ্যাত স্বধর্মাবলম্বীদের জীবনমান উন্নয়নে সহযোগিতা না করে বরং তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কখনও ধর্মের অপব্যবহার করেছেন, কখনো বা আবার সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব খাটিয়েছেন।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বহিরাগত আশরাফ নামীয় অভিজাত মুসলমান শ্রেণি বহুকাল ধরে বাংলায় বসবাস করলেও তাঁরা তাদের পূর্বের ভাষা এবং সংস্কৃতি ভুলেননি এবং পরিত্যাগও করেননি। বরং সযত্নে লালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে দিল্লি ও লক্ষ্ণৌর শাসকগোষ্ঠী ও অভিজাত শ্রেণির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ ছিল তাঁদের মূল প্রবণতা। ফলে বাংলার স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। এমনকি স্থানীয় বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের এক রকমের উন্নাসিক মনোভাব ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেবল সনাতনপন্থী অভিজাত মুসলমান নয়, নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকের মধ্যেই এই ভাব প্রবণতা বিরাজমান ছিল। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ছিলেন এর একটি দৃষ্টান্ত। মুসলিম নব জাগরণের অগ্রদূত আবদুল লতিফ বাংলা ভাষায় কথা বলতেন না। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নেও তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনাপর্বে বাংলায় প্রচলিত সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকায় আশরাফ মুসলমানরা তাদের পুরাতন ও গতানুগতি জীবনধারা ও মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। এমনকি যুগ পরিবর্তনের হাওয়া উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সনাতন ভাবজগতে

৬২. আকবর উদ্দীন, *'মাটির মানুষ'*, উদ্ধৃত, রশিদ আল ফারুকী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫১।

৬৩. আবদুল কাদির, *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. দ্রষ্টব্য।

৬৪. শফীউদ্দীন আহম্মদ, *'সৈয়দ সাহেব'*, উদ্ধৃত, রশীদ আল-ফারুকী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫১।

বিচরণ করতে থাকে। এমনকি জাত্যাভিমানজনিত কারণসহ অন্য নানাবিদ কারণে তারা নতুন পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় সমাজে তাঁদের প্রাধান্য খর্ব হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ শাসনের আনুভূমিক প্রভাব আশরাফদের জাতিবর্ণগত গৌরবের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে। সমাজের সকল অংশ থেকে কর্মচারী নিয়োগ দানের নীতি গ্রহণ করায় বাংলার বিদ্যমান সামাজিক স্তরবিন্যাসে অনেকটা সমতাধর্মী রূপ ধারণ করে। ফলে আশরাফরা তাদের আভিজাত্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।[৬৫] মুসলিম সমাজের এ আশরাফ শ্রেণির প্রকৃত অবস্থান লেখ্যচিত্র পাওয়া যায় সফিউদ্দীন আহম্মদের *সৈয়দ সাহেব* উপন্যাসে। আধুনিক শিক্ষার প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব এবং মেকি আভিজাত্য সম্পর্কে এতে উল্লেখ রয়েছে, "নবাবী আমলে উক্ত 'আশরাফ'গণের বিষয় সম্পত্তি, প্রসার প্রতিপত্তি খুবই ছিল, কালক্রমে সবই গিয়েছে আজ কেবল 'আশরাফ ফখর' কুলাভিমান রয়েছে।"[৬৬] উক্ত উপন্যসের লেখক 'আশরাফ' মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রমাণ হিসেবে যৌতুক গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। "অর্থাৎ বিবাহাদী সমান ঘর না হইলে হইতে পারে না, তবে দুই সহস্র অন্তত পাঁচশত মুদ্রা পাইলে নীচুঘরে কন্যা বিক্রয় অথবা হীনবংশের কন্যা বিবাহ এত দূষণীয় নহে।"[৬৭] এ ধরনের প্রমাণ অন্য একটি উপন্যাসেও পাওয়া যায়। 'আশরাফ' শ্রেণির লেখক হিসেবে নায়ক এক ধর্মান্তরিত পাহাড়ি মেয়েকে বিয়ে করলেও অভিজাত গৌরবহীনা পাহাড়িয়া জাতির রমণীকে গ্রহণ করা যায় না।[৬৮] মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীতে উল্লেখ রয়েছে, তাঁর পিতামহ মীর ইব্রাহিম হোসেন এক মলংগ ফকিরের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ...মীর পরিবারের কোন কন্যার বিবাহ নিম্নবংশের কোনো ঘরে দেওয়া হয়নি।[৬৯] এছাড়া এ শ্রেণির লোকেরা হিন্দুদের মত বিধবাবিবাহেরও বিরুদ্ধে ছিল।[৭০]

উনিশ শতকে ক্ষয়িষ্ণু আশরাফ শ্রেণি তাদের সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে। তাদের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষা প্রদানে উদ্বুদ্ধ হয়। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পেশাগত জীবন অক্ষুন্ন রাখতে না পেরে নতুন পেশা গ্রহণ করে। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আশরাফ মুসলমানদের সন্তানরা জুতোর ব্যবসা আরম্ভ করে এবং এ পেশাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়।[৭১]

নিজেদের সামাজিক অবস্থান অক্ষুন্ন রাখার জন্য আশরাফ মুসলমানরা উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইতোপূর্বে যা ছিল অকল্পনীয়। বস্তুত ঐ মধ্যবিত্তরা হলেন তারা,

---

৬৫. এ. কে. নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬।

৬৬. রশীদ আল ফারুকী কর্তৃক উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮-২৩৯।

৬৭. *প্রাগুক্ত*।

৬৮. আবদুল মালেক চৌধুরী, *স্বপ্নের ঘোর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০০-৩০১।

৬৯. দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.), *আমার জীবনী*, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. দ্রষ্টব্য।

৭০. Rafiuddin Ahmad, *'The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity'*, Delhi, 1981, p. 15.

৭১. মুস্তফা নুর উল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৭২-৭৩।

সমাজে যারা আশরাফ নয় এমন শ্রেণিগুলো থেকে আগত। মৌলভী আব্দুল ওয়ালি তাঁর 'Ethnographical Notes on the Mahomedan Castes of Bengal' শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ রূপান্তরের বর্ণনা দিয়ে বলেন, "নদীয়া, যশোর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা এবং ফরিদপুরের কতক অংশের নিম্ন শ্রেণিগুলোর লোকজন তাদের সমৃদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে দরিদ্র 'শরীফ' শ্রেণির পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত। যখন এরূপ অসম বিবাহ সংঘটিত হত, তখন নিম্ন শ্রেণিগুলোর লোকরা মুন্সী, মোল্লা, বিশ্বাস, জোয়ারদার ইত্যাদি উপাধি ধারণ করত। এদেরকে প্রায়শই আতরাফ ভালোমানুষ বলা হয়, কিংবা 'ভদ্রোলোক হয়ে ওঠা আতরাফ'।"[৭২]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকের বাংলায় সনাতন অভিজাত শ্রেণির প্রথম দিকে তাদের আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য নিজস্ব সনাতনী সামাজিক মূল্যবোধ আকঁড়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। আতরাফ মুসলমানদের সাথেও তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির অভিঘাতে যখন তাঁদের সামাজিক অবস্থান হুমকির মুখে পড়ে, তখন তাঁরা নানা রকম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তবে এর মধ্যেও তাদের স্ববিরোধী কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলার মুসলমান সমাজের প্রায় ৯০% ছিল আতরাফ শ্রেনিভুক্ত সাধারণ মানুষ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পেশাগত জীবনে তারা ছিলেন প্রধানত কৃষক এবং সমাজের অন্যান্য ছোটখাট পেশায়ও (তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার, মাঝি ইত্যাদি) তারা নিয়োজিত ছিলেন। এরাই ছিলেন নিম্নশ্রেণির আমজনতা।[৭৩] বাঙালি মুসলিম সমাজের এ অংশটির মননজগতে পুরাতন সামাজিক চিন্তা-পদ্ধতির লক্ষণসমূহ প্রকট ছিল। ধর্ম পরিবর্তন করলেও তাঁদের বিশ্বাস বিশেষ করে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসরণে তাদের মধ্যে কোনো মৌল পরিবর্তন আসেনি। দিনের পর দিন যায়, নতুন ভাবাদর্শ এদেশে তরঙ্গ তোলে, নতুন রাজশক্তি এ দেশে নতুন শাসনপদ্ধতি চালু করে, কিন্তু তারা মনের দিক দিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের মতই বারবার নিজেদের আলাদা করে রাখে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে তাদের মানসে যে একটি বলবন্ত সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তাঁদেরই রচিত পুঁথিসাহিত্যসমূহের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।[৭৪] কোম্পানি শাসনকালে দীর্ঘ দিন তাদের মনোজগতে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কোম্পানি শাসনের সামাজিক পরিবর্তন তাদের মনোজগতে প্রদীপ শিখা জ্বালাতে পারেনি। পেশাগত দিক

---

৭২. Mowli Abdul Owli, *'Athongrafical Notes on the Mahammadan Castes of Bengal', Jouranl of Anthopological Society of Bombay,* Part-7, p. 108, উদ্ধৃত, এ. কে. নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৭।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৭৪. আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৩৪।

থেকেও তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। বস্তুত সাধারণ মুসলমানদের বাসা ছিল গ্রামীণ মধ্যযুগীয় পরিবেশে। সঙ্গত কারণেই ইংরেজ শাসকদের দ্বারা সূচিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন না।

তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মুসলমান বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষককূল নেতৃত্বহীন হওয়ায় সচেতনভাবে সংগঠিত হতে পারেনি। কোম্পানি শাসন প্রবর্তিত নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রাজস্বনীরি প্রতিক্রিয়া তাদের অবস্থার আরো অবনমন হলেও জোরালো প্রতিবাদ করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। অবশ্য সময়ের দাবি পূরণে একদল সনাতনী নেতৃত্ব এগিয়ে এসছিলেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় আবরণে সূচিত তাদের আন্দোলন কালক্রমে কৃষকদের উপর কোম্পানি সরকার এবং তাদের সহযোগী নব্য ভূ-স্বামী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। হাজী শরীতুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন তিতুমীর পরিচালিত তরিকায়ে মোহাম্মদী আন্দোলন এর প্রমাণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রামে অবস্থানরত কৃষকদের সচেতনতা বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রথমে ধর্মভিত্তিক এবং পরে রাজনৈতিক। অবশ্য যুগের চাহিদার সাথে তুলনা করলে এসব আন্দোলন ছিল অপ্রতুল। উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমান কৃষকদের মধ্যে উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক জীবনে এ ধরনের আন্দোলন গভীর তাৎপর্য বহন করে।[৭৫]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের সনাতন অভিজাত বা আশরাফ শ্রেণি অস্তিত্ব সংকটে পরে আর্থ-সামাজিক চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। আতরাফ নামী সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এর লক্ষণ প্রতিভাত হয়। যুগের দাবির সাথে সমন্বয় করতে গিয়ে এ সময় আতরাফদের পেশা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায়ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আশরাফ মুসলমান পরিবারের সাথে বৈবাহিক বা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন এবং অর্থের মাপকাঠিতে উঁচুস্তরে ওঠার প্রবণতা দেখা যায়। আতরাফ মুসলমানদের এ প্রবণতা নিম্নের প্রবাদে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "গত বছর জোলাহ্ ছিলাম, চলতি বছরে শেখ এবং যদি কপাল ফেরে আগামী বছরে সৈয়দ হব।"[৭৬] আতরাফদের নামকরণে ইসলামি শব্দের প্রয়োগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে নামকরণে এ ইসলামীকরণ শুরু হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথেও এ পরিবর্তন দেখা যায়। যা নিম্নের কাব্যাংশ দ্বারা প্রমাণিত:

আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দীন
তলের মাহম্মদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দীন।[৭৭]

---

৭৫. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।

৭৬. Census of India, *op.cit.*, p. 441.

৭৭. Census of India, *op.cit.*, pp. 172-173.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। বলা হয় যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সূচিত নতুন প্রশাননিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংস্কারের সুদূরপ্রসারী ফল হলো এই নতুন শ্রেণির উদ্ভব। সমাজের উচ্চ অভিজাত ও নিম্নশ্রেণির মধ্যবর্তী স্থানে ছিল এ ন্যব সামাজিক শ্রেণির অবস্থান এবং সে অর্থে একে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি' বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৭৮] সরকারের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিসহ নতুন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফল হিসেবে বাঙালি সমাজে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে মুখ্যত বাণিজ্য নির্ভর, ভূমি নির্ভর এবং পেশাজীবী এ তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট মাঝারি ও ছোট জমিদার এবং উপসত্বভোগী তালুকদার এবং জোদারদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল ভূমিজ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এ শ্রেণিতে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। এতে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল একবারেই নগন্য।[৭৯] পাশ্চত্য বিশ্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাণস্রোত হিসেবে কাজ করে বাণিজ্য থেকে উপার্জিত অর্থ। পাশ্চাত্যের অনুরূপ না হলেও আলোচ্য সময়ে বাংলায় বাণিজ্য নির্ভর একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছিল। তবে লক্ষণীয় যে, এ শ্রেণিটিতেও হিন্দু সমাজের একচ্ছত্র প্রতাপ ছিল। এখানেও মুসলমানদের অবস্থান ছিল নগন্যই। গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া সমকালীন বিভিন্ন তথ্যসূত্র উল্লেখ এবং পর্যালোচনা করে বাণিজ্য নির্ভর মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিচালিত কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামসহ তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন।[৮০] মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল মূলত পেশাজীবী শ্রেণি। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এ শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ছিলেন এ নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই মুখপাত্র। উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বিলম্ব করায় পেশাজীবী মুসলিম সমাজের উদ্ভব হয়েছিল তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের পরে। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম পেশাজীবী মধ্যবিত্তের আকার ছোট ছিল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি হলো সমাজের সবচেয়ে গতিশীল অংশ। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার ক্ষেত্রেও কম-বেশি এ বাস্তবতার প্রকাশ দেখা যায়। মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আকারে হিন্দুদের তুলনায় ছোট হলেও সমাজে তারাও প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাংলার মুসলিম সমাজের চরম দুর্দশা, দুরবস্থা সম্পর্কে উনিশ শতকের শেষার্ধে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। এসময় মুসলিম সমাজের নব্যশিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকেই এর জন্য সমাজের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচলিত রাজনীতি,

---

৭৮. মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা এবং এদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩-৯।

৭৯. S. N. Banerjee, *A Nation in Making*, Bombey, 1961

৮০. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮.-৯১।

লোকাচার ইত্যাদিকে দায়ী করেন। তাঁদের স্ব-সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন- যা তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, কার্যকলাপ ও লেখনীতে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। এ শ্রেণিটি মুসলিম সমাজের স্বার্থে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এঁদের অনেকেই সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে আধুনিক ও প্রগতিশীল মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেলেও 'সমাজ ব্যাধির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না, তবে মতভেদ দেখা দিয়েছিল রোগের লক্ষণ এবং নিরাময়ের কৌশল সম্পর্কে।'[৮১] সমাজ সংস্কার বিষয়ে আধুনিক সংস্কারকামীদের যুক্তি-দর্শনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের যুক্তি দুর্বল প্রতিপন্ন হলেও মুসলিম সমাজের অধপতনের জন্য দায়ী সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করণ এবং এসব সমস্যা দূরীকরণের ব্যাপারে মত পার্থক্য ছিল। শরীয়তের আলাকে সবকিছুকে যাচাই-বাছাই করার প্রবণতা থেকেই বিতর্ক ও মতদ্বৈততা সৃষ্টি হত। মাঝে মাঝে মজহাবি দ্বন্দ্বও প্রকট রূপ ধারণ করত। আধুনিকপন্থিরাও মাঝে মধ্যে তাঁদের মতের সমর্থনে শরিয়তের আশ্রয় নিতে বাধ্য হতেন। কারণ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় শাস্ত্রের প্রভাবের কাছে যুক্তির অবস্থান ছিল দুর্বল। তবে আলেম সমাজের কিছু সংখ্যক আবার সমাজ-চিন্তনে অত্যন্ত উদার ও প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দেন। এসব আলেমদের মধ্যে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, মাওলানা আকরাম খাঁ ((১৮৬৮-১৯৬৮)) প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য। এমনকি মাওলানা আকরাম খাঁ শরিয়তের অনুকূলে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামে চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি নিষিদ্ধ নয়।[৮২]

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে যে নবচেতনাবোধের জাগ্রত হয় এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে নব্য শিক্ষতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিরাজমান অনেক সামাজিক ব্যাধি ও কুসংস্কার দূরীকরণে এগিয়ে আসেন। তারা এসব ব্যাধির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাও করেন। এসব আন্দোলনের মধ্যে পর্দা ও অবরোধ প্রথার কথা বলা যায়। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় পর্দা ও অবরোধ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করে। পর্দা বিশেষ করে অবরোধ প্রথা সমাজে নারী মুক্তির ও উন্নতির অন্তরায় –এরূপ চেতনাবোধ থেকে মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল ধারার নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রর্দা ও অবরোধ প্রথা এক নয়। যথারিতি পর্দা বা বোরখা পরিধান করে নারী বাইরের সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন। আর অবরোধ প্রথা কঠোর নিয়ম– নারী কোন অবস্থাতে পুরুষ সমাজের মধ্যে বা বহির্জগতে আসতে পারে না; অসূর্যস্পশ্যা নারীর মতই তিনি গৃহে আজীবন বন্দিনী থাকেন।[৮৩]

৮১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৭ (ভূমিকা)।

৮২. আকরাম খাঁ, 'চিত্রকলা ও এছলাম', *মাসিক মোহাম্মদী*, জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৭ (বঙ্গাব্দ)।

৮৩. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পৃ. ৪০১, পাদটীকা-৮।

মুসলিম সমাজে বিদ্যমান পর্দা ও অবরোধ প্রথা বিরুদ্ধে সোচ্ছার হয়েছি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও ইংরেজি শিক্ষিত ভাইয়ের কাছে রোকেয়া আধুনিক শিক্ষার স্বাদ গ্রহণ করেন। বাংলার ইতিহাসে নারী প্রগতির অগ্রদূত রোকেয়া বৈবাহিক জীবনে স্বামীর সহায়তায় জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের কিছু সুযোগ পেয়েছিলেন। রোকেয়ার সমকালে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি বলতে গেলে হয়নি। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা চৌধুরাণী গৃহশিক্ষকের নিকট বাংলা শিক্ষা করায় সমাজপতিদের নিন্দা ও অশ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী জাতির দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাক বিবাহ এবং বিবাহিত জীবনেও তিনি অবরোধ প্রথার নির্মম আচরণসহ অন্য নানাবিদ সমস্যা মোকাবিলা করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে সমাজিক ঐতিহ্য ও ধর্মের নামে নারীকে অন্তঃপুরে প্রায় বন্দি রাখাকে তিনি সমাজের চাপিয়ে দেয়া অবিচার বলেছেন। তাঁর মতে, নারী বাহিরে মুক্ত আলো-বাতাসে বের হতে পারে না বিধায় নারীর স্বাস্থ্যভগ্ন হয় এবং মানসিক বিকাশ হয় না; তাঁরা পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল হয়ে বন্দি জীবন কাটান; ন্যায্য অধিকার পেলে তাঁরা চিন্তাশীল ও কর্মদক্ষ হয়ে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি সে যুগের পত্র-পত্রিকায় অনেক মননশীল প্রবন্ধ লেখাসহ তাঁর 'মতিচূর', 'পদ্মরাগ'-এর মত অনেক প্রবন্ধ, উপন্যাস লিখেন। তিনি লেখার মাধ্যমে সমাজকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, নারী শিক্ষিত হয়ে বাইরে কাজ করলে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, সমাজ সচেতন হবে। তাই তিনি নারী শিক্ষার জন্য কলকাতায় 'সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। নারী মুক্তি ও নারীশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি বর্তমান সমাজে নারীর স্থান 'দাসীতুল্য' বলে অভিযোগ ও অনুশোচনা করেন। তিনি নারী সমাজকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "প্রথমে জাগিয়ে উঠা সহজ নহে, সমাজ গোলমাল বাধাইবে, ...ভারবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল-এর বিধান দিবেন, ...কিন্তু সমাজের কল্যাণ নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।"[৮৪] তাঁর লেখা 'বোরখা' 'অবাঙ্গালী' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ আছে। তিনি 'বোরখা' প্রবন্ধে কৃত্রিম পর্দার নমনীকরণ চেয়ে বলেছেন, "আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া অবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠনসহ মাঠে ময়দানে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নেই।"[৮৫]

রোকেয়ার লেখালেখি এবং সমাজ চিন্তা বিশেষ করে নারী জাতির মুক্তি বিষয়ে তাঁর মনোভাবের বিষয়ে মুসলিম সমাজে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এস. এ. আল মুসভী 'অবনতি প্রসঙ্গে' শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেন, "নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারেন না– তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।"[৮৬] নওশের আলী খান ইউসুফজায়ী 'একেই কি বলে অবনতি' প্রবন্ধে বলেন, "আপনারা

৮৪. *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১১ (বঙ্গাব্দ), উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০২।

৮৫. *নবনূর*, বৈশাখ ১৩১১ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৯।

৮৬. *প্রাগুক্ত*, আশ্বিন ১৩১১ (বঙ্গাব্দ), উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০২।

স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"[৮৭] *মিহির ও সুধাকরে* জনৈক লেখক রোকেয়ার প্রবন্ধের বিরোধিতা করে বলেন,

> তিনি উচ্চশিক্ষার ফলে সনাতন মুসলমান ধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে যেরূপ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে ধর্মই একেবারে ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। তিনি ধর্মগ্রন্থগুলোকে মনুষ্য রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ...তিনি যদি তাঁহার মত অভ্রান্ত মনে করেন, তবে জানিলাম তাঁহার দ্বারা এ পোড়া সমাজের বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত হইবার আশা নাই। ...আমি বলি, যে শিক্ষায় ধর্মের প্রতি অনাস্থা জন্মে ও তাহার বন্ধন শিথিল করে, তাহার প্রচলন না হওয়াই বাঞ্চনীয়।"[৮৮]

শুধু উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গই নন, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মত সমাজচিন্তক, যিনি মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত অনৈতিক জীবন থেকে বের করতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি রোকেয়ার নারী মুক্তি বিষয়ক বিশেষ করে তাঁর পর্দা ও অবরোধ বিষয়ক মতের সাথে সহমত পোষণ করেননি।[৮৯]

শ্যামাসুন্দরী দেবী *সাবিত্রী প্রবন্ধাবলী*-তে 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথাকে কারাবাসের সাথে তুলনা করেন। আলাউদ্দীন আহমদ *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায় 'ইসলাম দর্শন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে শ্যামাসুন্দরীর উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে বলেন,

> পরদার ব্যবস্থা কেবল এই অভিপ্রায়ে নহে যে, পবিত্রতা ও শুদ্ধচারিতা স্থাপিত হয়, বরং বংশগত মর্যাদা এবং গৃহকার্যের শৃঙ্খলা ইত্যাদি যাহা কেবল স্ত্রীলোকদের হস্তে ন্যস্ত থাকে; তাহা তাহাদের গৃহে থাকায়, সাধিত হয়, ইহাও পর্দার অন্যতম উদ্দেশ্য। ...এমন সুন্দর ও প্রশংসনীয় অবরোধপ্রথাকে কারাবাসের সহিত তুলনা করা সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা, ...স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা বলিয়া যে চীৎকার করা হইতেছে এবং অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে নানা কথা প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাকে পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?।[৯০]

ইসলাম প্রচারক এর সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদও পর্দা সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাবই পোষণ করতেন।[৯১]

আলোচ্য সময়ে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাকপ্রথা, বাঁদী প্রথা ইত্যাদি আরো কিছু নারী বিষয়ক সামাজিক সমস্যা ছিল। এমনকি হিন্দু সমাজের প্রভাবে বিধবা বিবাহের অপ্রচলনের মত রীতিও মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল। এসব অমানবিক কুপ্রথা সম্পর্কে উনিশ শতকের শেষার্ধে মসলিম মনীষীদের কেউ কেউ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। *বিধবাগঞ্জনা ও বিষদ ভাণ্ডার* নামক গ্রন্থে মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লা কয়েকজন বিধবা নারীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বৈধব্য জীবনের প্রতি ধিক্কার, লাঞ্ছনা ও

---

৮৭. *প্রাগুক্ত*, কার্তিক ১৩১১ (বঙ্গাব্দ)।

৮৮. *মিহির ও সুধাকর*, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃ. ৪-৫।

৮৯. *ইসলাম প্রচারক*, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, পৃ. ৩৩।

৯০ *প্রাগুক্ত*, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩, পৃ. ৮৮।

৯১. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৩-৪০৪।

বঞ্চনার নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের অভিশপ্ত রীতিনীতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। বিধবাবিবাহ না হওয়ায় মুসলিম সমাজে ব্যভিচার বাড়ছে বলে তিনি ঐ গ্রন্থে অভিযোগ করেন।[৯২] মেহেরুল্লাকে অনুসরণ করে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'মোসলেম সমাজ সংস্কার নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ইঙ্গিত করেন, মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ দৃঢ়ভাবে শিকড় বিস্তার করেছে।[৯৩] মোহাম্মদ কফিলউদ্দীন আহমদ 'তারাবাতী-মনোহর' (১৮৯৬) উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহের সমস্যা বিরাজমান বলে উল্লেখ করেন এবং উভয় সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।[৯৪]

'মুসলমান সমাজে স্ত্রী-জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে শেখ জমিরুদ্দীন বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে তুলে ধরেন। তিনি লিখেন:

> সুবিশাল বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। এই তিন কোটি মুসলমানের প্রায় দশ পনের লক্ষ মুসলমানের কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার বিবাহ করিয়া একজনকে বিবি ও অপরকে তাহার বাঁদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে। কত সময়ে কত সরলা, অবলা বালা, কুলমহিলা, নির্মম, অত্যাচারী পাষণ্ড স্বামীর অসহনীয় যাতনা ও কুলকলঙ্কিনী নরপিশাচিনী সতীনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ হলাহল পান, কেহ গলে রজ্জু, কেহ বা আফিং সেবন, কেহ বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে। ...বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ যে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা কেবল রিপু পূজার জন্য কেবল কামপ্রবৃত্তি পূরণ করিবার জন্য। ...বর্তমান বহুবিবাহে রাজনৈতিক উপকার কিছুই নাই ...দিন দিন ব্যয়াধিক্য বশতঃ দীনহীনকাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হইতেছে। তাহারা অর্থাভাবে মূর্খ ও অসভ্য হইয়া সমাজের ঘোর পতন সাধন করিতেছে, তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম কলঙ্কিত হইতেছে।[৯৫]

'বহুবিবাহ' শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রবন্ধে কাজী ইমদাদুল হক বহুবিবাহকে বাঁদীপ্রথার নামান্তর বলে ইঙ্গিত দেন[৯৬] তালাকপ্রথার অপব্যবহার করে নারীর প্রতি অবিচার করা হচ্ছে বলে মোহাম্মদ করম চাঁদ লেখেন,

> মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী এক প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিলেও হয়। ...অধিকাংশ স্থলেই ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত এইরূপ কুরীতি অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই সকল ঘৃণিত ঘটনা অধিক পরিমাণে নিম্নশ্রেণীর বা মধ্যবিত্ত অশিক্ষিত বা অজ্ঞ মুসলমানদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। ...কিন্তু এরূপ কুরীতি যে ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ, হাদিস ও ফেকা শাস্ত্র বহির্ভূত, তাহা উল্লেখ করা বহুল্য মাত্র।[৯৭]

---

৯২. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, *বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার*, যশোর, ১৩৭৫, পৃ. ২৭।

৯৩. Census Report of India, 1891, vol. IV, p. 178, The Lower Province of Bengal.

৯৪. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৫।

৯৫. *ইসলাম প্রচারক*, জুলাই-আগস্ট, ১৯০৩, পৃ. ১৮১-৮৫।

৯৬. *নবনূর*, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

৯৭. মোহাম্মদ কে. চাঁদ, 'তালাক বা মোসলেম স্ত্রী বর্জন', *ইসলাম-প্রচারক*, ৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ১৩১৪ (বঙ্গাব্দ), উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৬।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বাল্যবিবাহ' রীতির প্রচলন ছিল এবং নানাভাবে এর কুফল সমাজ ভোগ করত। কলকাতার অপ্রাপ্ত বয়স্কা ফুলমণির স্বামী হরিমোহন কর্তৃক বলপূর্বক সহবাসের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। এ অমানবিক ঘটনার পর ১৮৯১ সালে সরকার 'সহবাস সম্মতি আইন' আইন পাশ করে। আইনে বলা হয় ১২ বছরের পূর্বে স্বামী স্ত্রীর সহবাস করলে তা ধর্ষণের পর্যায়ে পরবে এবং স্বামী দণ্ডিত হবে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এ আইন প্রযোজ্য ছিল। এ আইনের বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রতিক্রিয়া কম হলেও ঢাকায় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং *ঢাকা প্রকাশ* তাঁর মতামত প্রকাশ করে। সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে তিনি একাধিক বক্তৃতা করে জনমত সৃষ্টি করেন এবং স্থানীয় মুসলিম সমাজের মোল্লা-মৌলভীদের সমর্থন লাভ করেন। তবে বাল্য বিবাহের বিপক্ষে মুসলিম মনীষীদের অনেকেই অবস্থান নিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেহেরুল্লার কথা উল্লেখ করা যায়। *বাল্যবিবাহের বিষময় ফল* নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে, তিনি বাল্যবিবাহের বিষময় পরিণতির ব্যাপারটি তুলে ধরেন এবং এ প্রথার অবসান কামনা করেন।[৯৮]

আমার জীবনী ও *উদাসীন পথিকের মনের কথায়* মীর মশাররফ হোসেন 'দাসী-বাঁদী'র প্রথার বিরোধিতা করেন। বাল্যকালে তিনি তাঁর পরিবারে ৩০-৩২ জন দাসী-বাঁদী' ছিল বলে উল্লেখ করেন। বাঁদীরা অনেক সময় গৃহস্বামীর উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হত। বাঁদীর পুত্র গোলাম বা গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করত।[৯৯] এ প্রসঙ্গে আফতাবউদ্দীন আহমদ বলেছেন, "বান্দীপ্রথা শাস্ত্রানুমোদিত কোন রীতি নয়, ধনীরা নিজগৃহে অসংখ্য দাসদাসী রাখেন, এটি তারই ফল।"[১০০] পারেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের 'বান্দীপ্রথা'র নিন্দা করেছেন।[১০১]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের অনেকেই স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণে নানাভাবে কাজ করেন। অধঃপতিত জড়তা-ক্লিষ্ট মুসলিম সমাজকে আলোর পথের সন্ধান দেয়ার জন্য তাঁরা অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা মুসলিম সমাজের এ দুর্দশার জন্য দায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে চিহ্নিত করেন। মুসলিম সমাজে বিরাজমান দুর্দশা ও সংকীর্ণতার জন্য তাঁদের অনেকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ অল্পশিক্ষিত মোল্লা শ্রেণিকে প্রাথমিক ভাবে দায়ী করেছেন। এটা সত্য যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমাজে বিশেষ করে গ্রাম-সমাজে মোল্লা শ্রেণির প্রভাব ছিল অপরিসীম ও

---

৯৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৬-৪০৭।

৯৯. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, *মীর মশাররফের গদ্যরচনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৫৭-৫৮।

১০০. *নবনূর*, পৌষ, ১৩১০।

১০১. *ভারতী*, শ্রাবণ, ১৩১০।

অপ্রতিরোধ্য। তাঁরা ছিলেন ধর্ম গুরু, শরিয়তের ব্যাখ্যাদাতা তথা রক্ষক। জনৈক কবি মোল্লা শ্রেণির ছবি এঁকেছেন নিম্নোক্ত ভাবে:

মোল্লা পড়ায়্যা কিনা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া পরে কলমা পড়িয়া।
করে ধরি খর ছুরিকুকুরা জবাই করি
দশ গণ্ডা দাম পায় কড়ি।[১০২]

উনিশ শতকের প্রারম্ভে মোল্লাদের সামাজিক অবস্থা ও ভূমিকা ইংরেজ মনীষীদের নজরও এড়াতে পারে নি। উইলিয়াম এ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে (১৮৩৫) মক্তব শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেন,

> The teachers are all Kath-Mollas, that is, the lowest grade of Mussalman Priest, who chiefly derive their support from the ignorance and superstition of the poor classes of their co-religionists ... The Mollas beside teaching ... Perform the marriage ceremony, for which they are paid from one to eight annas according to the means of the party; and also funeral service ... the Mollas also often Perform the office of the village butcher, killing animals for food with the usual religious forms; without which their flesh can not be eaten by Mussalmans.[১০৩]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) মোল্লাদের কঠোর সমালোচনা করে তাঁদের ধর্মান্ধ, প্রতারক, মূর্খ প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করেন।[১০৪] খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদের মতে, "মোল্লারা হল শোষকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শোষক ।"[১০৫] সৈয়দ উদ্দীন খান পূর্বে ইসলাম জগতে মোল্লাদের অবদানের কথা স্বীকার করেন। তবে উনিশ শতকের মোল্লাদের তিনি সংকীর্ণমনা, অপরিণামদর্শী ও স্বার্থপর হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "এরা হয় মূর্খ, নয় পণ্ডিত মূর্খ।"[১০৬] বিশিষ্ট লেখিকা ওমদাতুন্নেসা মন্তব্য করেন, "মাতৃভাষা বাংলা ও রাজভাষা ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে মোল্লা ফতোয়া দেয়, আধুনিক শিক্ষার প্রবক্তা স্যার সৈয়দ আহমদকে যারা কাফের বলেন, কোরান শরীফের অনুবাদক ভাই গিরীশ চন্দ্রকে কাফের হয়ে কোরান স্পর্শ করার অপরাধে যাঁরা তাঁর মাথা কেটে কুকুরকে খাওয়াবে বলে, সেই সব মোল্লা।"[১০৭]

---

১০২. কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল; উদ্ধৃত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৬।

১০৩. Adam's First Report on Vernacular Education in Benga and Bihar, Submitted to the Government in 1835.

১০৪. ইসমাই হোসেন সিরাজী, 'মোল্লাচিত্র', *ইসলাম প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০১।

১০৫. খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদ (সম্পা.), 'ইসলাম ও মুসলমান', *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ২৬৬।

১০৬. সৈয়দ উদ্দীন খান, 'মোল্লা সমাজ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫।

১০৭. ওমদাতুন্নেছা, 'কোন মোল্লার অভক্তি', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০৪।

ইসলামে পৌরহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কোনো স্থান নেই। তাই ইসলাম মোল্লাতন্ত্রকেও সমর্থন করে না। তাই ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টাকারী মোল্লাদের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের উদার ও প্রগতি মনস্ক ব্যক্তিরা সরব হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট দেলোয়ার হোসেন আহম্মদ মির্জাসহ অনেকেই মোল্লাতন্ত্র ধর্মের নামে সামাজিক বিভেদ সৃষ্টিসহ তাদের প্রগতি বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টার করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, অজ্ঞতা, পিরপূজা, কবরপূজা বিরাজমান ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে; যারা ঐ সকল অনাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা জাগ্রত করার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। মূলত তাঁদের প্রয়াসের ফলে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং কুসংস্কার, কু-প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠে। সমাজে জাতিভেদ প্রথা, ভিক্ষাবৃত্তি, আর্থিক দুর্গতি, নারীকেন্দ্রিক নানা সমস্যা প্রভৃতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চিন্তিত করে তুলেছিল। তাই তারা এসবের নিরসনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তাঁদের এ প্রয়াস প্রচেষ্টা এবং দিক-নর্দেশনাই মুসলিম সমাজকে ক্রমান্বয়ে রক্ষণশীলতা ও সামাজিক কুপমণ্ডুতার হাত থেকে রক্ষা করে প্রগতির পথে ধাবিত হতে সাহায্য করে।

দুর্দশাগ্রস্থ মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত প্রয়াসের পাশাপশি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের উদ্যোগে বেশ কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বাংলার মুসলিম সমাজের জাগরণের ইতিহাসে এ সকল প্রতিষ্ঠানের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'আঞ্জুমানে ইসলামী' কলিকাতা (১৮৫৫) ছিল মুসলমানদের প্রথম সংগঠন। শ্রেণি বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব স্তরের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করা ছিল এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১০৮] তদানীন্তত বাঙালি সমাজে এ উদ্যোগ সর্বত্র প্রশংসিত হয়। *হিন্দু ইন্টোলিজেন্সার* ও *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকা দুটি আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাকে সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছিল।[১০৯] ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটেরেরী সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সোসাইটি মুসলিম সমাজ সংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতা আবদুল লতিফ বলেন,

> কুসংস্কার ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে আমি মহামেডান লিটেরেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি।[১১০]

---

১০৮. Jayanti Maitra, *Muslim Politics in Benal*, Calcutta, 1984, p. 75.

১০৯. *Ibid*, p. 75-76.

১১০. নওয়াব আবদুল লতীফ খান সি.আই.ই., (অনুবাদ : আবুজাফর শামসুদ্দীন), *মুসলিম বাংলা : আমার যুগে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৭।

এ প্রসঙ্গে বাংলার মুসলিম জাগরণের আরেক দিশারি সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক ১৮৭৭ সালে 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'র কথা স্মরণযোগ্য।[১১১] আইনসঙ্গত ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি বিধান করা ছিল এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে K. K Aziz উল্লেখ করেন,

> The association has been formed with the object of promotion by all legislative and constitutional means, the well being of the Mussalmans of India. ...Deriving its inspiration from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the Age. The Rules and objects of the Central National Mahomedan Association with a list of the members, Calcutta, 1882.[১১২]

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ ওবায়েদী (১৮৩৪-৮৫)'র সক্রিয় সহযোগিতা ও উদ্যোগে ঢাকায় 'সমাজ সম্মিলনী' ১৮৭৯ ও 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সমিতি' ১৮৮৩ নামে দুটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ দুটির আয়ু ছিল স্বল্প। দ্বিতীয়টি ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর থেকে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিল। প্রথম বছরের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ছিলেন হিম্মত আলী এবং সম্পাদক মোঃ আবদুল মজিদ। আবদুল আজিজ, কাজেম উদ্দীন সিদ্দিকী, মোহাম্মদ হেমায়েতুদ্দীন ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১১৩] সমাজ সংস্কারক ও মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য ১৮৮০ সালে চট্টগ্রামে 'ইসলাম এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। আমান আলী মাষ্টার ও ফাজেম আলী মাষ্টার এ সমিতির কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১১৪] মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ সেবামূলক 'নূর-আল-ইমান সমাজ' ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার এবং ইসলাম প্রচার এ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[১১৫] ১৮৯১ সালে চট্টগ্রামে 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিক্ষার প্রসার ও জনহিতকর কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এর অবদান ছিল অপরিসীম। মুসলিম ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, পাঠাগার স্থাপন, শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে সোসাইটি পরবর্তী কয়েকযুগ পর্যন্ত কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। খান বাহাদুর আজিজ এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ পুরুষ ছিলেন।[১১৬] উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও কিছু ছোট ছোট ক্লাব-সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উনিশ শতকে বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে সমাজে চেতনা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ফলে বিশ শতকের প্রথম দিকে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্মপ্রকাশ করে, যারা মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্ম দেন।

---

১১১. ১৮৮৩ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'।

১১২. K.K.Aziz (ed.), *Ameer Ali: His Life and Work,* Lahore, 1968, p. 46.

১১৩. ইমরান হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১।

১১৪. মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭, পৃ. ১৩।

১১৫. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২।

১১৬. আবদুর রহমান, *যতটুকু মনে পড়ে*, চট্টগ্রাম, ১৯৭২, পৃ. ১৬, ২৬, ২৭৬, ৩৫৭।

উনিশ শতকে বাংলার সমাজ চিন্তার রূপান্তরের ইতিহাসে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। অনেকে মনে করেন, বিদেশি শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার ব্যাপারে সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সামাজিক ঐতিহাসিকরা বিশেষ করে ব্রজেন্দ্রনাথ, বিনয় ঘোষ, আনিসুজ্জামান, মোস্তফা নূরউল ইসলাম, মুনতাসীর মামুন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের গুরুত্ব বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র বাংলার মধ্যশ্রেণির চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করেছিল, অবদান রেখেছিল সমাজ পরিবর্তনে। শুধু তাই নয়, অনেকে মনে করেন, উনিশ শতকে বাংলার 'নবজাগরণের' ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ৭১টি সাময়িকপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীগণ।[১১৭]

উনিশ শতকে বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত সংবাদ পরিবেশ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। এসব সংবাদ ও জ্ঞানগর্ভ আলেচনা সরব ও সাধারণের পাঠোপযোগী করতে গিয়ে সাময়িকপত্রগুলো বাংলা গদ্যের উন্নতির পথ বাধামুক্ত করেছিল।[১১৮] ১৮৩১ সালে ৭ মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সমাচার সভারাজেন্দ্র।[১১৯] এরপর কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের প্রকাশ পেতে থাকে। এসময় শুধু বাংলা সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয়নি, বরং প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি সংবাদপত্রও। উর্দু ও ফারসি সংবাদপত্রও কিছু ছিল। তবে ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল 'মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন' এবং দ্বিতীয়টির 'সমাজ সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার'।[১২০]

সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনার সাথে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই মুখ্যত যুক্ত ছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে জমিদার এবং রাজনৈতিক নেতাদের সম্পৃক্ততার কথাও জানা যায়। পুনশ্চ স্মরণীয় যে, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ বিলম্বিত হওয়ায় সংবাদপত্র প্রকাশনার বিষয়ে মুসলমানদের সম্পৃক্তার বিলম্ব ঘটে। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার (সাময়িকী) সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারোটি বা মতান্তরে চব্বিশটি এবং এর অধিকাংশই ছিল মাসিক। বাঙালি মুসলমান কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয় উনিশ

---

১১৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১-৩।

১১৮. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২২২।

১১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, ১৩৭৯ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭২।

১২০. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪।

শতকের শেষার্ধে। ১৮৮৯ সালে *সুধাকর* প্রকাশ থেকে যাত্রা শুরু। এ প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের অভিমত হল,

> তখন কয়েকজন উদ্যমশীল মুসলিম সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় – যাঁদের সমাজ হিতৈষণা মুসলিম বাংলার ইতিহাস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ...গুষ্ঠি হচ্ছেন : মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন মাশহাদী, মৌলভী মেরাজুদ্দীন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহীম এবং কবি মোজাম্মেল হক। ...এঁরা বুঝতে পারেন বাঙলার মুসলমানদের অভাব অভিযোগ দুঃখ বেদনা ব্যক্ত করার জন্য চাই তার একটা বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক মুখপাত্র। এঁদের প্রচেষ্টায় *সুধাকর* প্রকাশিত হয়।"[১২১]

এর পূর্বে কিছু সাপ্তাহিক-মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলেও তার আয়ু দীর্ঘ ছিল না এবং এগুলো সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ সময়ের পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হত। মালিক বা সম্পাদকদের মধ্যে অনেকেই মাওলানা ছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসীরা নিজ নিজ মতবাদ প্রচারের বাহন হিসাবে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করতেন। এ সময়ের পত্র-পত্রিকার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র *সাওগাত* এর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন বলেন,"তৎকালে বাংলার মুসলমান সমাজে যে সব পত্র পত্রিকা চালু ছিল তার অধিকাংশই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হত। ...নানা রকম বিধিনিষেধের মধ্যে লেখকরা আবদ্ধ ছিলেন। ...আর সেই অন্ধকার যুগে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন মতামত প্রচার করা ছিল বিপদজনক।"[১২২]

গোলাম কিবিরিয়া ভূঁইয়া তাঁর বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ গ্রন্থে উনিশ শতকের ৮০'র দশক থেকে বিশ শতকের গোঁড়ার দিক পর্যন্ত (১৯০৩) মুসলিম মধ্যবিত্ত কর্তৃক প্রকাশিত অন্তত ৩৩টি সংবাদ পত্রের তালিকা যুক্ত করেছেন।[১২৩] মুসলিম সম্পাদিত প্রাথমিক যুগের সংবাদপত্রে ধর্মীয় চিন্তা চেতনা প্রকাশ ও প্রচার ছিল মূল লক্ষ্য। এসব পত্রিকায় সামাজিক দায়িত্বপালনের সচেতন প্রয়াস ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত সংবাদপত্রে আত্ম-পরিচয় ও অবস্থা জানাবার পাশাপাশি মুসলিম সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়াদিও স্থান পায়। নব্য শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পাদিত সংবাদ পত্র মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা, চাকুরি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে জনমত গঠনে মুসলিম সমাজের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এসব সংবাদপত্রে নব্য মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিযোগ ও দাবির পাশাপাশি ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনাও স্থান পায়।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে মুসলিম সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রধাত ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষে সাহায্য করেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, আর এর প্রকাশ বা উদ্যোক্তরা ছিলেন

---

১২১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪।

১২২. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৬-২৭।

১২৩. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া

বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত।[১২৪] সে সময়ে বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত ও সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকেই গভীরভাবে অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনেকেই পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে তাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। এর মাধ্যমে স্ব-শ্রেণির স্বার্থরক্ষা ও চেতনা বিকাশে মূল্যবান ভূমিকা রাখলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা দূরীকরণে এগুলোর প্রসার অনস্বীকার্য।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ নানা ভাবদ্বন্দ্বে ও সমস্যা-সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছিল। ইংরেজদের আগমনে এদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে এ ধারা বাংলার মানসপটে বিপ্লব যতটুকু এনেছিল তাতে সমাজবিপ্লব ঘটাতে পারেনি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার পর দীর্ঘদিন মুসলমানদের সামাজিক নেতৃত্বের অভাব ছিল। ব্রিটিশদের শাসননীতির ফলে বড় বড় বনেদি পরিবার ও ভূস্বামী ধ্বংস হয়ে যায়। চাকরি সুবিধা হারিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণিও দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকে বিত্তহীনে পরিণত হয়। অবশিষ্ট জমিদার যারা ছিলেন, বাংলার সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার মনোভাবও তাঁদের ছিল না। সর্বভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবোধও তখন গড়ে ওঠেনি। নবাব পরিবারগুলো বৃত্তির টাকায় নিষ্ক্রিয় ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করেছেন। ঢাকার উঠতি নব্য জমিদার পরিবার অর্থের জোরে সমাজে প্রভাব বিস্তার করলেও সমাজের কল্যাণের জন্য বেশি কাজ করেনি। আর্থিক কারণে সাধারণ মুসলমানরা উপযুক্ত শিক্ষা এবং ব্যবসায়-বৃত্তিতে অংশ নিতে পারেনি, ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠেনি। এ সময় মুসলিম সমাজ প্রধানত আশরাফ ও আতরাফ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। সংখ্যায় কম হলেও আশরাফ শ্রেণি নিজেদের মুসলিম সমাজের প্রতিভু বলে মনে করতেন। তবে এ শ্রেণিটি সনাতনী চিন্তা ও জীবনবোধে আচ্ছন্ন থাকায় ব্রিটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট নতুন জীবনবোধ সম্পর্কে তাঁরা বলতে গেলে অজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য ব্রিটিশ সরকারে গৃহীত নতুন প্রশাসনিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি তাঁদের অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিলে তারা সম্বিত ফিরে। নিজেদের সামাজিক অবস্থান অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁর ইউরোপাগত জীবনবোধের দ্বারা তাড়িত হতে বাধ্য হন। ফলে তাঁদের চিন্তা, ভাব ও মনোজগতে পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠে। একই কথা প্রযোজ্য নিম্নশ্রেণি বলে কথিত আতরাফদের ক্ষেত্রেও। নবতর পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানোর তাগিদে তাদেরও আর্থ-সামাজিক জীবন বাস্তবতায় পরিবর্তন আনায়নে মনযোগী হতে হয়েছিল। উপরের আলোচনায় এর কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজের বড় অর্জন হলো একটি নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। এদের অধিকাংশই ছিল নগরবাসী এবং পেশাজীবী শ্রেণির লোক। প্রতিবেশি হিন্দু সমাজের

---

১২৪. *আল হক্*, ১ম বর্ষ, বর্ষা সংখ্যা, ১৩২৬।

মধ্যবিত্তদের মতো এ শ্রেণিটিও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করেন। অনেকেই আবার অন্যান্য স্বাধীন পেশা যেমন সাংবাদিকতা, আইনপেশা, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। কালক্রমে এ নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণিই মুসলিম সমাজের মর্যাদাবান নেতৃস্থানীয় অবস্থানে উন্নীত হন। এরাই বাংলার মুসলিম সমাজের সনাতনী চিন্তার ভিতে চিড় ধরান। মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল অংশ হিসেবে তাদের সার্বিক অনগ্রসরতা দূরীকরণে সচেষ্ট হন। তাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেন। সর্বোপরি এ শ্রেণিটিই বাংলার মুসলিম সমাজকে তাদের অধিকার সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পরিশেষে লা যায় যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত বাস্তবতায় একটি নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের মাধ্য মুসলিম সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটে এতে সমাজে আশরাফ-আতরাফ বিভাজন ধীরে ধীরে অবসান হতে থাকে। এতে মুসলিম সমাজ গতিশীল হয় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির চিন্তার সাথে সাথে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় চিন্তনের রূপান্তর ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হজরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) আরব ভূমিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন। এ ধর্ম কালক্রমে আরব থেকে ইরান, তুরস্ক, মিসর, স্পেন, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ ও দূর-প্রাচ্যের দেশসমূহে বিস্তার লাভ করে। অষ্টম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ঐ সময় এবং তারপর থেকে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকগণের মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হতে থাকে। বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার ও বিস্তারের সাথে সাথে মুসলমান সমাজের পত্তন ও বিকাশ ঘটতে থাকে।[১] বাংলার জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে এ তথ্যটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে নানা ধরনের বিশ্লেষণ ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। এ বিপুলসংখ্যক মুসলমানের আদি বৃত্তান্ত নিয়ে বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে বাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের বহিরাগত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তবে 'Calcutta Gazette'-এ বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ২৫,০০০ জন বলে রিপোর্টে প্রকাশ করে।[২] আধুনিক গবেষকদের মধ্যে আবদুল করিম (১৯৫৯), এম. এ. রহিম (১৯৬৩), ও মৈত্র (১৯৮৪) ধর্মান্তরের মাধ্যমেই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তবে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি দু'ভাবেই হয়েছিল। বিদেশ থেকে বিরামহীনভাবে মুসলমানদের আগমন এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩] আকবর আলি খান বলেন,

> বাংলাদেশ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইসলাম ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে কতগুলো অমীমাংসিত প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছে। ... বাংলায় ইসলাম ধর্ম ছিল গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত কৃষিজীবী, কাঠুরে, জেলে ও মাঝিদের ধর্ম। ... নরগোষ্ঠীর বিচারে বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের সমগোত্রীয় এবং সম্ভবত স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের সন্তান।[৪]

পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতির ন্যায় মুসলমানরাও বিজিত হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। মুসলমান সমাজ জীবনে আচার-অনুষ্ঠান, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, জীবনযাপনের ধরন ও পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রভাব বর্তমানকাল পর্যন্ত লক্ষণীয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলায়

---

১. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪৩৬।

২. Khondker Fuzil Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal*, Culcutta, 1895, p. 12.

৩. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯২-৯৩।

৪. আকবর আলি খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৭৭-৭৮।

ইসলাম ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা বিকৃত রূপ দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে এখানে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে।[৫] উনিশ শতকে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় পরিচালিত এ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে 'ওয়াহাবি' বা 'তরিকায়ে মুহাম্মদী', 'ফারায়েজি আন্দোলন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত কমবেশি ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ওয়াহাবি আন্দোলন এক সংগ্রামমুখী এবং বিতর্কিত ধারার সূচনা করেছিল। ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করেন রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ বেরলভি (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.)। মক্কায় হজ্জ পালনকালে তিনি আরবের নেজাদ প্রদেশের দরয়ার অধিবাসী মুহাম্মদ-বিন-আবদুল ওয়াহাব[৬]-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং দেশে ফিরে এসে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। সৈয়দ আহমদের পাঁচ জ্ঞানদীপ্ত ভাবশিষ্য, মৌলভি ইসমাইল শহিদ, মওলানা আবদুল হাই, মৌলভি মাসুদ আলি, মৌলভি বিলায়েত আলি এবং মৌলভি এনায়েত আলি এদেশে ওয়াহাবি ভাবধারার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। এ পাঁচজন এবং তাঁদের ভাবশিষ্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারত তথা বাংলার নানা প্রান্তে ওয়াহাবি জনমত জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৭] ওয়াহাবিরা ছিলেন 'মুওয়াহহেদুন' বা খাঁটি একেশ্বরবাদী। ওয়াহাবি যেহেতু ইসলামের সনাতন মতাদর্শে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন, তাই তারা ইসলামের অন্য গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ও হায়দরাবাদের নিজাম ওয়াহাবি ধারায় দীক্ষিত হলে এদেশের ওয়াহাবি মত সাধারণের গণ্ডি ছেড়ে উচ্চবর্গেরও সমর্থন লাভ করে। বিহার ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে ওয়াহাবি জনমত

৫. আজিজুর রহমান মল্লিক (অনুবাদ- দিলওয়ার হোসেন), *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১।

৬. শায়খ মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২খ্রি.): এ মহান মনীষী ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবের বর্তমান রাজধানী রিয়াদের পশ্চিমউত্তর দিকে অবস্থিত উয়াঈনাহ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনের শুরুতেই পিতার কাছে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সে সময়ের মুজদ্দিদ, মুজতাহিত ও সফল সমাজসংস্কারক হিসেবে ইসলামি বিশ্বে ব্যাপকভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলিম বিশ্ব যখন ইসলামি আকিদাহ তাহজিব, তামাদ্দুন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখে এবং শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার দ্বারা সমাজ আচ্ছাদিত তখন এ মহান ব্যক্তিত্বের গৃহীত কোরান-সুন্নাহ ও সালফে সালিহিনের অনুসৃত দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কাজগুলো সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁর রচনাগুলো এখনও ইসলামের পাঞ্জেরিরূপে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিকপথ নির্দেশ করে যাচ্ছে। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– কিতাবুল তাওহিদ, কাশফুশ শুবুহাত, আল উসুলুছ ছালাছাহ ওয়া আদিল্লুতুহা, শুরুতুস সালাহ ওয়া আরকানুহা, আল কাওয়ায়িদ আল আরবায়াহ, উসুনুল ইমান ইত্যাদি। তাঁর দাওয়াত ইয়ামেন ও উপসাগরীয় দেশসমূহসহ ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কিস্তান, চীন, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও সুদান অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্ধকার দূর করে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে এ ইসলামি আন্দোলন বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর দাওয়াতেই সৌদি আরব একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; যা আজও মুসলিম বিশ্বের প্যান-ইসলামিক ধারণাকে পোষণ করে চলছে। ওয়াহাবি আন্দোলনের অনুপ্রেরণাই পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের উৎস হিসেবে কাজ করেছিল। কারো কারো মতে, ভারতের জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত সর্বপ্রথম আন্দোলন সূচনা করে ওয়াহাবিরাই। ভারতের কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। শায়ক মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (রহ.) ১৭৯২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, 'শায়ক মুহম্মদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ.) : জীবন ও কর্ম', *গবেষণাপত্র সংকলন-৫*, পৃ. ৫৫-১৩৪; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৪-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৩-৪।

৭. কাজী সুফিউর রহমান, *মুসলিম মানস সমাজ রাজনীতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৪৭)*, রেডিয়্যান্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২০।

বিস্তার লাভের পেছনে পাটনার সাদেক মহল্লার তিন জন মৌলভি এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।[৮]

উনিশ শতকে বাংলায় সূচিত ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হলো 'ফরায়েজি আন্দোলন'। ইসলামকে ঘিরে যেসব স্থানীয় অনৈসলামিক সামাজিক লোকাচার প্রবর্তিত হচ্ছিল সেগুলো পরিহার করে বিশুদ্ধ ও মৌলিক ইসলামে ফিরে যাওয়াই ছিল ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। আহমেদ হোসেন দানী মনে করেন, সমকালীন বাংলায় পরিচালিত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে যেসব গবেষণা সমাপ্ত হয়েছে সেগুলো প্রধানত আরবের তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং অন্যান্য আন্দোলনগুলোকে ওয়াহাবি আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ... এর ফলে আন্দোলনগুলোর ঐতিহাসিক চরিত্র অনুধাবন করা যায় নি।[৯] কেননা ওয়াহাবি জীবনাদর্শ সপ্তম শতাব্দীর ইসলামকে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের জীবনে মূর্ত করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা অসম্ভব। ধর্মীয় ঝোঁক স্থানুত্বের দিকে, প্রতিক্রিয়াপরায়ণতার দিকে, আর সংস্কৃতির প্রকৃতি গতিশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা। তাই গোপাল হালদার বলেন,

> বাংলার ওহাবি নেতা হাজি শরীয়তুল্লাহ (বৃহত্তর ফরিদপুর বর্তমানে শরীয়তপুর) বা তাঁর ছেলে দুদু মিয়া কিংবা ওহাবি বিদ্রোহী তিতুমির (২৪ পরগণার) বাঙলী মুসলমানদের ধর্মগত নেতৃত্ব লাভ করতে পারেননি ফরাজিদের সঙ্গে পুরনো মওলবি মোল্লার ফতোয়ামত সাধারণ মুসলমান একসঙ্গে নামাজ পড়তেও অস্বীকার করতেন।[১০]

তবে উত্তর-ভারতের শাহ ওয়ালিউল্লাহ[১১]-র ধর্মীয় শিক্ষা বাংলায় বিস্তার লাভ করলেও এ অঞ্চলে ফরায়েজি আন্দালনের সূচনাকারী হাজি শরীয়তউল্লাহ আরব শুদ্ধিবাদ থেকে সরাসরি অনুপ্রেরণা পান। তাঁর সূচিত

---

৮. *Processdings of West Bengal State Archives* (WBSA), File No. 611906, Movement among the Wahabis, p. 13.

৯. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান (অনুবাদ : গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া), *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. মুখবন্ধ।

১০. মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদনা), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭১।

১১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.): ভারতীয় উপমহাদেশের এ বিশিষ্ট প্রতিভাবান ইসলামি চিন্তাবিদ, আলিম, মুজতাহিদ, দার্শনিক ও সমাজসংস্কারক ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি/৪ শাওয়াল ১১১৪ হিজরি রোজ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার শেখ আবদুর রহিম সৈনিক বিভাগের পেশা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতা ও বিদ্যাচর্চা শুরু করেন এবং দিল্লির মেহেন্দিয়াকু মহল্লাতে এক মাদরাসা স্থাপন করেন। আর মাদরাসা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এ বংশের লোকদের শিক্ষকতা পেশা হিসেবে দাঁড়ায়। তাঁর পিতা ছিলেন হজরত ওমর (রা.)-এর বংশধর ও মাতা ছিলেন হজরত আলি (রা.)-এর বংশধর। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৫ বছর বয়সে মক্তবে ভর্তি হন এবং ২ বছর অধ্যয়ন করেই লেখাপড়া ও কোরান পড়া আয়ত্ত্ব করেন। মক্তবে তিনি ফারসি ভাষাও শেখেন। ১৪ বছর বয়সে তিন প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি শেখ তানাল্লাহের মেয়েকে বিয়ে করেন। সে স্ত্রীর ঘরে জন্ম হয় ভূবন বিখ্যাত ৪ পুত্র এবং ১ কন্যা সন্তানের। যারা প্রত্যেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম-সমাজসংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৫ বছর বয়সেই তিনি পিতার কাছ থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নখশবন্দিয়া তরিকায় বায়'আত গ্রহণ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাদরাসা থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি শেষ করেন এবং পিতার মৃত্যুর (১৭১৯) পর তিনি পিতা প্রতিষ্ঠিত রহীমিয়া মাদরাসায় একটানা ১২ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর তিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করেন। মক্কা-মদিনায় গমন করে তথাকার হাদিসবিদদের নিকট হাদিসের ওপর উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। নজদের মুহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২ খ্রি.) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। তাঁরা উভয়েই হেজাজের জনৈক খ্যাতিমান শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সংস্কারক শায়খ মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সাহচর্যের ফলে শাহ সাহেবের মধ্যেও সমাজসংস্কারের প্রেরণা জাগে। ১৭৩৩

আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ফরায়েজি আন্দোলনের দু'টি বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, মুসলিম কৃষকশ্রেণির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচারকে শুদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত, তাদের সংস্কার করা ধর্মমতকে কায়েমি স্বার্থান্বেষী জমিদার ও নীলকরদের থেকে সুরক্ষা করা। প্রথমটি ছিল ধর্মীয় দিক, যেটি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের পটভূমিতে আলোচনা করতে হবে। ফরায়েজি আন্দোলনের গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য উত্তর ভারতের নগরভিত্তিক ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলন থেকে সুস্পষ্টভাবেই আলাদা ছিল। অতএব উত্তর ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে বাংলায় সূচিত ফরায়েজি আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে এতদবিষয়ে আলোকপাতসহ উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় চিন্তনের রূপান্তর এবং সমাজ জীবনে এর প্রভাব প্রতিক্রিয় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ কোনো একক ঘটনা বা ব্যক্তির অবদানপ্রসূত ফল নয়। সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-এলাহি ও অন্যান্য অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত হজরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দির (র.)[১২] সংস্কার আন্দোলন

খ্রিস্টাব্দে ২ জানুয়ারি/ ১৪ রজব ১১৪৫ হিজরি তিনি দেশে ফিরে ৯ জুলাই রহীমিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত করেন। এক শিক্ষক এক শ্রেণি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। আমরণ শিক্ষাদান করে তিনি ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট/ ২৯ মহররম ১১৭৬ হিজরি ৬১ বছর ৪ মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন। সম্রাট শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রি.) তাকে সাহানদিয়া সংলগ্ন কুনি দারওয়াজে সমাহিত করেন। মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষাকল্পে তিনি ও তাঁর পিতা পতনোন্মুখ মোগল শক্তিকে জোরদার করার জন্য নিজামুল মূলক, নাজিবুদ্দৌলা, পায়েন্দা খান রোহিলা, আহমদ শাহ আবদালি প্রমুখ মুসলমান নেতাদের কাছে আহ্বান জানান। কোরানের ব্যাখ্যা, ধর্ম-দর্শন, তাসাওফ, ইতিহাস, ফিকাহ, হাদিস ইত্যাদি মুসলিম শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৪০ খানা বই রচনা করেন। শাহ সাহেব বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের মতবাদসমূহের মধ্যে বিরাজমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি মুজাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল সম্প্রদায় ও মাজহাবের ঊর্ধ্বে উঠে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেন। শরিয়তের যাবতীয় বিধানের পেছনে নিহিত দর্শন সংবলিত তাঁর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো : 'ইজালাতুল খিকা' আল ফওজুল কবির, ফাতহুর রহমান, মুসাফকা, মুসত্তওয়া, তাজরিদুল বুখারি, তাবিলুল আহদিস, ইকদুল জিদ, আকওয়ালুল জামিল, লামআত, আল-বুদুরুল বাজিগাহ। (আব্বাস আলি খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৭; পৃ. ২৪২-২৪৩; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৯; মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, আল-আমিন রিসার্চ একাডেমি বাংলাদেশ, ঢাকা ২০১১, পৃ. ১৯৬-২০২; Barbara Daly Metcal, *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*, Oxford University Press, New Delhi, 2002, pp 35-45; Maulana Muhammad Miyan (Tr. by Muhammadullah Qasmi), *Silken Letters Movement*, Shaikul Hind Academy, Darul Uloom Deoband, Manak Publication Pvt. Ltd, New Delhi, 2012, pp.37-39.

১২. শায়খ আহমদ সেরহিন্দি (১৫৬৩-১৬২৪ খ্রি.): শায়খ আহমদ সেরহিন্দি মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানি (রা.) পাঞ্জাবের তৎকালীন পাত্রেয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত বিখ্যাত সেরহিন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা শেখ আবদুল আহাদ (র.)। শায়খ আহমদ পবিত্র কোরান হিজফ করার পর পাঠোপযোগী কিতাবসমূহ পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। এরপর শিয়ালকোট ও কাস্মিরে গমন করে মোল্লা কামালউদ্দিন কাস্মির (মৃ. ১০১৭ হি.) ও শায়খ ইয়াকুব সরকির (মৃ. ১০০০ হি.) নিকট থেকে হাদিস, তাফসির ও মান্তিক-হিকমত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম বীর বাকি বিল্লাহ (রা.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। শরিয়ত ও মারিফত সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি অধ্যপনায় মনযোগী হন। কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীন মুসলিম নামধারী সম্রাটগণ যখন ইসলামকে ধ্বংসসাধনে লিপ্ত এবং অজ্ঞতা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে সারাদেশ আচ্ছন্ন এবং দরবারি আলেমরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত, আলেম ও পির সাহেবরা মাদরাসা শিক্ষা ও খানকা পির মুরিদি নিয়ে মশগুল; তখন এ মহান সংস্কারক শায়খ আহমদ গর্জে উঠেন। তিনি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন এবং সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের ইসলাম বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি হন। তাঁর সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তদ্রূপ ভারতবর্ষের

পরবর্তীকালে তাঁরই উত্তরসূরি হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) পরিচালনা করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুসলিম মিল্লাতকে এক বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে রক্ষার নিমিত্তে হজরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দির সংস্কার আন্দোলন জোড়ালোভাবে পরিচালনা করেন। তিনি শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি, ইসলামের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি পালন এবং নৈতিক শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে লেখনি ধারণ করেন।[১৩] মক্কাতে তখন তাঁর সমসাময়িক নেতা হজরত মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব চেয়েছিলেন ইসলামে সবরকম পৌত্তলিক অনুপ্রবেশের মুলোৎপাটন করে খাঁটি তাওহিদের বাণীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং আরবের সবরকম রাজনৈতিক গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে শুধু ইসলামী সাম্য ও মৈত্রীনীতির সূত্রে সমস্ত আরবভূমিকে এক সুতায় বেঁধে দিতে।[১৪] তিনি মুসলমানদেরকে মোহাম্মদি তরিকায় ফেরত আনার জন্য তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কবর জিয়ারত, কবরের উপর ইমারত নির্মাণ না করা; বিদ'আত-এর বিরুদ্ধে অবস্থান, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, কাফির ঘোষণা ও জিহাদ করার নীতিমালা, ইজতিহাদ ও তকলিদ এ সমস্ত বিষয় তিনি মানুষের মধ্যে প্রচার করে ইসলামকে সমুন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রসারের জন্য তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আজও কালের সাক্ষী হিসেবে মানুষের মধ্যে ইসলামী প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।[১৫]

বর্তমান গবেষণায় আরবের ওয়াহাবি আন্দোলন বা আবদুল ওয়াহাব মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়। তবে আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শে প্রভাবিত হয়েই সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র চিন্তাধারার উদ্বুদ্ধ হয়ে শাহ আবদুল আজিজ-এর পরামর্শে ভারতে তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন; যা বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই আলোচনার ধারাবাহিকতার জন্য আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

প্রথমেই বলা দরকার যে, আরবদেশে 'ওয়াহাবি' নামাঙ্কিত কোনো মাযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরবদেশের বাইরে বিশেষত তুর্কিদের ও ইউরোপীয়দের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত। কোনো কোনো ইউরোপীয় লেখক, যেমন- 'Neibuhr' আবদুল ওয়াহাবকে পয়গম্বর পর্যন্ত বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, আবদুল ওয়াহাব কোন মাযহাবও সৃষ্টি করেননি। তিনি ইমাম হাম্বলের মতানুসারী ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বনবি ও খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, সেই পূর্বের ইসলামে প্রত্যাবর্তন

আলেমসমাজের মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ মনীষী ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মোহাম্মদ রুহুল আমীন, '*মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানির সংস্কার আন্দোলন*', ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৭- ৯।

১৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১।

১৪ আব্বাস আলি খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৩৪।

১৫ মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫।

করা। তাঁর আরও শিক্ষা ছিল, ধর্ম কোনো শ্রেণিবিশেষের অধিকার নয়; কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দেওয়াও ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণিবিশেষের একাধিকার নয়, কোনো যুগবিশেষের মধ্যেই সীমিত নয়, প্রত্যেক আ'লেম বা শিক্ষিত ব্যক্তির অধিকার আছে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়ার। তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ প্রধানত ইবনে তাইমিয়্যা[১৬] ও তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন পুঁথিতে বিধৃত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। যদিও আবদুল ওয়াহাব অনেক বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত নন।

আবদুল ওয়াহাব নামাজ ও রোজার দিকে বিশেষ লক্ষ রাখতেন এবং এ দু'টির অবমাননাকারীকে কখনও ক্ষমা করতেন না। তাঁর শিক্ষাসমূহ কালক্রমে একটা ধারাবাহিক রূপ গ্রহণ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা সেটিকেই ওয়াহাবি অপভ্রংশে প্রচারিত করে।[১৭] তাঁর শিক্ষাসমূহ 'কিতাব উৎ-তওহীদ'-এ বিশদভাবে বিধৃত হয়েছে; যা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–

১. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত পাপ এবং যারাই অন্য কারও উপাসনা করে, তারা বিধর্মী।
২. অধিকাংশ মানুষই তওহীদ বা একেশ্বরবাদী নয়, তারা ওলি বা সন্তদের মাজারে গমন করে ও আশীষ প্রার্থনা করে; তাদের এসব আচার কুরআনে বর্ণিত 'মক্কার মুশ্‌রেকীন'দের অনুরূপ।
৩. ইবাদতকালে নবি, ওলি ও ফেরেশতাদের নাম গ্রহণ করে প্রার্থনা করা 'শিরক বা বহু বেদার্চনার মতেই নিন্দনীয়।
৪. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও মধ্যবর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করা শিরক্ মাত্র।
৫. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিকট উৎসর্গ বা মানত করা শিরক্ মাত্র।
৬. কুরআন, হাদীস এবং যুক্তির সহজ ও অবশ্যম্ভবী নির্দেশ ব্যতীত অন্য জ্ঞানের আশ্রয় করা কুফর বা অবিশ্বাস মাত্র।
৭. কদর বা আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানে সন্দোহ প্রকাশ বা অবিশ্বাস করা ধর্মবিরুদ্ধতা (ইলহাদ)।
৮. কুরআনের 'তা'বিল' বা উপাদনগত ব্যাখ্যাদান ধর্মবিরুদ্ধতা।

ইবনে হাম্বল থেকে আবদুল ওয়াহাব বিরুদ্ধ মতামত নিম্নলিখিত বিষয়ে সুস্পষ্ট:

১. জামাতে সালাত আদায় অবশ্য কর্তব্য।
২. তামাক সেবন নিষিদ্ধ এবং এরূপ অপরাধে চল্লিশের অনধিক বেত্রদণ্ড যথেষ্ট। দাড়ি কামানো ও গালি দেওয়ার শাস্তি কাজীর ইচ্ছানুযায়ী।

---

১৬. ইবনে তাইমিয়া (৬৬১ হিজরি/ ১২৬৩ খ্রি. – ৭২৮ হিজরি/ ১৩২৮ খ্রি.) : ইবনে তাইমিয়া ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী। ইসলামী অনুশাসনে ইজমার প্রয়োগ নিষেধ করে তিনি প্রচার করেন যে, কুরআনের বিধি ব্যবস্থা অক্ষরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তার বাধ্য করতে হলে কুরআনেরই আশ্রয় নিতে হবে। তিনি যাবতীয় বেদাতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন এবং পীরবাদ ও তার আনুষঙ্গিক সব অনুষ্ঠানকে নিছক পৌত্তলিকতা বলে ঘোষণা করেন। ইসলামে 'পিউরিটানিক' বা অতিনৈতিক মতবাদের গোড়াপত্তন হয় ইবনে তাইমিয়ার শিক্ষা থেকে। (আবদুল মওদুদ, *ওহাবী আন্দোলন*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৮৮; আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১২৪।

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩।

৩. অপ্রকাশ্য মুনাফার, যেমন– ব্যবসায়িক মুনাফার উপর যাকাত দিতে হবে। ইমাম হাম্বল মাত্র প্রকাশ্য আয়ের উপর যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪. কেবলমাত্র কলেমার উচ্চরণই মোমেন বা বিশ্বাসী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়; যাতে তার জবেহ করা জীব হালাল হতে পারে। তার চরিত্র নিখুঁত কিনা, তারও অনুসন্ধান করা উচিত।

আবদুল ওয়াহাবের অনুসারীদের তসবিহ গণনা নিষেধ। কারণ এ আচরণটি বৌদ্ধদের নিকট থেকে নেওয়া। তার বদলে আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে আল্লাহর গণনা করার নিয়ম চালু করা হয়। এছাড়া মসজিদ, মাজারের নকশার কাজ তুলে দেয়া হয়। তুর্কিদের প্রবর্তিত মিনারও সরিয়ে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে অতি সাধারণ ও অলংকারশূন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

'রওযাত-আল-আফকার' গ্রন্থে আবদুল ওয়াহাবের সময়ে কতগুলো রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত থাকার উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো পৌত্তলিকতা বা প্যাগান নীতির অনুসরণমাত্র। যেমন– কবরে ফুল দেওয়া, দ্বীপ জ্বালানো, খাবার দেওয়া, বৃক্ষপূজা করা। আবদুল ওয়াহাব এসকল আচার-রেওয়াজ একেবারে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি জনসমাবেশ করে সীরাতুন নবির প্রচলিত আলোচনা উৎসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মাজারে-মকবেরায় সমস্ত সমাধিসৌধ ও অলংকরণ নষ্ট করে দিতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। জুবাইলায় সায়েদ-বিন-খাত্তাবের কবরের উপর নির্মিত সমাধিসৌধ তিনি নিজে ধ্বংস করেছিলেন।

আবদুল ওয়াহাবের শিক্ষাসমূহ নিরাসক্তভাবে অনুধাবন করলে মনে হয়, যে সব কাজ বিদায়াত, শিরক্ ও কুফরের প্রশ্রয় দেয় এবং 'ইলহাদ' বা ধর্মবিরুদ্ধ সেসবের উৎখাতকরণে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এ বিশ্বাসে চালিত হয়েই উনিশ শতকের প্রথম দশকে কারবালা, মদিনা ও মক্কার মাজার-মকবেরা উৎখাত করা হয়েছিল এবং সৌধ ও মিনারগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল। যেমন হয়েছিল ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান সউদী শাসন কর্তৃপক্ষের আমলে। আবদুল ওয়াহাব ছিলেন ইজতেহাদের প্রধান সমর্থক। তাঁর মতানুসারী বর্তমান সউদী আরবের শাসন কর্তৃপক্ষ এ প্রত্যয়ে আস্থাবান। তাঁর একান্ত পাওবন্দ বাদশা ছিলেন আবদুল আযীয। আবদুল ওয়াহাবের মতো তিনিও ধর্মীয় বিষয়ে কঠিন অনমনীয় নীতি অনুসরণ করতেন।

উনিশ শতকে আবদুল ওয়াহাবের মতানুসারীদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অকৃতকার্য এবং রাজশক্তি নষ্ট হয়ে গেলেও তাঁর পিউরিটানিক সংস্কারধর্মী আন্দোলন চলমান ছিল। নবরূপে ইসলামী প্রাণধারায় তাঁর শিক্ষার মহিমা দেশে দেশে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল– মিশর, তুরান, ইরান, ভারতীয় উপমহাদেশ, এমনকি জাভা-মালয়তেও তাঁর শিক্ষার বাণী আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল।[১৮]

ভারতবর্ষে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ বাংলার পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। প্রতিবেশী হিন্দুজাতি বিদেশি বণিক ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এদেশের শাসনকার্য থেকেই

১৮. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, পৃ. ৯৩-৯৬।

কেবল মুসলমানদের বঞ্চিত করেনি, মুসলমানদের আর্থিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়েরও সূচনা করেছিল।[১৯] এ বিষয়ে স্থানীয় হিন্দু সমাজ নব্য শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিম সমাজের বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী হিন্দু সমাজের এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ আসে মুসলমান উলেমা সমাজের কাছ থেকে, মুসলিম রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে নয়। প্রথম প্রতিবাদ করেন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ। তিনি ঘোষণা করেন, ইসলাম তাঁর ধর্মীয় বিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা- এ দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ বিধর্মীদের হাত থেকে ইসলাম, মুসলিম সমাজ ও মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষাকল্পে মুঘল শক্তিকে জোরদার করার জন্য নিজামুল মূলক, নাজিবুদ্দৌলা, পায়েন্দা খান, রোহিলা, আহমদ শাহ আবদালি প্রমুখ মুসলমান নেতাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন।[২০]

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ কুরআনের তাফসির বা ব্যাখ্যা, ধর্ম-দর্শন, তাসাউফ, ইতিহাস, ফিকাহ, হাদিস ইত্যাদি মুসলিম শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়েবহু মূল্যবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতবাদসমূহের মধ্যে বিরাজমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবকে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং জাতীয় জীবনে নৈতিক ও ব্যবহারিক বিকৃতি বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলার কারণ বলে তিনি মনে করতেন।[২১] ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ ও চিন্তা-গবেষণার ফলে তাঁর মনোজগতে ইসলামী রাষ্ট্রের এক রূপরেখা প্রতিভাত হয়েছিল। তবে তাঁর মতামত হলো ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সত্যিকার ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের লোক তৈরি করা হলো পূর্বশর্ত। এ জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেন ইসলাম সংস্কার আন্দোলনে যার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার সাধন করে ইসলামকে তার প্রাথমিক পবিত্রতা ও জীবনীশক্তিতে ফিরিয়ে আনা এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করে পুনরায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান রাখা। এজন্য তিনি মুহম্মদ আবদুল ওয়াহাবের ন্যায় মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার ও অনাচারের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করেন।[২২]

ভারতীয় উপমহাদেশে যত আন্দোলন হয়েছিল তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহর 'সংস্কার আন্দোলন'। ১৭৬২ সালে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি (র.)[২৩] (১৭৪৬-

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭।

২০. সত্যেন সেন, *বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১০।

২১. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ ও রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ (সম্পা.), *বরেন্দ্র বরেণ্য অধ্যাপক এ. কে. এম. ইয়াকুব আলি সংবর্ধনা গ্রন্থ*,পৃ. ৬০০-৬০১; আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১২০।

২২. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৯।

২৩. শাহ আবদুল আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩ খ্রি.) : শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০৩- ১৭৬২ খ্রি.) দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে জন্ম হয় ভুবন বিখ্যাত ৪ পুত্র এবং ১ কন্যা সন্তানের। তারা ছিলেন শাহ আবদুল আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩ খ্রি.), শাহ রফিউদ্দিন (১৭৫০-১৮২০ খ্রি.), শাহ আবদুল কাদের (১৭৫৪-১৮১৫ খ্রি.), শাহ আবদুল গনি (১৭৫৮-১৭৮৯ খ্রি.) এবং আমানত আল আজিজ। শাহ আবদুল আজিজ (র.) ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর হাদিস ও তাসাউফ শিক্ষাদানে দিল্লির রহিমীয়া-মাদ্রাসায় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৬০ বছর ব্যাপী এ সাধনা চালিয়ে যান। ভারতীয় আলেমসমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম

১৮২৩) ভারতকে 'দারুল হরব' (শত্রুর দেশ) ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রকৃতি বা চরিত্র দান করেন। [২৪] পিতার ন্যায় আবদুল আজিজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। তবে তাঁর সময়ে ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করা মোটেও সম্ভব ছিল না। তাই তিনিও আন্দোলনকে পিতার ন্যায় সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলনরূপে পরিচালনা করেন। তাঁর এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মুসলমানদের জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু 'দারুল হরব' ঘোষণায় পেক্ষাপট পাল্টে যায়।[২৫] ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ঘোষণা দেয়, "এখন থেকে আল্লাহর সৃষ্টি বাদশাহ সালামতের রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব চলতে থাকবে।[২৬] এ ঘোষণায় ভারতের মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কোম্পানির এ দাম্ভিক উচ্চারণের প্রতিবাদে শাহ আবদুল আজিজ (র.) ১৮০৩ সালে ঘোষণা করেনঃ

> When infidels get hold of a Muhammadan Country it becomes impossible for the Musalmans of the Country and of the people of the neighboring districts of drive them away or to retain reasonable hope of ever doing so; and the power of the infidel increases to such an extent that they can abolish to retain the ordinances of Islam according to their pleasure; and no one is strong enough to seize on the revenues of the country without the permission of the infidels; and the (Musalman) in-habitants do no longer live so secure as before; such a country is politically a country of the enemy (Dar-al-harb). [২৭]

শাহ আবদুল আজিজ (র.) এদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ফাতোয়া জারি করেন যে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদে শরিক হওয়া তাদের সকলের ধর্মীয় কর্তব্য।[২৮] তাঁর এ ফাতোয়া ভারতের এক প্রান্ত থেকে

ব্যক্তি যিনি এ দেশকে নির্ভয়ে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া জারি করেন। বিধর্মী ইংরেজ শাসিক দেশে মুসলমানদের সামাজিক ও দ্বীনি অবস্থা কী হবে-এ প্রশ্নটি মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে রেখেছিল। শাহ আবদুল আজিজ উদাত্ত কণ্ঠে ও অকুতোভয়ে ঘোষণা করলেন যে, অনৈসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাধীন ভারত হচ্ছে 'দারুল হরব'। এখানে নিশ্চিন্তে ও সন্তুষ্টচিত্তে মুসলমানদের বসবাস করা ইমানের পরিপন্থি। হয় তাদেরকে জেহাদ করে এদেশকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে, অন্যথায় হিজরত করে অন্যত্র গমন করতে হবে। তাঁর এ ঘোষণা মুসলমানদের মনে প্রাণে জেহাদের এক দুর্দমনীয় প্রেরণার হিল্লোল প্রবাহিত করে। স্বৈরচারীর প্রভাব থেকে মুসলিম ভারতকে মুক্ত করার আকুল আগ্রহে তিনি প্রবর্তন করেন 'তারিকায়ে মুহম্মদীয়া' নামে সমাজসংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল- যেসব ইসলাম বিরুদ্ধ রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার মুসলিমসমাজে অনুপ্রবেশ করেছে তার মূলোচ্ছেদ করে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এক সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শাহ সাহেব সারা ভারতে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং এ কাজে নিয়োগ করেন তাঁরই নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তকর্মা ছাত্রসমাজ। কালক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ 'তারিকায়ে মুহম্মদীয়া' আন্দোলন একটি জেহাদি আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং অত্যাচারী শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে আজাদির আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন সৈয়দ আহমেদ শহিদ ব্রেলভী এবং তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন শাহ সাহেবের ভাইপো শাহ ইসমাইল শহিদ ও জামাতা মওলানা আবদুল হাই। (বরেন্দ্র বরেণ্য অধ্যাপক এ কে এম ইয়াকুব আলি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৩।

২৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

২৪. রশীদ আল ফারুকী, *মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৮।

২৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

২৬. এ. এম. এম. আবদুল জলিল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ*, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৭।

২৭. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans,* The Comrate Publishers, Calcutta, 1945, p. 127.

২৮ সত্যেন সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১।

অপর প্রান্ত পর্যন্ত দাবানল ছড়িয়ে দেয় এবং ভারতের মুসলমানদের ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলে।[২৯] শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এবং শাহ আবদুল আজিজ (র.)-এর কর্মপদ্ধতি চয়নে পার্থক্য ছিল যে, ওয়ালিউল্লাহ বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং আবদুল আজিজ তা করেন সাধারণ জনসাধারণের মাধ্যমে।[৩০]

শাহ আবদুল আজিজের আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য একজন সাহসী সহযোগীর প্রয়োজন হয়েছিল। এ সময় সৈয়দ শাহ ইলমুল্লাহ বংশের যুবক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী[৩১] তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে আসন। শাহ আবদুল আজিজ নির্দ্বিধায় তাঁর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেন। সর্বপ্রথম শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র বড় ভাই আব্দুল্লাহর পৌত্র মৌলবি ইউসুফ পরবর্তীতে শাহ আবদুল আজিজের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল এবং জামাতা মওলানা আবদুল হাই তাঁর (আহমদ) কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩২] শাহ ইসমাইলের নিকট এক পত্রে জেহাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সৈয়দ আহমদ বলেন, "জেহাদের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন অথবা খ্যাতি অর্জন করা নয়। বিভিন্ন অংশ জয় করা বা স্বীয় স্বার্থ পরিতৃপ্ত করা অথবা নিজের জন্য একটা রাজ্য

---

২৯. এ. এম. এম. আবদুল জলিল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১।

৩০. মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক*, লাহোর, ১৯৫২, পৃ. ৭২।

৩১. সৈয়দ আহমদ রায় ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.) : ভারতবর্ষের এ মহান মনীষী ১২০৬ হিজরির মুহররম মাসে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায় বেরেলির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সৈয়দ মুহম্মদ ইরফান। দাদার নাম সৈয়দ ইলমুল্লাহ। তিনি ইমাম হাসানের বংশে অধস্তন ৩৪ তম পুরুষ। রায় বেরেলিতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি দিল্লিতে গমন করেন এবং শাহ আবদুল আজিজের তত্ত্বাবধানে সংস্কার আন্দোলনের উপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমত শাহ আবদুল আজিজের ভাই শাহ আবদুল কাদেরের নিকট তিনি দিল্লির আকবর আবাদি মসজিদে আরবি ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে, সশস্ত্রবাহিনীর প্রশিক্ষণের দরকার ছিল। এ তাগিদ থেকে তিনি একজন মুসলমান শাসক আমির খার পিঞ্জারির অধীনে অশ্বারোহী সিপাহি হিসেবে সংগ্রামীজীবন শুরু করেন। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাহ আবদুল আজিজ (র.) এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিন বৎসর অবস্থান করে নিজেকে ইসলাম ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লিতে ফিরে এসে সংসার পরিজন পরিত্যাগ করে 'তরিকায়ে মুহম্মদীয়া' নামে সংস্কার আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষ থেকে অনইসলামিক কার্যাবলি দূর কারার জন্য এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এই আন্দোলন ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। মুসলমানরা দলে দলে তাঁর অনুচরত্ব গ্রহণ করে। সৈয়দ আহমদ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ১৮১৬-১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করে বেড়ান। পাটনাতে অবস্থানকালে মুরিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়। কোলকাতায় আসলে জনসমাবেশ এত বৃদ্ধি পায় যে, তাদেরকে হাতে হাত রেখে মুরিদত্ব প্রদান করা সম্ভব হয় না। ফলে তিনি আটটি পাগড়ি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে হজ করার পথে সৈয়দ আহমদ কোলকাতায় আসেন। বেরেলি থেকে কোলকাতা পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানে তাঁর দর্শনপ্রার্থীরা বিপুল সমারোহ হতো। শিরক বিদ'আত হতে তওবা করে তারা মুমিনদের দলভুক্ত হত। অনেক বিধর্মীও তাঁর হাতে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। হায়দ্রাবাদের যুবরাজ টিপু সুলতানের পরিবারবর্গ তাঁর নিকট তওবা করেন। শিখ রাজা রনজিত সিংহের (১৭৮০-১৮৪০ খ্রি.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক পর্যায়ে তিনি তাঁর সামরিক কেন্দ্র বালাকোটে স্থানান্তর করেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা জেলার বালাকোটে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ৬ মে শুক্রবার দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাইলসহ অনেকে শহিদ হন। (এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৬; মোহাম্মদ মোদাব্বের, *ইতিহাস কথা কয়*, ঢাকা, মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ১১৭-১১৯; W. W. Hunter, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬-১১।

৩২. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

স্থাপন করাও জেহাদের উদ্দেশ্য নয়। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তাকে বিনষ্ট করা।"[৩৩] সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে W.W. Hunter বলেন,

> সৈয়দ আহমদ ধর্মীয় নেতা হিসেবে তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন দুটি মহান নীতির প্রবক্তা রূপে। নীতি দুটি হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব এবং মানুষের সাম্য। সত্যিকার ধর্ম প্রচার করা সকলেই এ দুটি নীতি অনুসরণ করে থাকেন। দেশবাসীর অন্তরে যে ধর্মভাব দীর্ঘকাল যাবত সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং শতাব্দীর দরুন সৃষ্ট কুসংস্কার অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের মনকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং ইসলাম ধর্মকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল, সৈয়দ আহমদ এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হতে নাড়া দিয়েছিলেন মুসলমানদের সে ধর্মনিষ্ঠ মনের দুয়ারে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, ধর্মবিশ্বাস প্রতিমা পূজার আনুষ্ঠানিকতায় সমাহিত হয়েছে। ... সৈয়দ আহমদের জীবন অন্তর্বর্তী এমন একটা সময় ছিল, যখন সর্বান্তঃকরণে বেদনাকুল হৃদয়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর মুক্তি কামনা করেছিলেন এবং তাঁর অন্তর নিবন্ধ হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর প্রতি।[৩৪]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদকে জেহাদ করতে হয়। রায় বেরেলি থেকে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যান এবং শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।[৩৫] ১৮২৬ সালে ২১ ডিসেম্বর তিনি নওশেরা কর্মকেন্দ্র থেকে শিখ রাজা রনজিত সিংহের কাছে ইসলামের রীতিনীতি অনুযায়ী শিখদের প্রকাশ্যে আহ্বান জানান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অথবা বশ্যতা স্বীকার করতে অথবা অস্ত্রের মোকাবেলা করতে। শেষ পর্যন্ত এক নৈশযুদ্ধে মাত্র ৯০০ মুজাহিদ বাহিনী ২০,০০০ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত শিখ বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৮২৭ সালে পেশোয়ারের মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়ে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। ১৮৩০ সালে তিনি শিখদের কাছে পরাজিত হয়েও শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার দখল করেন।[৩৬] তিনি সেখানে খোলাফায়ে রাশেদীন আদলে ইসলামের আমিরুল মুমিনীন নিযুক্ত হন। তাঁর নামে মুদ্রা তৈরি ও চালু করা হয়।[৩৭] সেখানে তিনি অনেক ইসলামী আইন-কানুন চালু করলে শিখরা তাদের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করে তাঁর কার্যকলাপের বিরোধিতা করে। এতে মুজাহিদ বাহিনী দুর্বল হয়ে পরলে তিনি তাঁর সামরিক কেন্দ্র হাজরা জেলার বালাকোটে স্থানান্তর করেন। ১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোটে বিশ্বাসঘাতক পায়েন্দা খান ও নজফ খানের সহায়তায় শিখ যুবরাজ শের সিংহের আক্রমণে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাইলসহ অনেকে শহিদ হন।[৩৮]

ওয়াহাবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ ও নিম্ন, ধনী-দরিদ্র মুসলমান এবং একে সংগঠন ও পরিচালনা করেছিল ধর্ম-শাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ। ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না

---

৩৩. আব্বাস আলি খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৯।

৩৪. W. W. Hunter, *op.cit.*, p. 36.

৩৫. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *পূর্বোক্ত*, ১৪।

৩৬. W. W. Hunter, *op.cit.*, p. 10.

৩৭. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬-১৭।

৩৮ তাদের মতে মুহম্মদের সময়ে যা ছিল না বা, যা করা হয়নি, তা সবই অনৈসলামিক। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮-১১৯।

করে ইসলামের সংস্কার করা যায় না এবং ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে বিধর্মী রাজশক্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন, এ চেতনা আসে ক্রমে ক্রমে এবং তাঁর সাথে আন্দোলনের স্বরূপও বদলাতে থাকে। ওয়াহাবী আন্দোলনই ভারতে জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন। নেহাৎ সুবিধার জন্য এ আন্দোলনকে 'ওয়াহাবী' আখ্যা দেয়া হয়েছে। ১৮৭০ সালে Hunter তাঁর *The Indian Musalmans* গ্রন্থে মুসলমানদের এ প্রতিরোধ ও সংস্কার আন্দোলনকে ওয়াহাবী নাম দেন। তবে ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনই ওয়াহাবী বলে পরিচয় দেননি। তাদের এ আন্দোলন ছিল তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলন। অবশ্য ইংরেজদের প্রচারণার ফলে আন্দোলনটি ওয়াহাবি আন্দোলন নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, আরবের আবদুল ওয়াহাবের পিউরিটর্নিক (Puritanic) আন্দোলনের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের এ আন্দোলনের অনেক পার্থক্য থাকলেও এক বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। মুসলিম সমাজের আচার ও বিশ্বাসের সংস্কার করে সব অনৈসলামিক প্রথার উচ্ছেদ করে আদিম সমাজ ও সরল মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এ Puritanic revivalism-এর জন্য ওয়াহাবীদের আপোষহীন, অবিরাম সংগ্রাম আরব ও ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।[৩৯]

উনিশ শতকে ভারতীয় তথা বাংলার মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে পথিকৃৎ ছিল ওয়াহাবী আন্দোলন। আলীগড়ে 'Mohamaddan Anglo Oriantal College' প্রতিষ্ঠার (১৮৭৬) পর থেকে এ সংস্কার আন্দোলনের উত্তেজনা কমতে থাকলেও ওয়াহাবীদের ধর্মীয় মনোভাব মুসলিম সমাজের নানা দিকে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে তা এখনও লক্ষণীয়। বিশেষত এখনও নানা রূপে ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। বাংলার কৃষক আন্দোলনের সূচনাও হয় ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তবে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বলেন, "বাঙলাদেশে এ (ওয়াহাবী) আন্দোলন যে-রূপ নিয়েছিল, তার সঙ্গে উত্তর ভারতে ওহাবী আন্দোলনের বিশেষ কোন সামঞ্জস্য ছিল না।"[৪০] তিনি আরও বলেন,

> ইজতেহাদ ও তক্লীদের প্রশ্নে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইবনে তাইমিয়ার সাথে একমত, কিন্তু ওয়াহাবীদের আতিশয্য এ সঙ্কীর্ণতা তিনি পরিহার করেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য। 'ধর্মের প্রশ্নে দু'টি কথা মনে রাখা উচিত; এক, ধর্মের নীতি ও আইন কখনই এত সঙ্কীর্ণ হতে পারে না যে, মত বা আচরণের ঈষৎ পার্থক্যে ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়; দুই, কোনও একটি মতকে ধ্রুব সত্য জেনে তা আঁকড়ে বসে থাকা এবং এর বিপরীত মতের অস্তিত্বই অস্বীকার করা কোন কাজের কথা নয়; কারণ ইজ্‌তেহাদের মূল নীতিই হলো সব মতামতের মধ্যে থেকে সত্য পথ বেছে নেওয়া ও সেই সঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করার প্রস্তুতি'। তক্লীদের প্রশ্নে ওয়ালিউল্লাহ্ চিন্তার স্বাধীনতার সাথে সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার সংহতি রক্ষার সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন।[৪১]

তাই আঠারো শতকের ভারতীয় মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ওয়ালিউল্লাহ্‌র চিন্তাধারার গুরুত্ব বোঝা যায়। এ জন্যই ওয়ালিউল্লাহ্‌কে নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতীয় ইসলামের মন্ত্রগুরু বলা হয়ে থাকে।

---

৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৯।

৪০. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮।

৪১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬।

১৮২৩ সালে শাহ আবদুল আজীজের মৃত্যুর পর সৈয়দ আহমদ তার সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। চিন্তারীতি ও ধর্মের আদর্শ ব্যতীত মুসলমান সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের কোথায় বিরূপ সংস্কার প্রয়োজন, তার একটা ব্যবহারিক কর্মসূচি নিয়েই উনিশ শতকের ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু হয়। আবদুল আজীজের মৃত্যুর পূর্বেই সৈয়দ আহমদ উত্তর ভারতের প্রধান ধর্মগুরু ও সুফী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৮১৬-১৭ সালে ইসমাইল ও আবদুল হাইসহ সৈয়দ আহমদ দিল্লিকে কেন্দ্র করে রামপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ-এর বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়ান ও শিষ্য সংগ্রহ করেন। এটাই ছিল ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ।[৪২]

শাস্ত্রীয় ও আধ্যাত্মিক সুফী ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য দূর করে ভারতীয় মুসলমানের মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান করার যে নীতি ওয়ালিউল্লাহ্ প্রচার করেছিলেন তার নাম 'মুহম্মদী তরীকা' অর্থাৎ মুহম্মদের পথ। সৈয়দ আহমদ প্রথমে তাঁর শিষ্যদের ভারতবর্ষে প্রচলিত ৪টি প্রধান সুফী পন্থাতে – চিশ্‌তিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া – প্রভৃতিতে দীক্ষা দিয়ে পরে মুহম্মদী তরীকাতে দীক্ষা দিতেন। তিনি ঈমানের দৃঢ়তা সাধন ও ধর্মাচরণের সংস্কারের উপর জোর দিয়েছিলেন। এ বিষয়গুলো হলো– ঈমানকে দুর্বল করে এমন সব অভ্যাস, যেমন- শরীয়তের আইন উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা, পৌত্তলিক ও নাস্তিকসুলভ কথাবার্তা বা আচরণের প্রশ্রয়, আল্লাহ ও নবি সম্বন্ধে অসম্মানজনক কথাবার্তা, কর্মফলের জন্য মানুষ ও স্রষ্টার দায়িত্ব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ, শিথিল বিশ্বাস সুফীদের প্রভাবে পীর পূজা, কবরপূজা, সিন্নি দেওয়া প্রভৃতি আচরণ, যা থেকে ঈমানের ক্ষতি ও অপব্যয় হয় প্রচুর। সামাজিক কুসংস্কারে যেমন- বিবাহ, শিশুর নামকরণ, সুন্নত পালন ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উৎসব আড়ম্বর না করা। মৃতের সৎকার উপলক্ষ্যে নানা রকম ব্যয়বহুল ও নিরর্থক অনুষ্ঠান। ইসলামী শাস্ত্রানুমোদিত বিধবা বিবাহের প্রসারে সমাজের আপত্তি ও বিরুদ্ধাচরণ। শেষোক্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য সৈয়দ আহমদ স্বয়ং বিধবা বিবাহ করেন। এ প্রসঙ্গে সালাহউদ্দীন আহমদ এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "সনাতনপন্থী ও পশ্চাদমুখী ধারার অনুসারীরা তৎকালীন গোটা মুসলমান সমাজকে হযরত মুহম্মদ ও খুলফা-ই-রাশেদীনের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতেন।"[৪৩] ঐসব প্রথা ও কুসংস্কার যে মুসলমান সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল তার কেন্দ্র ছিল দিল্লি। সৈয়দ আহমদের সমর্থকরা একদিকে ছিলেন জমিদার, নবাব, তালুকদার, বড় বড় ঠিকাদার, অপরদিকে ছিলেন জোলা, কসাই, কারিগর জাতীয় সাধারণ মুসলমান।[৪৪]

১৮২৯ সালে সৈয়দ আহমদের মত বিরোধী একজন তাঁকে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন সৈয়দ আহমদ তাঁর তরিকাকে 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া' বলে আখ্যায়িত করেন।[৪৫] তবে উক্ত

---

৪২. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩২।

৪৩. সলাহউদ্দীন আহমদ, 'উনিশ শতকের মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধরা', *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩৬৪।

৪৪. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে সৈয়দ বাহাদুর আলী (সম্পা), *জওয়াব-ই-ইসতিফতা*, মীর মোহাম্মদ আলী, *মতবা-ই আহম্মদী*, ১২৪৫ হি./ ১৮২৯ খ্রি., পৃ. ৯। উদ্ধৃত, মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দ আহমদের অনুসারী মওলানা ইরতিজা আলী বলেন, 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া' হলো একটি সাধারণ পরিচয় যার মধ্যে সুফিদের অন্যান্য তরীকাগুলোও রয়েছে।[৪৬] ১৮৩৭ সালে মওলানা কেরামত আলী সৈয়দ আহমদের কিছু অনুসারী সম্পর্কে বলেন যে, এরা কোরআন এবং সুন্নাহ পালনের ব্যাপারে ইজতিহাদ করে ব্যবহার করার জন্য প্রচার করে। এরা নিজেদেরকে মুহাম্মদী হিসাবে পরিচয় দিত। মুহাম্মদী হল 'তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া'র সংক্ষিপ্ত রূপ।[৪৭] পাটনার মওলানা বিলায়েত আলী সৈয়দ আহমদের অনুসারী হলেও তিনি স্বতন্ত্র দলের ব্যক্তি ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিলায়েত আলী নিজেকে মুহাম্মদী হিসেবে পরিচয় দিতেন। কেরামত আলী সুফি আদর্শে নিজেকে মুহাম্মদীয়া হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৮] মৌলবী ইনায়েত আলী ১৮৩১ সালের পর সৈয়দ আহমদের মতাদর্শ বাংলা অঞ্চলে প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলায়ও তাঁর (আহমদ) অনুসারীদেরকে মুহাম্মদী বলা হতো।[৪৯] এ আন্দোলনের একটি উত্তরাধিকারী আন্দোলন হিসেবে 'আহলে হাদিস' বর্তমানে বাংলাদেশেও টিকে আছে। এ মতের অনুসারীরা নিজেদের মুহাম্মদী হিসেবে পরিচয় দেন। এরা নবিজির পথের অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করেন।[৫০] ১৮৭০ সালে ওয়াহাবী মামলায় সৈয়দ আহমদের অনুসারীদের 'ওয়াহাবী' হিসেবে আখ্যায়িত করলে তারা এর প্রতিবাদ করে নিজেদেরকে নবিজির সুন্নাহর অনুসারী বলে দাবি করেন।[৫১]

সৈয়দ আহমদের শীষ্য মওলানা ইনায়েত আলী ১৮৩১ বা ১৮৩২ সালে বাংলায় আসেন এবং সৈয়দ আহমদ শহীদের বাঙালি অনুসারীদের নিয়ে তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, শহরের মুসলিম সমাজের তুলনায় গ্রামীণ মুসলমানরা কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় ডুবে আছে বেশি। তাই তিনি বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সফর করে মুসলমানদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী মতাদর্শ প্রচার করেন।[৫২] ১৮৪০ সালে তিনি যশোর জেলার হাকিমপুরে সদর দফতর স্থাপন করেন। এখানে তিনি তিন-চার বছর পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। মৌলবি ইনায়েত আলীর সৈয়দ আহমদের মতাদর্শ প্রচার কার্যের প্রমাণ নিম্নের রাষ্ট্রীয় মামলা থেকে নিশ্চিত করা যায়। এগুলো হলো–

১. ১৮৬৪ সালের আম্বালা মামলা।

২. ১৮৬৫ সালের পাটনা মামলা।

৩. ১৮৭০ সালের রাজমহল মামলা।

---

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

৪৭. মওলানা কেরামত আলী, *কুওয়াত আল ঈমান*, কলিকাতা, ১২৫৩ হিজরি./ ১৮৩৭ খ্রি., পৃ. ১৩৫।

৪৮. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪-১৫।

৪৯. আবদুল রহিম, *আল দুরার আল মনসুর ফি তারাজিম ঈ আহল ই সাদিকপুর*, ইলাহাবাদ, ১৩৪৫ হিজরি./ ১৮৪৫ খ্রি., পৃ. ১৩৩।

৫০. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।

৫১. *Pumplet on India*, The great Wahhabi case being a full Report of the Procudings in the maltees of Ameer Khan and Hashmadad Khan, Calcutta, 1870, p. 1.

৫২. আবদুল রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩।

৪. বিখ্যাত ওয়াহাবী মামলাসমূহ ১৮৭০-১৮৭১।

উক্ত মামলাগুলো পরিচালনার সময় একটি সত্য বেরিয়ে আসে যে, মৌলবি ইনায়েত আলী ও তাঁর অনুসারীদের প্রচারণায় বাংলার মুসলিম সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে।[৫৩] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং মুসলিম সাধারণের নিকট ধৈর্যের সাথে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেছেন। এর সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এভাবেই উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম সমাজে ধর্মীয় রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। বাংলা অঞ্চলে মৌলবি ইনায়েত আলী একইভাবে উক্ত মতাদর্শ প্রচার করেছেন। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনের মাধ্যমে জেহাদে অংশ নিয়ে ক্ষমতা জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ গ্রাম বাংলায় মুসলিম সমাজে একটি ধর্মীয় বিপ্লব সাধনে সফল হয়েছিলেন। অতএব মৌলবি ইনায়েত আলী বাংলায় আগমনের পর 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[৫৪]

মৌলবি ইনায়েত আলীর সদর দপ্তর যশোর জেলার সীমান্তে ছিল হাজি শরিয়াতুল্লাহ'র[৫৫] 'ফরায়েজী' প্রভাবিত জেলা ফরিদপুর। ফলে পাটনা স্কুলের[৫৬] অনুসারীদের সাথে ফরায়েজীদের সংযোগ ঘটে। এ প্রসঙ্গে W. W. Hunter বলেছেন যে, পাটনা স্কুলের বিখ্যাত নেতা মৌলবি ইয়াহিয়া আলী ১৮৪৩ সালে ফরায়েজীদের সাথে উত্তর ভারতের ওয়াহাবীদের যোগাযোগ করান। এছাড়াও ফরায়েজী ও পাটনা স্কুলের অনুসারীরা (তথাকথিত

---

৫৩. W. W. Hunter, *op.cit.*, p. 84.

৫৪. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।

৫৫. হাজী শরীয়াতুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.): ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিংহপুরুষ বলে পরিচিত হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শ্যামায়েল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ বছর বয়সে তার পিতা আবদুল জলিল তালুকদার মারা যান। পিতার মৃত্যুতে তাঁর চাচা মুহম্মদ আজিম তাঁর লেখাপড়াসহ সার্বিক দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে কোলকাতায় পাঠান মওলানা বরাশত আলির কাছে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গায় এক নৌকা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তিনি তাঁর ছোটোচাচা মুফতি মুহম্মদ আশিক ও চাচিকে হারিয়ে দুঃখ বেদনা মনে তাঁর প্রিয় শিক্ষক মওলানা বরাশত আলির সাথে মক্কার পথে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি সুদীর্ঘ ২০ বছর ধর্মীয় শিক্ষালাভের পর হজ্জ পালন শেষে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। আপন গ্রামের মানুষকে সত্যের পথে ডেকে তিনি কোনো সাড়া না পেয়ে পুনরায় মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন পদব্রজে। জেমস ওয়াইজের মতে, তিনি ছিলেন মাঝারি উচ্চতা, গৌরবর্ণ লেম্ব বিস্তৃত শ্মশ্রু। তাঁর ছিল শক্তিশালী ও ঋজু দেহ। তাছাড়া তিনি তাঁর মাতায় প্রকাণ্ড একটি পাগড়ি ব্যবহার করতেন। তিনি আরও মনে করেন যে, তিনি ছিলেন একজন সহানুভূতিশীল এবং নিষ্ঠাবান প্রচারক। তিনি ব্রিটিশ রাজ, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও অমিতাচারী সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে একতাবদ্ধ করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তিনি নিজ গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে তাঁর বাসস্থানের পেছনে প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। যা তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর আড়িয়াল খাঁ নদীর প্রবাহে ভেসে যায়। (মোশারফ হোসেন খান, *হাজী শরীয়তুল্লাহ*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, আগস্ট,২০১০, পৃ. ৯-২২; মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০-৮৫; অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৪; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৪০; আল্লামা গোলাম আহমদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৭০; ফাহমিদ-উর-রহমান (সম্পা.), ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি, বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০১১, পৃ. ৯-২২; Farhat Tabassum, 'Deoband Ulema's Movement for the Freedom of India', *Jamiat Ulama-i-Hind*, Manak Publication, New Delhi, 2006, pp. 12-14.

৫৬. পাটনা স্কুল ছিল তরীকা ই মুহাম্মদীয়ার উত্তরসূরি।

ওয়াহাবী) যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে এবং ১৮৫৮-১৮৭১ সালে আদালতে কাঠগড়ায় একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে।[৫৭] তবে ফরায়েজী মতাদর্শের পার্থক্য রয়েছে; যা পরবর্তীতে বর্ণিত হবে। ফরায়েজীদের সঙ্গে পাটনা স্কুলের অনুসারীদের সংযোগ হওয়ার কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি না থাকলেও দু'টি আন্দোলনকারীদের চোখে ব্রিটিশ শক্তি ছিল ক্ষমতা জবরদখলকারী। তাই তাদের উৎখাত প্রশ্নে দুটি আন্দোলনের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যেমন-

১. ফরায়েজীদের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, দুদু মিয়া 'জেহাদ' ফান্ডে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শিবিরগুলোতে পাটনা স্কুলের অনুসারীদের জন্য দুদু মিয়া উক্ত ফান্ড চালু করেছিল।
২. মালদহ শহরে পাটনা স্কুলের অনুসারীদের বসতি ছিল। দুই জন ফরায়েজী নেতা এ শহরে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং বাধা ছাড়াই অনেক লোকের সমাবেশে তাদের মতাদর্শ প্রচার করেন। এ তথ্য ১৮৭০ সালে মালদহ মামলার দলিল থেকে জানা যায়।[৫৮]
৩. যশোর জেলার পূর্বাংশে ফরায়েজীদের এবং পশ্চিমাংশে পাটনা স্কুলের অনুসারীদের প্রভাব ছিল, তা সত্ত্বেও এ দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বা বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৫৯]

সরকারি নথি অনুযায়ী পাটনা স্কুলের মতাদর্শ বাংলার পশ্চিম ও উত্তর দিকের দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, যশোর, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা জেলাগুলোতে প্রসার লাভ করে। গঙ্গা নদী ও ভাগিরথী নদী বিধৌত অঞ্চলে পাটনা স্কুলের মতাদর্শ বা তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া মতাদর্শ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।[৬০] এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইলের কর্মজীবন ও চরিত্রকে উপজীব্য করে বাংলা ও উর্দু ভাষায় নিম্নের তিনটি গ্রন্থ ১৮৬৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। যথা– (১) *তাসির মেরাদিয়া* (সম্ভবত *তফসির আল মোরাদিয়া*)। এটি উর্দু ভাষায় লিখিত। (২) ফাতোয়া এবং জেহাদ সম্পর্কিত বাংলা গ্রন্থ; এর সংকলক ও প্রকাশক ছিলেন হাজী বদর উদ্দীন এবং (৩) হাজী জান রহমান এবং হাজী বদর উদ্দীন যৌথভাবে বাংলা ভাষায় লিখেন তত্ত্ব।[৬১] এ গ্রন্থগুলোই প্রমাণ করে যে, তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া মতাদর্শ পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই আন্দোলনের প্রভাবে বাংলায় মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী জেহাদি মনোভাব তীব্র হয়। গ্রন্থত্রয়ের সারাংশ পর্যবেক্ষণ (সরকারি নথিসমূহে বিদ্যমান) করলে

৫৭. W. W. Hunter, *op.cit.*, p. 100.
৫৮. Muinuddin Ahmad Khan, *Selections From Bengal Government Records on Wahhabi Trials (1863-1870)*, Dacca, 1961, p. 300-301.
৫৯. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮।
৬০. Muinuddin Ahmad Khan, *op.cit.*, p. 8.
৬১. *Ibid*, pp. 278, 301.

প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে অভিজাত মুসলমানদের সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বকে ঘিরে বিরোধ ছিল। সৈয়দ আহমদ অলৌকিকতার প্রতি আগ্রহশীল সাধারণ মুসলমানদের নিকট ছিলেন ইমাম মেহেদীর মত।[৬২] এমনকি তাদের ধারণা ছিল সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮৩১ সালে বালাকোটে মৃত্যুবরণ করেনি। তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন মাত্র। সময়ের প্রয়োজনে তিনি ফিরে আসবেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে জয়ী হয়ে মুসলমানদের রক্ষা করবেন। অন্যদিকে, এ ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গ্রন্থগুলোতে বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিরোধিতা করা হয়েছে। লেখকগণ মনে করেন, আল্লাহর রহমতে মুসলমানদের দুরাবস্থার উন্নতি হবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জেহাদ ও প্রয়োজনে হিজরত ফরজ। কেউ যদি উক্ত বিষয় দুটি প্রত্যাখান করে, তাহলে সে আল্লাহর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

সৈয়দ আহমদ শহীদের মৃত্যু সম্পর্কে বাংলার অভিজাত শ্রেণির দৃঢ়তা সম্ভবত তাঁর এক বাঙালি শিষ্যের তদন্তের ফলেই গৃহীত হয়েছিল। W. W. Hunter বলেন যে, সৈয়দ আহমদের একজন বাঙালি শিষ্য তদন্তের জন্য এক হাজার সহকারী নিয়ে বাংলা থেকে ১৮০০ মাইল দূরবর্তী বালাকোটে যান। সেখানে ঐ দলটি ঘাস ভর্তি তিনটি ছাগচর্ম দেখতে পান। সেগুলোকে চুল ও কিছু কাঠের টুকরা দিয়ে মানবাকৃতির মতো করা হয়েছিল। এ আকৃতিগুলোকে সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর অনুসারীরূপে সংরক্ষণ করা হয়। মোল্লা কাদির পাহাড়ি গুহায় সংরক্ষণের কাজটি করেন। এ ঘটনা বালাকোট বিপর্যয় সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দেয়; যা 'পাটনা স্কুলের' অনুসারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।[৬৩]

সৈয়দ আহমদের মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী পূর্ব বাংলার অভিজাত শ্রেণির মুসলমানরা তেমন গ্রহণ করেনি। তাই পাটনা স্কুলের প্রভাব এ অঞ্চলে ছিল খুব সীমিত। মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীর ভূমিকাও পূর্ববাংলায় পাটনা স্কুলের মতাদর্শ প্রসারে বাঁধন সৃষ্টি করে। মওলানা কেরামত আলী পূর্ববাংলাকে তাঁর সংস্কারের মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে পাটনা স্কুলের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। কারণ ওয়াহাবীরা ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে এখানে জুমার নামাজ নাজায়েয (অসিদ্ধ) বলে ফাতোয়া প্রদান করেছিলেন। শুধু তাই নয় এই শত্রু রাষ্ট্রকে অমুসলিম শাসক গোষ্ঠীর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক কর্তব্য বলেও তারা প্রচার করেন। ওয়াহাবী বা তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের অনুসারীদের এরূপ ধর্মীয় উগ্রপন্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একদল মুসলিম ধর্মবেত্তা এবং সমাজ সংস্কারক।[৬৪] এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)। তিনি ১৮৭০ সালের ৩০ নভেম্বর 'কলকাতা মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র উদ্যোগে বিতর্ক

---

৬২. বিশেষ করে শিয়াদের কাছে অতিপ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রদর্শক যিনি পুনরায় ফিরে আসবেন।

৬৩. W. W. Hunter, *op.cit.*, p. 48-49.

৬৪. রশীদ আল ফারুকী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-১৯।

সভার আয়োজন করেন। এ সভায় মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তিনি তথ্য ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানরা নির্বিঘ্নে ধর্ম-কর্ম করতে পারে এবং মুসলিম শাস্ত্রবিদ ও আইনজ্ঞদের রায় অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারত মুসলমানদের জন্য দার-উল-হরব নয় বরং দার-উল-ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। সমিতির সভাপতি কাজী আবদুল বারী এবং আরও কয়েকজন বক্তা মওলানা কেরামত আলীর মতামত সমর্থন করেন। এ সময় কাজী আবদুল বারী মক্কার কয়েকজন আলেমের ফতোয়ার উল্লেখ করেন। যে দেশে মুসলমানরা সঠিকভাবে ধর্ম-কর্ম করতে পারে সে দেশকে দার-উল-ইসলাম গণ্য করা যায় বলে তাঁরা ফাতোয়া দিয়েছিলেন।[৬৫]

প্রসঙ্গত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর বঙ্গীয় খলিফা।[৬৬] কেরামত আলী ১৮৩৫ সালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৭৩) অধিকাংশ সময় বাংলায় অবস্থান করেন।[৬৭] বাংলায় ইসলাম প্রচারের শুরুতে তিনি ঘোরতর ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবু জাফর শামসুদ্দীন বলেন, "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সময় সম্ভবত তিনি (কেরামত আলী) ঘোরতর ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন।"[৬৮] G. N. Dodd-এর বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে। তাঁর ভাষায়, "A mischeivous sect of Muhammadans under one Keramat Ali, was detected in the endeavour to sow the seed of disaffection."[৬৯] মওলানা কেরামত আলী তাঁর পীর সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট জেহাদে শরিক হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ তাঁকে জেহাদে যোগদান না করে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের আদেশ দেন।[৭০] সৈয়দ আহমদের আদেশে তিনি ধর্ম প্রচারে লিপ্ত থাকলেও তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রকট ছিল। কেরামত আলী কর্মজীবনের গোড়ার দিকে ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া মতবাদ প্রচার করছিলেন বলে মনে হয়। পরবর্তী সময় তিনি ভাবলেন, সরকার পক্ষ অনুকূলে না থাকলে তাঁর পক্ষে ধর্ম প্রচার করা হবে কষ্টদায়ক ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ধর্ম প্রচারের অন্তরায় এবং মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।[৭১] এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ শহীদের পথ ও মত থেকে সরে

---

৬৫. Nawab Abdul Latif, 'Proceedings of Mohammadan Literary Society', *A Munit on Hugly Madrasha*; এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২৩।

৬৬. অন্য একজন কেরামত আলী ছিলেন সৈয়দ আমির আলীর শিক্ষক এবং *'মাখাযুন উলুম'* গ্রন্থ প্রণেতা।

৬৭. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

৬৮. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি (১)*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৭।

৬৯. G. N. Dodd, *The Histeory of the Indian Revolt*, Muslims of British India, Cambridge, 1972, p. 148.

৭০. ইছমত আলী (অনূদিত), *মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী*, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৩৬-৩৭।

৭১. Maulana Abdul Hai, *Nuzhatul Khawater*, vol. VII, Hydrabad, 1947, pp. 394-396.

যান।[৭২] ১৮৫৭ সালের পর কেরামত আলী ব্রিটিশ আনুগত্যের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়েন। ১৮৬০ সালে তিনি *নাসীমুল হারামাইন* নামক একখানা আরবি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ঐ বছরই জৌনপুরের আহমদী প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে কেরামত আলী ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৭৩] সে মতের ভাবার্থ হলো : ইমাম আবু হানিফার মতে তিনটি শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়। শর্তগুলো হলো– (১) প্রকাশ্যে কাফিরদের আইন-কানুন প্রবর্তিত হওয়া এবং তথায় ইসলামী আইন-কানুন বলবৎ না থাকা, (২) সে দেশটির অন্য দারুল হরবের সীমা রেখার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া এবং দুই দেশের মাঝখানে অন্য কোনো মুসলিম দেশ না থাকা এবং (৩) সে দেশে কোনো মুমনি বা জিম্মির পক্ষে তার পূর্বেকার সেই নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করতে না পারা, যা কাফিরদের আধিপত্য লাভের পূর্বকাল পর্যন্ত মুসলিম দেশের মুসলমানরা ইসলামের আইনানুসারে এবং জিম্মিরা মুসলমানদের অনুগত হওয়ার বদৌলতে ভোগ করে আসছিল।[৭৪] উক্ত ফাতোয়ার ভাষা আরবি হওয়ায় তা ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয়নি। কারণ তখন আরবি ভাষা খুব কম লোকই জানতেন।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, যাঁরা এদেশকে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া দিয়ে জুমা ও ঈদের নামায পড়া থেকে সাধারণ মুসলমানদের বারণ করেন, কেরামত আলী জৌনপুরী তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন ও তাঁদের সাথে বাহাস করেন।[৭৫] এভাবে ওয়াহাবিদের উগ্রপন্থা বা জেহাদী মনোভাবের বিপরীতে মুসলমানদের মধ্যে একটি সহনশীল ধর্মীয় পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেন মওলানা কেরামত আলী। বস্তুত সরকারের সাথে মুসলিম সমাজের দূরত্ব অবসান এবং এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা শেষোক্ত মতাবলম্বীদের মনোজগতকে আলোড়িত করেছিল বলে মনে হয়। তাঁরা মনে করতেন জেহাদি তৎপরতার মাধ্যমে বঙ্গ-ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সক্ষমতা মুসলিম সমাজের নেই। ফলে এই পন্থা পরিহার করে তাদের সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা দরকার এবং এটিই তাদের স্বার্থানুকূল হবে। মওলানা কেরামত আলী ও তাঁর অনুসারীদের এই চিন্তনধারা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম মননকে প্রভাবিত করেছিল।

তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের উপজাত ছিল 'তাইউনী আন্দোলন'। মওলানা কেরামত আলী ছিলেন এ আন্দোলনের নেতা। 'তাইউনী আরবি শব্দ, যার অর্থ কোনো কিছু চিহ্নিত করা। তাই একজন ব্যক্তি উক্ত মতাদর্শের অনুসারী হলে তাকে 'তাইউন' বলা হয়। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের

---

৭২. Mohiuddin Ahmad, *Saiyid Ahmad: His life and Mission*, Academy of Islamic Research and Publications, Lucknow, 1965, p. 128.

৭৩. মুহা. আবদুল বাকী, *মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর রাজনৈতিক মানস ও চিন্তার বিবর্তন*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা, ৩৫ বর্ষ : ১-৩ সংখ্যা, ২০০১-২০০২, পৃ. ৭০।

৭৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২৫৮।

৭৫. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩২১।

সঙ্গে মওলানা কেরামত আলীর মতবিরোধ ঘটে। 'তকলিদ' বা মাযহাব অনুসরণ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। মওলানা কেরামত আলী 'তকলিদ' অনুসরণের পক্ষে ছিলেন। একজন ব্যক্তি সুনির্দিষ্টভাবে একটি মাযহাবের অনুসারী হলে তাকে 'তাইউনী' বলা হয়। ফলশ্রুতিতে মওলানা কেরামত আলী আহল-ই-হাদিস এর অনুসরারীদেরকে 'লা মাযহাবী' আখ্যা দেন।[৭৬] তবে জেমস ওয়াইজ 'তাইউনী' বলতে প্রতিষ্ঠিত বুঝিয়েছেন।[৭৭] এ দু'টি পথ হল রাহ-নবুয়ত এবং রাহ-ই বিলায়েত; যা সৈয়দ আহমদ উল্লেখ করেছিলেন।

তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার অনুসারীদের ন্যায় মওলানা কেরামত আলীও মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং অনৈসলামিক আচারসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব ভারতের মুসলিম সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, অনাচার এবং উৎসবাদিতে এমনভাবে নিমজ্জিত ছিল যে, এ সমাজে বিশুদ্ধ ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচার করার এটি ছিল অন্যতম কারণ। কেরামত আলী মহররম উপলক্ষে নাচ-গান, তাজিয়া, ওরশ পালন, মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফাতিহা অনুষ্ঠান ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করেন। তবে ফাতিহা পালনে অনাড়ম্বরতা থাকে বলে তিনি তা অনুমোদন করেন।[৭৮] জুমা ও ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ফরায়েজীদের মতাদর্শ এবং কোনো সুন্নি মাযহাবের অনুসারী না হওয়ার কারণে পাটনা স্কুলকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পাটনা স্কুলকে তিনি 'লা মাযহাবী' এবং ফরায়েজীদেরকে বাংলার 'খারেজি' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৭৯] ধর্মীয় ক্ষেত্রে কেরামত আলী বাংলা অঞ্চলে বিতর্কের এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেন। তাঁর এ প্রচারাভিযান এবং বিতর্ক যা বাহাস অনুষ্ঠানের ফলে ধর্মীয় মতাদর্শগত পার্থক্য আরও বেশি স্পষ্ট হয়। পাটনা স্কুল 'তকলিদ' প্রত্যাখ্যান করে 'ইজতিহাদ' ও নবিজির 'সুন্নত' অনুসরণের মতাদর্শ প্রচার করে। উপরন্তু, পাটনা স্কুল জুমা ও ঈদের নামাজ সম্পর্কিত ফরায়েজীদের মতাদর্শ অনুমোদন করে না। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ফরায়েজীগণ বাংলায় উক্ত নামাজ অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে। কেরামত আলী ঈদ ও জুমার নামাজ অনুষ্ঠান না করায় ফরায়েজী মতাদর্শকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেন। এ ক্ষেত্রে পাটনা স্কুল তাঁকে সমর্থন করে। অতএব আমরা দেখতে পাই যে, উনিশ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত বাংলায় ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে ত্রিমুখী রূপ নেয়। এ ধরনের সংঘাত সংস্কারের চেয়ে সময়ের অপচয়কে নিশ্চিত করেছিল। উক্ত দলগুলোর অনমনীয় মনোভাবের কারণে তাদের মধ্যে তিক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আহল-ই-হাদিস আন্দোলন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাটনা স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা অঞ্চলে তাদের প্রচার প্রসারিত করে। ফলে এরাও অবশিষ্ট দলগুলোর বিরোধী দল হিসেবে পরিচিত হয়। সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ফলে ধর্মীয় বিতর্ক

৭৬. মৌলবি কেরামত আলী, *কুওআত আল ঈমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭।

৭৭. মাওলানা কেরামত আলী, *কুওআত আল ঈমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭।

৭৮. মাওলানা কেরামত আলী, *মাকাশিফাত ই রাহমাত*, কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরি, পৃ. ১২।

৭৯. মৌলবি কেরামত আলী, *হুজ্জাত ই ক্বাতি*, পৃ. ৯৪-৯৭; উদ্ধৃত, মঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১।

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে সংঘাতের সৃষ্টি করে।[৮০] ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার ধর্মীয় জীবনে 'বাহাস' প্রাধান্য লাভ করে। তাইউনী এবং ফরায়েজীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাহাস অনুষ্ঠিত হয়; যা সাধারণ মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

স্মর্তব্য যে, সৈয়দ আহমদ হজ্জ করতে মক্কায় যাবার পথে কলকাতায় আসেন এবং বহু মুসলমানকে তাঁর মতাদর্শে দীক্ষা দেন। দীক্ষা প্রার্থীদের সংখ্যা এত বেশি হয় যে, হাতে হাত রেখে দীক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তখন সৈয়দ আহমদ সাত আটটি পাগড়ি প্রসারিত করে তা উপস্থিত মুসলমানদের ধরতে বলেন। এভাবেই বহু মুসলমানকে তিনি তাঁহার শিষ্যভুক্ত করেন।[৮১] তাঁর জিহাদ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশেও বিভিন্ন জেলায় জিহাদের বাণী প্রচারিত হয়। বাংলা থেকে মুজাহিদ ও অর্থ সংগ্রহ করে পাটনা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মৌলবী বেলায়েত আলীর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি মুজাহিদ ও অর্থ তাঁর ভ্রাতা ও সীমান্তের সেনাধ্যক্ষ ইনায়েত আলীর নিকট পৌঁছে দেন।[৮২] ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকার আশঙ্কা করে মুজাহিদরা বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করতে পারে। তাই পাটনা কেন্দ্রের নেতাদের গ্রেফতার করে। এসময় সীমান্তের জেহাদীরা বাংলা-বিহারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেনি। একপর্যায়ে ইনায়েত আলী মুজাহিদ ও অর্থের অভাবে জেহাদ বন্ধ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি সিত্তানা হতে সোয়াত যাত্রা পথে মৃত্যুবরণ করেন (১৮৫৭)।[৮৩] ১৮৫৮ সালে জেহাদ অভিযান পুনরায় আরম্ভ হয়। মুজাহিদগণ মূলকায় নতুন সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। মৌলবী বেলায়েত আলীর পুত্র মৌলবী আবদুল্লাহ তাদের নেতা নির্বাচিত হন। আবদুল্লাহর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী কয়েকটি সফল অভিযান করে। ১৮৬৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর ব্রিটিশ বাহিনী মুজাহিদদের পরাজিত করে এবং তাদের মূলকেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়। এর পরও মুজাহিদরা ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিভিন্নভাবে ব্যতিব্যস্ত করে।[৮৪]

পাটনা, মালদহ ও রাজমহলের রাজদ্রোহ মামলাগুলো হতে বাংলাদেশের জেলাগুলোতে জেহাদ আন্দোলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলাম প্রচার এবং স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল। মালদহের ইসলামপুরের মৌলবী ইব্রাহিম মন্ডল একটি অঞ্চলের নেতা ছিলেন। স্থানীয় নেতা-কর্মীরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন।[৮৫] কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি মহল হত এবং মহলে একজন কর আদায়কারী ও প্রচারক নিযুক্ত হত। বড় গ্রামগুলোতে কয়েকজন সর্দার নিযুক্ত হতেন। (১) দ্বিন-কি-সর্দার ইমামতি ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করতেন; (২) দুনিয়া-কি-সর্দার মুজাহিদ সংগ্রহ করতেন এবং লোকের বৈষয়িক

৮০. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১।
৮১. A. R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*, Dacca, 1961, pp. 99-101.
৮২. *Ibid*, p. 127.
৮৩. *Ibid*, p. 136.
৮৪. R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. I, part-2, Calcutta, 1971, pp. 161-67.
৮৫. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪।

অবস্থা তদারক করতেন; (৩) ডাক-কি-সর্দার চিঠি পত্র ও দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা করতেন।[৮৬] মুসলমানদের নিকট হতে যাকাত, ফিতরাহ ও ইলাহী নামক খয়রাত সংগ্রহ করা হত। মুষ্টি প্রথায় প্রত্যেক মুসলমান পরিবার হতে চাল সংগ্রহ করা হত এবং ইহার অর্থ জিহাদের জন্য দেয়া হত। বগুড়ার মুসলমানরা একবার ৩,০০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন।[৮৭]

১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদের মৃত্যুর পর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মাঝে নানা মতভেদ লক্ষ করা যায়। ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে সৈয়দ আহমদের অনুসারীরা তিনটি মতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথমটি নিয়ে কাজ করেন সৈয়দ আহমদের উত্তরাধিকারী মওলানা বিলায়েত আলী (১৭৯০-১৮৫২)। তিনি তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার পুনর্ব্যক্ত অর্থাৎ নবিজির সুন্নত পালনে অগ্রাধিকার দেন। দ্বিতীয় মত ব্যক্ত করেন মওলানা কেরামত আলী যিনি এক সময় সৈয়দ আহমদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুসারী ছিলেন।[৮৮] তিনি মাযহাবসমূহকে চূড়ান্ত বলে দাবি করেন। তিনি মাযহাব অনুমোদিত সকল বিষয় মুসলমানদের পালন করা কর্তব্য বলেও মনে করতেন। সৈয়দ আহমদের আর একজন অন্যতম অনুসারী মোহাম্মদ আশরাফের পুত্র জামাল উল্লাহর সন্তান মৌলবি আবদুল জব্বার তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া থেকে তৃতীয় মত প্রকাশ করেন। তিনি নিজেকে 'হানাফী' মাযহাবের অনুসারী হিসেবে দাবি করেন। তা সত্ত্বেও তিনি মহানবির সুন্নত পালনকে অগ্রাধিকার দেন। তবে কেরামত আলী মতে, জব্বার নয়া মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৮৯]

উক্ত মতগুলোকে তিনজন ব্যক্তি তিনটি গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। মৌলবি বিলায়েত আলী তাঁর 'আমল বিল হাদিস' অর্থাৎ নবিজির সুন্নাত পালন নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ফারসি ভাষায় লিখিত ছোট আকারের পুস্তিকাটি ১৮৩৭ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রথমাংশে লেখক বলেন যে, 'ইত্তিবা ই আহাদিছ' এবং 'ইত্তবা ই ফিকাহ' অর্থাৎ অনেক প্রশ্ন থাকার কারণে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে সাধারণ তথ্যাদি পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। মওলানা কেরামত আলীর মতে, ইসলামের প্রধান লক্ষ্য কোরআন এবং নবিজির সুন্নাহ্ নির্দেশিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা। অতএব মাযহাব বর্ণিত কোন বিষয় কোরআন অথবা সুন্নাহ'র সাথে বিরোধ সৃষ্টি করলে মাযহাব বর্ণিত বিষয়টি ত্যাগ করে কোরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে 'তকলিদ' বা মাযহাবকে অনুসরণের সুযোগ নেই। বিলায়েত আলীর মতে, কোনো 'হানাফী' মাযহাবের ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে 'মাযহাব'কে অতিক্রম করে নবিজির সুন্নাহ করলে সে একজন উত্তম হানাফী। কারণ মাযহাবগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোরআনকে অনুসরণ করা। যে কোনো বিষয়ে ব্যক্তির মতামতের চেয়ে শাস্ত্রকে অনুসরণ করাই উত্তম। তাঁর মতে, তকলিদ অনুসরণ করা সেই ব্যক্তিরই প্রয়োজন যিনি তাঁর নিজস্ব জ্ঞান

৮৬. W. W. Hunter, *op.cit.*, p- 73.

৮৭. Muinud-Din-Ahmad Khan, *A History of the Faraidi Movement in Bengal (1881-1909)*, Karachi, 1965, p. 11.

৮৮. W. W. Hunter, *op.cit.*, pp. 97-98.

৮৯. মওলানা কেরামত আলী, *কুওতআত আল ঈমান*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৩।

দ্বারা প্রকৃত পথ বেছে নিতে পারেন না। তবে যিনি কোরআন এবং সুন্নাহ্ সম্পর্কে পারদর্শী তাঁর জন্য তকলিদ অনুসরণ করা অনুমোদনযোগ্য নয়।[৯০]

মওলানা কেরামত আলী উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁর 'কুত্তআত আল ঈমান' গ্রন্থে মাযহাবগুলোকে চূড়ান্ত বলে প্রতিপন্ন করেন। এ গ্রন্থটি মৌলবি বিলায়েত আলীর 'আমল বিল হাদিস' গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করে। কেরামত আলী জৈনপুরী মনে করেন, মুসলিম বিশ্বের প্রধান দুটি সম্প্রদ্রায়ের মধ্যে শিয়ারা বিপথগামী হলেও সুন্নি সম্প্রদায় সঠিক পথে চলিত হয়েছে। সুন্নিরা মাত্র চারটি মাযহাবের (হানাফী, শাফী, মালেকী ও হাম্বলী) সমন্বয়ে গঠিত। মুসলিম সমাজের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ চারটি মাযহাবকে চূড়ান্ত পথ হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। তাই প্রতিটি মুসলমানের যে কোনো একটি মাযহাব অনুসরণ করা প্রয়োজন।[৯১] কেরামত আলীর মতে 'ইজতিহাদ' করা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্ভব।[৯২] তবে চারটি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই। পঞ্চম মাযহাবেরও প্রয়োজন নেই। যদি কোনো ইসলামী আইন পঞ্চম মতাদর্শ খুঁজে পান তাহলে সেটি উক্ত চার মাযহাবের যে কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবে।[৯৩] কারণ তাঁদের অনুমোদিত পথ নবিজির মাতবাদের পথ। বস্তুত মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেরা কিছু প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং কোরআন ও সুন্নাহ্কে ব্যাখ্যা করেছেন[৯৪] এমনকি মাযহাব অনুমোদিত কোনো বিষয় যদি সুন্নাহর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলেও তা গ্রহণ করতে হবে। কারণ ইজমার মাধ্যমেই ইমামদের অনুসরণ করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং কেউ ইমামদের তকলিদ অনুসরণ না করলে সে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্যুত হবে।[৯৫] কেরামত আলী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি তাঁর পুরনো মাযহাবের বা হানাফী মাযহাবের প্রতি অনুগত্য। তিনি বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং তকলিদ অনুসরণ করি। যদিও মূর্খ ব্যক্তিরা এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে।"[৯৬]

মৌলবি আবদুল জব্বার-এর 'তাকবিয়াত আলী মুসলিমিন ফি ইত্তিবা ই সুন্নাত ই সৈয়দ আল মুরসালিন' অর্থাৎ সুন্নাত পালনে মুসলিম সমাজকে সুসংহত করা। এটি ১২৫৬ হিজরি মোতাবেক ১৮৪৬ সালে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। মওলানা কেরামত আলীর 'কুত্তআত আল ঈমান' গ্রন্থটিকে প্রত্যাখান করে মৌলবি জব্বার এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থের শিরোনাম থেকে বোঝা যায় যে, এটি নবিজির সুন্নাত পালনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ গ্রন্থটি রচনার পূর্বে মৌলবি জব্বার 'জওয়াব ই কুত্ত আত আল ঈমান' অর্থাৎ কুত্তআত আল ঈমানের উত্তর নামক আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং কেরামত আলীর প্রতিটি যুক্তি একের পর এক খণ্ডন

৯০. মুইন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫-২৬।
৯১. মৌলবি কেরামত আলী, *কুত্তআত আল ঈমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।
৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।
৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।
৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।
৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪ ও ১৬৬।
৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২।

করেন। মৌলবি বিলায়েত আলীর 'আমন বিল হাদিসে'র সাথে 'তাকবিয়াত আল মুসলিমিন' গ্রন্থের বিষয়বস্তু সঙ্গতিপূর্ণ। মৌলবি বিলায়েত আলী তাঁর গ্রন্থে 'তরীকা ই মুহাম্মদীয়া' আন্দোলনের নিয়মনীতি ও প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ সমুন্নত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। মৌলবি আবদুল জব্বারের গ্রন্থে উক্ত নীতির যথার্থতা সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আজীজ যে নীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা থেকে বর্তমান নীতি আলাদা কিছু নয়। অতএব মৌলবি আবদুল জব্বারের গ্রন্থটি ছিল মৌলবি বিলায়েত আলী 'আমল বিল হাদিস'-এর পরিপূরক।[৯৭] আবদুল জব্বার মত প্রকাশ করেন, কোরআনের আলোকে আমরা জানি আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করছে নবিজির সুন্নত পূর্ণভাবে অনুসরণের মধ্যে। এ অনুসরণ সমাজের প্রচলিত নিয়ম বা আচার বিরোধী হলেও সুন্নত অনুসরণ করতে হবে। তাই একজন মুসলিম নবিজির সুন্নত পালন করতে গিয়ে মাযহাব প্রদর্শিত পথ বিচ্যুত হলেও সে নবিজির এবং ইমামের আশীর্বাদ লাভ করবে। কারণ ইমামগণও মত প্রকাশ করেছেন যে, তাদের কোনো মত নবিজির সুন্নতের সাথে বিরোধ সৃষ্টি কারলে তাহলে সুন্নতকেই অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় হবে।[৯৮] অজ্ঞদের জন্য তকলিদ অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় হতে পারে। তবে তকলিদ বা মাযহাবকে অনুসরণ করা সাধারণ কোনো আইন হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, শাহ আবদুল আজীজ এবং ইসমাইল শহীদ তকলিদ অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং এটা পৌত্তলিকতার নামান্তর বলে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, মাযহাব অনুমোদিত বিষয়সমূহ কোরআন ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে কি না।[৯৯] পূর্বে বর্ণিত হয়েছে মৌলবি আবদুল জব্বার নিজেকে হানাফী দাবি করেছেন। তবে সত্য কোনো মাযহাবের একচেটিয়া বিষয় নয়। কিন্তু মাযহাবসমূহের মুস্তাহিদগণের মাধ্যমে সত্য ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং সকল দর্মীয় নেতৃবৃন্দকে তিনি নিজের নেতা মনে করেন। এভাবে মৌলবি আবদুল জব্বার নিজেকে মতামত দেয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দাবি করেছেন।[১০০] তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা সত্ত্বেও আবদুল জব্বার নিজেকে একজন সঠিক হানাফী মনে করেন।

১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ মৃত্যুর পরও তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার নেতা মৌলবি বিলায়েত আলী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নবিজির সুন্নত পালনের নীতি অব্যাহত রাখেন। উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিলায়েত আলী নবিজির আদর্শের প্রতি অধিক আগ্রহ-প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে মওলানা কেরামত আলী মাযহাবের পথ অনুসরণ করার কথা বলেন। এক্ষেত্রে বিলায়েত আলী ইজতিহাদের পক্ষে মতামত দেন। কিন্তু কেরামত আলী তকলিদ অনুসরণের জন্য বলেন। ১৮৩৮ সালে 'আমল বিল হাদিস' এবং 'কুওআত আল ঈমান' প্রকাশিত হওয়ার পর দুই বিপরীত চিন্তারধারা স্পষ্ট হয়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে সৈয়দ আহমদ শহীদের দুই প্রধান সহকারীর মধ্যে বিভেদ চূড়ান্তরূপ লাভ

৯৭. মৌলবি আবদুল আল জব্বার, *তাকবিয়াত আর মুসলিমিন ফি ইত্তিবা ঈ সুন্নত ই সৈয়দ আল মুরসালিন*, কলিকাতা, ১২৫৬ হিজরি/ ১৮৪৬ খ্রি., পৃ. ২৬।

৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

১০০. মৌলবি আবদুল জব্বার, *জওয়াব ই কুওআত আল ঈমান*, কলিকাতা, ১৮৩৭, পৃ. ২।

করে। এরপর কেরামত আলী নিজেকে প্রথমে হানাফী বলে দাবি করলেও পরবর্তীতে তাইউনী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন বলেও মনে হয়। কারণ তাঁর নেতৃত্ব পূর্ববঙ্গে যে সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয় তা তাইউনী আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১০১] ১৮৫২ সালে মৌলবি বিলায়েত আলী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখেন। তবে এরপর তাঁর অনুসারীদেরকে ওয়াহাবী অথবা ভারতীয় ওয়াহাবী বলা হয়েছে। বিশেষ করে ১৮৬৩-১৮৭০ সালে মামলাগুলোকে ওয়াহাবী মামলা এবং অভিযুক্তদের ওয়াহাবী বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু অভিযুক্তরা নিজেদেরকে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া হিসেবে পরিচয় দেন।[১০২]

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে মৌলবি বিলায়েত আলীর 'আমল বিল হাদিস' এবং মৌলবি আবদুল জব্বারের 'তাকবিয়াত আলী মুসলিমীন' গ্রন্থদ্বয়ে মতাদর্শগত পার্থক্য পর্যায়ক্রমে সুস্পষ্ট হচ্ছিল। একজন মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত এবং অন্যজন কোনো মাযহাবে অনুরক্ত হতে চাননি। তবে বিলায়েত আলী মাযহাবে অনুরক্ত না হলেও মাযহাবগুলোর বৈধতার স্বীকৃতি দেন। আবদুল জব্বার সুন্নত পালনে মনোযোগী ছিলেন এবং নিজেকে 'হানাফী' হিসেবেই প্রকাশ করেছেন। বিলায়েত আলীর মৃত্যুর (১৮৫২) পূর্ব পর্যন্ত দু'জনের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গির কোনো বিরোধিতার জন্ম দেয়নি। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে একটি দল সুন্নতকে প্রাধান্য দেয় এবং অপরটি 'তাকলিদ' অনুসরণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়। এভাবে দুটি দল বিচ্ছিন্নতার দিকে ধাবিত হয়। ১৮৬৪ খ্রি. (১২৮১ হিজরি)-তে 'ছবুত ই হাক্ক আলী হাকিম' অর্থাৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হলে দু'পক্ষের বিছিন্নভাবে পূর্ণতা দান করে। গ্রন্থের প্রণেতা সৈয়দ নযীর হোসাইন মাযহাবসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেন।[১০৩] এ নতুন মতাদর্শ সম্বলিত দলটি 'পাটনা স্কুল' থেকে এসে 'মুহাম্মদী' বা 'আহল-ই-হাদিস' অর্থাৎ (নবিজির হাদিসের অনুসারীগণ) নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে এ দলটি 'আহল-ই-হাদিস' এবং 'রাফি ইয়াদাইন'[১০৪] নাম গ্রহণ করে। তাদের বিরুদ্ধকারীরা তাদেরকে 'লা মাযহাবী' অর্থাৎ যাঁরা কোনো মাযহাব ভুক্ত নয় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে আমি আহল-ই-হাদিস হিসেবে ব্যবহার করেছি। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাকেরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলায় আহল-ই-হাদিসের অনুসারীদের কর্মকাণ্ড সক্রিয় ছিল। তবে আহল-ই-হাদিসে বুদ্ধিজীবী মতাদর্শের কারণে গ্রাম বাংলায় এ আন্দোলন জনপ্রিয়তা পায়নি বলে মনে হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর ভারতবর্ষের মুসলিম নেতৃবৃন্দ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি দেওবন্দপন্থী (Deoband School of Thought), অপরটি আলিগড়পন্থী (Aligarh Schoool of Thought)। এ দু'দলই মূলত মওলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির অনুসারী। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এঁদের ভেতর প্রকাশ্য মতভেদের সূচনা হয়। মওলানা মোহাম্মদ কাসেমের নেতৃত্বে এঁদের সংগ্রামী অংশটি

---

১০১. James Wise, *op.cit.*, pp. 6-7.

১০২. W. W. Hunter, *op.cit.*, p. 84; And M. A. Khan, Selections, *op.cit.*, p. 1.

১০৩. Muhammad Esahak, *Indias Contribution to the stady of Hadith Literature*, Dacca University, Dhaka University Press, 1955, pp. 184-185.

১০৪. যাঁরা নামাজের সময় বার বার হাত উঠিয়ে থাকে।

১৮৬৫ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং ইংরেজ বিরোধিতাকে তাঁদের সংগ্রামের একটা অংশে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে এখান থেকেই সর্বভারতীয় পর্যায়ে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দে'র জন্ম হয়েছে এবং মওলানা মাহমুদ হাসান, মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মওলানা হোসেন আহমদ মাদানী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামে বাংলাদেশেও তাঁদের একটা শাখা গড়ে ওঠেছিলো।[১০৫] ১৯০২ সালে মৌলবি ইনায়েত আলীর পুত্র আবদুল্লার মৃত্যু পর্যন্ত এ আন্দোলন চলতে থাকে।[১০৬] তবে আহলে-ই-হাদিসের কর্মকাণ্ড বর্তমানেও বাংলাদেশে লক্ষ করা যায়।

সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলবীর শিক্ষা ও আদর্শ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুসারীর জন্ম দেয়। তাঁর মৃত্যুর পরও অকুতোভয়ে তাঁর আদর্শ, শিল্প ও জিহাদ অনুসারীরা প্রচার ও পরিচালনা করেন তাঁর আদর্শ প্রচার করতে তাঁরা মৃত্যুকেও তুচ্ছ মনে করেছেন। এমনই এক অকুতোভয় অগ্নিপুরুষ ছিলেন চব্বিশ পরগণার বারাসাত জিলার মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।[১০৭] কোরআনে হাফেজ তিতুমীর বাল্যকালে গ্রামের এক মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। খ্যাতি লাভ করেন কুস্তিগীর হিসেবে। তিনি মায়মুনা খাতুন সিদ্দিকাকে বিবাহ করেন পরিণত বয়সে। মায়মুনা ছিলেন চব্বিশ পরগণার খালপুর গ্রামের বিখ্যাত দরবেশ শাহ সুফী মহমম্দ আসমতউল্লাহ সিদ্দিকীর মেয়ে। তিতুমীর চাকরি নিলেন দিল্লির এক অভিজাত পরিবারে। এ পরিবারের কর্তা তিতুমীরকে স্নেহ করতেন। ১৮২২ সালে এ পরিবারের কর্তা তাঁকে মক্কায় হজ্জ করতে নিয়ে যান। মক্কায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সৈয়দ আহমদ শহীদের। তিতুমীর আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হন সৈয়দ আহমদের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে আসেন তিতুমীর। সৈয়দ আহমদ তখন শিখদের সাথে সীমান্ত প্রদেশে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন।[১০৮] তখনই

---

১০৫. রশীদ আল ফারুকী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯।

১০৬. Mahamud Hussain, *The Success of Sayyid Ahmed Shahid: History of The Freedom Muvement*, vol. II, part I, Karachi, 1960, p. 169.

১০৭. সৈয়দ নিসার আলী (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.): সৈয়দ নিসার আলি ওরফে তিতুমির ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মির হাসান আলি ও মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। মির নিসার আলি কোরানে হাফেজ ছিলেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তিনি একজন সংগঠক, কুস্তিগীর ও সাহসী বীর হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হজ্জ আদায় করেন। সেখানে সৈয়দ আহমদ শহিদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁর মতবাদ ও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। স্বদেশে ফিরে তিতুমীর অত্যাচারী জমিদার, অত্যাচারী নীল কুঠিওয়ালা ও ব্রিটিশ দালালদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালান। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের ময়েজউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়িতে তাঁদের সদর দপ্তর স্থাপন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ১৫ নভেম্বর বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার ১২৫ জনের এক পুলিশবাহিনী তাদের আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণে তাঁরা কোনোমতে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসলেও ১০ জন সিপাহি ও ৩ জন বরকন্দাজ নিহত হন। এরপর নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২৫০ জন পুলিশ ও অন্যান্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে আক্রমণ করলে সেবারও তারা নাস্তনাবুদ হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ১১টি রেজিমেন্ট, কামানসহ যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৪-১৯ নভেম্বর নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করলে বাঁশের কেল্লা কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয় এবং যুদ্ধে তিতুমীরসহ ৩০ জন নিহত হন ও ৩৫০ জন বন্দি হন। হিংস্র ও উন্মত্ত ইংরেজবাহিনী শহিদদের লাশ তৎক্ষণাৎ জ্বালিয়ে দেয়। (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩-৩৪; আল্লামা গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৭; পৃ. ২৬৪-২৭০)।

১০৮. মুনতাসীর মামুন, *শরীয়তউল্লাহ*, *তিতুমীর ও দুদুমিয়ার লড়াই*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৪-৪৫।

তিতুমীর কাজ শুরু করেন বাংলায়। তিনি ইসলাম ধর্মকে ভালোবাসতেন; চিন্তা করতেন হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও। তবে ইংরেজদের ও ইংরেজ অনুগতদের ধ্বংস কামনা করতেন। এ প্রসঙ্গে বিহারীলাল সরকারের একটি উদ্ধৃতির একাংশ তুলে ধরা হলো–

> নিসার (তিতুমীর) আপন ধর্মমত প্রচার করতে ছিলেন। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিল না। লোকে তাঁহার বাসবিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাঁহাকে পবিত্রতা মনে করিয়া, তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। নিসার প্রথমে শোণিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধি করতে চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেবের জরিমানার ব্যবস্থা তাঁহার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করে।[১০৯]

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে মক্কা থেকে দেশে ফিরে তিতুমীর কলকাতাসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত নারিকেলবাড়িয়ার হায়দারপুরে বসতি স্থাপন করে তিনি একজন ধর্মীয় নেতা ও সংস্কারক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন।[১১০] এ প্রক্রিয়ায় তিনি বিশাল জনসংখ্যার নেতা হন; যার অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান কৃষক ও তাঁতী। ক্রমশঃ তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেন এবং নিজেকে ধর্ম সংস্কারে নিয়োগ করেন। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন মিশকিন শাহ নামক জনৈক ফকির।[১১১]

হায়দারপুরে তিতুমীর শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন। ইসলাম ধর্মে যেসব অনাচার প্রবেশ করেছিল তা তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। যারা তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন তাদেরকে তিনি দাড়ি রাখতে এবং লুঙ্গির মত করে ধুতি পরতে বলেছিলেন। তিনি তাদের একমাত্র আল্লাহর কাছেই মাথানত করতে বলেছিলেন; 'শিরক' না করতেও বলেছিলেন। পীর ফকির, মাজার প্রভৃতির প্রতি বেশি ভক্তি প্রদর্শনকেই বলা হত 'শিরক'। তাই তিতুমীর পীর মানা, মাজার তৈরি করা, মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা এবং মহররম উৎসবে যোগ দান করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ফাতিহা এবং মিলাদ পড়তেও তিনি নিষেধ করেন।[১১২] এভাবে তিনি চেয়েছিলেন ইসলাম ধর্মকে বিশুদ্ধ করতে। বারাসাতের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট কলভিলের মতানুসারে,"এসব লোকের শিক্ষাদীক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক সমগ্র ভারতে প্রচারকৃত আদর্শের অনুরূপ ... তাদের বিশেষত্ব অতি নিষ্ঠার সাথে পালন করা এবং হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে যেসব কুসংস্কার প্রবেশ করেছে তা পরিহার করা।"[১১৩] মুসলিম সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণির জনগণ হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান এমনভাবে পালন করত যে, তাদের শুধু আচার-অনুষ্ঠানে নয় বরং নামেও পৃথক করা প্রায় অসম্ভব ছিল। গোপাল, নেপাল, গোবর্ধন প্রভৃতি নামও মুসলমানদের মধ্যে ছিল। কারণ এদেশের মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল নিম্ন শ্রেণির হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও হিন্দুর রীতি নীতি সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেনি।

---

১০৯. বিহারীলাল সরকার, *তিতুমীর*, কলিকাতা, ১৩০৪, পৃ. ৪৭।

১১০. Narahari Kaviraj, *Wahabi and Farazi Rebels of Bengal*, New Delhi, 1982, p. 31.

১১১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৪৩।

১১২. মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১।

১১৩. Narahari Kaviraj, *op.cit.*, p. 31.

সংস্কারের পরও বহু বিধর্মীয় রীতিনীতি বংশপরম্পরায় বিদ্যমান ছিল। আরও কিছু কারণে হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক ঘনিষ্ঠতা ও সান্নিধ্যে ইসলাম ধর্মে নানা পাপাচার প্রবেশ করে। এ সকল কুসংস্কার দূর করার ব্রত নিয়েই তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ যা পূর্বেই বর্ণিত।[১১৪] তাই জোলা, নাকারি, পটুয়া ও বাদ্যকর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মুসলমানরা ওয়াহাবী তথা তিতুমীরের আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রচারণায় অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের পার্থক্য বোধগম্য হয়। মুসলমানরা তাদের পূর্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এভাবে ধর্মকে ভিত্তি করেই তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন শুরু হয়।[১১৫]

তিতুমীরের জীবনী লেখক বিহারীলাল সরকার লিখেছেন যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ মৌলবী মোহাম্মদ হোসেনকে পাবনা জেলায় 'খলিফা' নিযুক্ত করেছিলেন। মৌলবী হোসেনকে দেয়া খিলাফতের সনদ থেকে বিহারী লাল মর্মার্থ উদ্ধার করেন। এ সনদে সৈয়দ আহমদ নিম্নের দুটি মৌলিক বিষয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য মৌলবী হোসেনকে আদেশ করেন। (১) আল্লাহর গুণাবলি মানুষের গুণাবলির সঙ্গে তুলনা না করা (২) কুরআন এবং সুন্নাত অনুমোদন করে না এমন ধরনের কোনো উৎসব না করা। তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গে উক্ত সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[১১৬] প্রথম কয়েক বছর তিতুমীরের প্রচার নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে দাড়ি রাখতে বলেন এবং ধুতি দুই পায়ের মাঝে দিয়ে টেনে পরতে (কাছা খোলা) নিষেধ করেন। এর ফলে তাঁর অনুসারীদের স্পষ্টভাবে চেনা যেত। মুঈনউদ্দীন আহমদ খান তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া থেকে নেয়া তিতুমীরের বিশুদ্ধবাদী মতবাদগুলো নিম্নরূপ চিহ্নিত করেন। ক) সমস্ত এবাদত ও শ্রদ্ধা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে (খ) যেকোনো ধরনের শিরক (ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মহাপাপ) থেকে বিরত থাকা (গ) ফাতেহা, ওরস, মহররম, মিলাদে কেয়াম করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।[১১৭] এর ফলে রক্ষণশীল মুসলিমদের একটি অংশের সাথে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়।

বিহারীলাল সরকার আরও উল্লেখ করেছেন উক্ত সনদে উক্ত নীতিমালার বিশদ বিবরণ রয়েছে। প্রথমত, ফেরেশতা, দৈবশক্তি, জিন, পীর, শিক্ষক, দরবেশ অথবা পয়গম্বরের এমন কোনো শক্তি নেই যাঁর দ্বারা কোনো মানুষ উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত বিয়ে বা মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোনো অনৈসলামিক আচার বা উৎসব পালিত হতে পারে না। সুতরাং সমাধির উপর সাজসজ্জা, সমাধিসৌধ নির্মাণ, মহররম উপলক্ষ্যে তাজিয়া বের করা এবং নানা ধরনের ফাতিহার ব্যবস্থা ত্যাগ করতে হবে।[১১৮]

---

১১৪. বিহারী লাল সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২; আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪৩।

১১৫. আবদুল বাছির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

১১৬. বিহারী লাল সরকার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১; মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

১১৭. মুঈনউদ্দীন আহমদ খান (অনুবাদ : গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া), *ব্রিটিশ ভারতীয় নথিতে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮।

১১৮. বিহারী লাল সরকার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১।

তিতুমীরের মতাদর্শ সকল শ্রেণির মুসলমান গ্রহণ করেননি। অনেক সুন্নি মুসলমান হানাফী মতের অনুসারী ছিলেন। আবার অনেকে ছিলেন পীর-পয়গম্বরের ভক্ত। পূর্বেই বর্ণিত যে, তাঁরা তিতুমীরের ওয়াহাবী ও মৌলবি মতের বিরোধিতা করেন। বহু মুসলিম মোল্লা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁর ওয়াহাবী আদর্শে ভীত হয়। এতে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থ-সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে তারা তিতুমীরের বিপক্ষে অবস্থান করে।[১১৯] স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম জমিদাররাও তিতুমীরের এ শক্তিকে ও নির্ভীক আচরণে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাদের আশঙ্কা যে, তিতুমীরের কর্মকাণ্ডের ফলে গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যাবে এবং জমিদারতন্ত্র ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কোনো কোনো লেখক মনে করেন যে, "ওয়াহাবিদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি জমিদার শ্রেণির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।"[১২০] তৎকালীন সরকারি নথিতেও ওয়াহাবিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সংখ্যায় ৮০,০০০, তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, সকলেই নিম্নশ্রেণির মানুষ। তাদের ভয়ে কোনো দেশের ভূ-স্বামী গোষ্ঠীই শঙ্কিত না হয়ে পারে না।[১২১]

তিতুমীরের প্রচারে শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে বেশি উদ্বিগ্ন হলে চটলো জমিদাররা। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এ বিষয়ে হিন্দু জমিদারদের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি তিতুমীরের অনুসারীদের বিশেষ ধরনের দাড়ি প্রতি ২.৫০ টাকা কর ধার্য করেন। ফলে তিতুমীর ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। তিনি ধর্মে কারো হস্তক্ষেপ অন্যায় রায় দেন এবং উক্ত কর দিতে নিষেধ করেন। এ দাড়ির জরিমানা থেকে সংঘর্ষ ক্রমে অনিবার্য হয়ে পরে। তিতুমীরের সহযোদ্ধা সাজন গাজী সংকলিত তিতুমীরের গান নামক পুঁথি থেকে গিরীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন–

"নামাজ পড়ে দিবারাতি
কি তোমার করিল খেতি
কেন কল্লে দাড়ির জরিপানা"[১২২]

কৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন তিতুমীরের অনুসারী প্রজাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করলেন আশপাশের জমিদার– তারাগোনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ নাগ, এগরপুরের যোগী প্রসদ চৌধুরী, সরফরাজপুরের কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়, গোরগাছির জমিদারণী এবং কলকাতার বিখ্যাত ধনী ও জমিদার লাটুবাবুর গোমস্তা।[১২৩]

কৃষ্ণদেব এছাড়াও নতুন পাকা বাড়িতে ওয়াহাবী মসজিদ স্থাপনের উপর এক হাজার এবং কাঁচা বাড়িতে পাঁচশত টাকা কর নির্ধারণ করেন। সেই সাথে ওয়াহাবিদের আরবি নামকরণের ফি বাবদ পঞ্চাশ টাকা নির্ধারণ করেন

---

১১৯. আবদুল বাছির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

১২০. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩০৩।

১২১. M. A. Khan, *Wahhabi Trials, Selections from Bengal Government Records on Wahhabi Trails* (1836-1870), Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1961, p. 51.

১২২. বিহারী লাল সরকার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

১২৩. মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫।

এবং কোনো হিন্দু কোনো ওয়াহাবিকে আশ্রয় দিলে তার জমি বাজেয়াপ্তের ঘোষণা দেয়। কৃষ্ণদেব রায়ের সাথে যোগ দিয়ে উল্লিখিত জমিদাররাও দাড়ির উপর কর ধার্য করেন। কোলভিন রিপোর্টে স্বীকার করেছেন যে, কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক ধার্যকৃত দাড়ি কর ছিল গোলযোগ সৃষ্টির তাৎক্ষণিক কারণ।[১২৪]

পুঁরাতে দাড়ি কর বাস্তবে আদায় করা হয়। কিন্তু সফদরপুরে জমিদারের এজেন্ট কোশান সিং দাড়ি কর আদায় করতে গেলে তরিকায়ে মুহাম্মাদী অনুসারীরা তাকে অপদস্ত করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষ্ণদেব রায় ১৮৩০ সালে বিপুল সংখ্যক লাঠিয়াল নিয়ে মুসলিম বসতিপূর্ণ গ্রাম সফদরপুর আক্রমণ করে ব্যাপক লুটপাট করে; বহু বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। এছাড়াও একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। নামাজরত অবস্থায় দুইজন মৃত্যুবরণ করে এবং আহত হয় কয়েকজন। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারী কৃষকরা পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে এর সুবিচার পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কারণ তদন্তকারী পুলিশ রামরাম ঘুষ খেয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষ অবলম্বন করে এবং রির্পোট দেয় যে, জমিদারকে বিপদে ফেলার জন্য ওয়াহাবিরাই মসজিদ পুড়িয়েছে।[১২৫] অবশেষে ১৮৩১ সালে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাজারে সমবেত হয় এবং একটি গরু জবাই করে এর রক্ত ও বিভিন্ন অংশ মন্দিরের গায়ে ছিটিয়ে ও ঝুলিয়ে দেয়। এ অবস্থায় তিতুমীরের আন্দোলন আর্থ-সামাজিক রূপ নেয়। এর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় নীলকর, সহজাত মিত্র হিসেবে হিন্দু জমিদারদের সাথে অবস্থান নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ জোটের বিরুদ্ধে তিতুমীর বিজয়ও অর্জন করেন। এরপর প্রশাসন দুটি পুলিশি অভিযান প্রেরণ করলে তিতুমীর এদেরকে সফলভাবে প্রতিরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর একটি সামরিক অভিযানে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিরোধ গুড়িয়ে দেয়।[১২৬] এ অভিযানে তিতুমীরসহ অনেক অনুসারী শাহাদাত বরণ করেন।

এ পর্যায়ে বাংলায় পরিচালিত অন্যতম প্রধান সংস্কার আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮১৮ সালে এই ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর পরিচালিত এই আন্দোলনটি 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে খ্যাত। ফরায়েজীগণ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। এ আন্দোলন নিচুস্তরের মুসলিমদের মধ্যে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। কারণ বাংলায় বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই আন্দোলনটি পূর্ববঙ্গ ও আসামের গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। ফরায়েজী শব্দটি আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকে এসেছে। তবে ফরসি ভাষার অনুকরণে বাংলায় এর উচ্চারণ হয় ফরায়েজ এবং তা থেকে 'ফরায়েজী'। এর দ্বারা ধর্মের অবশ্য পালনীয় কার্যসমূহকে বুঝায়। অতএব এ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সর্ম্পকে যাঁরা আন্দোলন করেছে তাদেরকে ফরায়েজী বলা হয়। তারা সৃষ্টিকর্তা ও নবির নির্দেশিত সকল ধর্মীয় কর্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। বিশেষ করে ইসলামের পাঁচটি মৌলিক

১২৪. Colvin Report 3rd April 1832. Quoted by M.A. Khan, *Titumir and his followers in British Indian Records (1831-33)*, Islamic Foundation, Dhaka, 1940, p. 133.

১২৫. বিহারী লাল সরকার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭; মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত*, ৪৫-৪৯; আবদুল বাছির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬।

১২৬. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

বিষয়– কালিমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জ এর উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে অধিক। ইসলামের এ পাঁচটি প্রধান বিষয় পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করাই ছিল ফরায়েজীদের লক্ষ্য।[১২৭]

ইতিহাসের দৃষ্টিতে ফরায়েজী আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজকে শুদ্ধি করার লক্ষ্যেই সূচিত হয়েছিল। বাংলার মুসলিম সাধারণ সমাজ, ইসলামে মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে উদাসীন থেকে, নানা ধরনের উৎসব স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত থাকার কারণেই ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা হয়। বাংলার অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ছিল ফরায়েজী আন্দোলন। হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলিম সমাজে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন। তিনি বাংলার জনগণের ধর্মীয় আদর্শ 'হানাফী' মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১২৮]

ফরায়েজীগণ তাওহীদ বা একত্ববাদী আদর্শে বিশেষ মনোযোগ নির্দিষ্ট করেন। তারা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসে সন্তুষ্ট না থেকে বরং তা বাস্তবে পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা মুসলিম সমাজকে পৌত্তলিক সমাজের সাথে সামান্য যোগসূত্র আছে এমন সকল বিশ্বাসকে পরিহার করার আহ্বান জানান। এভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ সমাজে প্রচলিত সকল স্থানীয় আচার-আচরণ ও উৎসবকে অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করেন। তিনি এসকল আচার ও সামাজিক রীতি কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে না, বরং এগুলো শিরক ও বেদাত বলে ঘোষণা করেন। এভাবে শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজী মতাদর্শের সমাজ থেকে অনৈসলামিক সকল আচার-আচরণ বিলুপ্ত করেন। তাই ফরায়েজী আন্দোলনকে শুদ্ধিবাদী পুনঃজাগরণ আন্দোলন হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল একদিকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে যাওয়া এবং অন্যদিকে মুসলিম সমাজকে পরিশুদ্ধ করা।[১২৯] এরকম একই আদর্শ নিয়ে এসময় আরবে ওয়াহাবী আন্দোলন এবং ভারতে তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনও চলেছিল।

ফরায়েজী আন্দোলনের চরিত্র প্রায় সর্বাংশ ছিল ধর্মীয়। ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তুল্লাহর অনুসারী মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়া এ আন্দোলনে আর্থ-সামাজিক এবং কিয়ৎ পরিমাণে রাজনৈতিক রূপ দিলেও এর ধর্মীয় চরিত্র ফরায়েজী অনুসারীগণ কখনই উপেক্ষা করেনি। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নিজেদেরকে হানাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাদের ও আলাদা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ইতিহাসানুরাগীদের আকৃষ্ট করে। কারণ তাদের মতাদর্শ মূল্যায়নে বাংলার মুসলিম শক্তি পরাজিত হওয়ায় এখানকার সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করে। ফরায়েজীরা পাঁচটি ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের বা নীতির উপর ভিত্তি করে এ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন; যা নিম্নে বর্ণিত হলো :

---

১২৭. Muinud-Din-Ahmad Khan, *A History of the Faraidi Movement in Bengal (1818-1909)*, Karachi, 1965, p. XXXII.

১২৮. M. A. Khan, *Tomb Inscription of Haji Shariatullah*, JASP, vol. III, 1958, p. 195.

১২৯. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১-১২।

১. হাজী শরীয়তুল্লাহর মতে, তওবা হলো জীবনের বিগত পাপসমূহের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে পাপাচার করবে না এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করা।[১৩০] তওবা করার নিয়ম হলো– উস্তাদ শাগরেদকে বা শিষ্যকে মুখোমুখি বসিয়ে নিম্নোক্ত শপথ করাবেন। 'আমি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে সমস্ত শেরেক, বেদাত, নাফারমানি, অন্যায়, অত্যাচার, করেছি সমস্ত হতে তওবা করলাম এবং ওয়াদা করতেছি যে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করব এবং হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত তরিকা মোতাবেক চলব।'[১৩১] উল্লেখ্য যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীরা বাংলা ভাষায় তওবা পরিচালনা করতেন। উদ্দেশ্য ছিল তওবাকে সহজবোধ্য করা এবং অশিক্ষিত মুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করা। সাধারণ মুসলমানরা আরবি, ফারসি, উর্দু জানত না। W. W. Hunter বলেন, "প্রতি দশজনের একজন মাত্র ইসলামের সাধারণ বিষয় 'কলিমা' পুনর্ব্যক্ত করতে পারত।"[১৩২]

ফরায়েজী মতাদর্শে অর্ন্তভুক্ত একজন নতুন মুসলমানকে ফরায়েজীগণ 'তওবার মুসলিম' বা মুমিন বলত। সে-ও অন্যান্য ফরায়েজীদের মতোই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তওবা ফরায়েজী সংস্কারের প্রধান ফটক বলা যায়। তওবা করার পদ্ধতিকে ফরায়েজীরা 'ইস্তিগফার' বা সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা বলে। এটাকে 'ইকরারী বাইয়াতও' বলা হয়। যাঁর অর্থ উস্তাদ এবং সাগরেদ পরস্পরকে স্পর্শ না করে শপথ নেয়া। ঐতিহ্য অনুযায়ী পীরদের শপথের চেয়ে ফরায়েজীদের শপথ এক্ষেত্রে পৃথক। পীরগণ সাধারণত সাগরেদের হাতে নিজের হাত রেখে বাইয়াত পরিচালনা করে থাকেন। এ ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে পীরের আশীর্বাদ মুরিদের কাছে পৌঁছানো হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত। ফরায়েজীরা এ ধরনের বাইয়াত প্রক্রিয়াকে বেদাত বলে পরিত্যাগ করে এবং একে পাপ হিসেবে বিবেচনা করে। কুরআন ও সুন্নাহ-তে এ ধরনের কোনো রীতি বা আচার নেই বলে ফরায়েজীগণ বাইয়াতের এ প্রক্রিয়াকে পাপাচার বলে মনে করে। তবে ফরায়েজীরা 'ইকরারি বাইয়াত' নবিজির কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে, নবিজি হাতে হাত রেখেই বাইয়াত করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, রাসূলের হাতের উপর আল্লাহর হাত বিদ্যমান।[১৩৩] (এই রেফারেন্সটি কুরআনের সূরা ও আয়াত উল্লেখ করে হওয়া উচিত ছিল। আমার জানামতে এমন কোন আয়াত নেই)

২. হাজী শরীয়তুল্লাহর মতে, 'তওবা' পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই 'ফরজ' মতবাদের প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট হয়। ইসলামের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহকে পালন করা ফরায়েজী সংস্কারসমূহের কেন্দ্রীয়

---

১৩০. James Wise, *op.cit.*, p. 22.

১৩১. মুঈন উদ-দীন আহমদ খানের কাছে তৎকালীন ফরায়েজী নেতা বাদশাহ মিয়া প্রদত্ত বক্তব্য।

১৩২. W. W. Huter, *Englands Work in India*, Madraj, 1888, p. 47.

১৩৩. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩।

বৈশিষ্ট্য; যা এ আন্দোলনের নামকরণে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'ফরায়েজী' শব্দটি দিয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ আল্লাহ এবং নবিজির নির্দেশিত কর্তব্যসমূহকে বুঝাতে চেয়েছেন; যা তওবার মধ্যে নিহিত আছে। তিনি ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ– কালিমা, নামাজ (দিনে পাঁচ ওয়াক্ত), রোজা, যাকাত এবং হজ্জ বিষয় পালনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৩৪]

ফরায়েজী পুঁথিগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে ফরায়েজীদের ধারণা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। নিম্নে 'দুরর-ই-মোহাম্মদ' শিরোনামের একটি পুঁথির আংশিক বর্ণিত হলো:

সে পানি পাইল যাবে দরাক্ত ইমান
তবে তাজার হৈল হুকুমে আল্লাহ।
তৈয়ব কলেমা যেই ইমানের মূল সেই
দিনে দিনে হৈল ওস্তত্তার+
রোজা যে বাগানের কলি নামাজ তাহাতে অলি
জাকাত বুলবুল খোশ লাহান॥
হজ্ব সে গাছের ডাল শুন যত নেক হাল
মালদার যেই মোছলমান+
এই পাঁচ হৈতে যত দোশালা তেশালা কত
দীন এছলামির খুবি হৈল।[১৩৫]

হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কা থেকে দেশে ফিরে বাংলায় 'ঈমানের পানি'র অভাবে ইসলামকে মৃতপ্রায় দেখতে পান। তাই দুরর-ই-মোহম্মদ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। Hunter এ বিষয়ে বলেন, "একশত বছর পূর্বে বাংলায় মোহাম্মদীয় ধর্ম মৃতপ্রায় ছিল'।"[১৩৬]

বাংলায় মুসলিম রাজনীতিকদের ব্যর্থতার কারণে ইসলামের এ করুণ অবস্থা আকস্মিকভাবে মূল্যবান বিষয়ে পরিণত হয়। এ সময় কুসংস্কার ও দুর্নীতিতে মুসলিম সমাজ ডুবে গেলে শরীয়তুল্লাহ পুনর্জাগরণের সর্বাত্মক চেষ্টা চালান এবং চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করেন। একজন খাঁটি ফরায়েজী হিসেবে তিনি বিশ্ব জগতের কল্যাণও কামনা করতেন। অতএব হাজী শরীয়তুল্লাহর সাফল্য এসেছিল ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান এবং সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে। মতাদর্শিক এবং আইনী উভয় ক্ষেত্রেই ফরায়েজীরা 'হানাফী' মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করায় ধর্মীয় কর্তব্য পালনে অত্যন্ত কড়াকড়ি মনোভাব পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক James Taylor

---

১৩৪. ওয়াজির আলী লিখিত পাণ্ডুলিপি, *মুসলিম রত্নহার*, পৃ. ৩২, উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৪।
১৩৫. দুরর-ই-মোহম্মদ, *পুঁথি*, পৃ. ১১-১২; উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।
১৩৬. Hunter, *Englands Work in India, op.cit.*, p. 47.

বলেন, "ফরায়েজীরা অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে অধিক কড়াকড়ি প্রকৃতির নৈতিকতার অধিকারী ছিল।"[১৩৭] উস্তাদ ও খলিফাগণ ইসলামের পাঁচটি মূলনীতি পালনে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ফরায়েজীরা বসবাস অঞ্চলে উস্তাদ ও খলিফাগণ যে কোনো ধরনের গাফিলতির জন্য তাদের অনুসারীদের সতর্ক করে দিতেন।

৩. তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ ইসলামী পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা হিসাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ কুরআনভিত্তিক তওহীদ আল্লাহর একত্ববাদের ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে তওবার পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ করেছেন। ফরায়েজী সমাজে আল্লাহর একত্বের মতবাদটি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাওহীদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সকল বিষয়কে বর্জন করা হয়েছে। শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে তওহীদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করানোর ব্যাপারে অনুরক্ত ছিলেন। তাই এ মতবাদ কেবল ফরায়েজীদেরকে আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেনি বরং সনাতন সমাজের সঙ্গে এর সরাসরি সংঘাতও সৃষ্টি করেছে।[১৩৮] নরহরি কবিরাজের মতে, "নতুন নিয়ম-কানুনের দরুণ হাজী শরীয়তুল্লাহ ও সনাতনপন্থি মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। শরীয়তুল্লাহর অনুসারীরা জোরপূর্বক তাদের আদর্শ সনাতনপন্থিদের উপর চাপিয়ে দিতে চান।"[১৩৯] এ প্রসঙ্গে জেমস টেলর বলেন, "ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ফরায়েজীরা তাদের অন্য মুসলমান ভাইদের অপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তারা অসহিষ্ণু ও উৎপীড়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের প্রতিবেশীদের ধর্মীয় মতামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে গিয়ে প্রায়ই তারা শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হতেন।"[১৪০]

শরীয়তুল্লাহ তাওহীদের প্রচলিত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ প্রচলিত ব্যাখ্যায় কেবল আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে ধারণা ছিল। তাই তিনি 'ঈমান' বা ধর্ম বিশ্বাসকে নিম্নের দুটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করতেন। ১) আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা এবং তার উপর দৃঢ়ভাবে আমল করা, ২) অন্য কিছুর সঙ্গে আল্লাহর অংশীদারিত্ব করা থেকে বিরত থাকা।[১৪১] শরীয়তুল্লাহর মতে, যে কোনো বিশ্বাস এবং কাজের সঙ্গে যদি নাস্তিকতা, শিরক অথবা বেদাতের সামান্যতমও সংশ্রব থাকে তাহলে তা হবে তওহীদ বিরোধী। এছাড়া হিন্দুদের উৎসবে চাঁদা দেয়া, পীরদের প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি, ফাতিহা অনুষ্ঠান এবং এমন ধরনের অন্যান্য কর্মকাণ্ডকেও তিনি তাওহীদ বিরোধী মনে করতেন।[১৪২] শরীয়তুল্লাহর ঐ বক্তব্যের সমর্থনে কেরামত আলী জৈনপুরী বলেন, 'খারিজী' বা 'ফরায়েজীগণ' আমলকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করে থাকে। পূর্ববঙ্গে প্রচারিত ১৮৬৭ সালে একটি প্রচারপত্রে তিনি আরও বলেন, "বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশেষ

---

১৩৭. James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta, 1840, p. 248.

১৩৮. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫।

১৩৯. Narahari Kaviraj, *op.cit.*, p. 65.

১৪০. James Taylor, *op.cit.*, p. 194.

১৪১. নাজিম উদ্দীন, *পুঁথি*, পৃ. ৩; উদ্ধৃত, মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫।

১৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৪।

করে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বরিশাল শহর ও ঐগুলোর আশপাশের এলাকার লোকদের অজ্ঞতার কারণে এরা (ফরায়েজীরা) খারেজীদের ফাঁদে পতিত হয়েছে। এই অজ্ঞতার কারণে এরা 'দ্বীন', 'মাযহাব আকায়িদ', ঈমান এবং আমলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সুযোগটি ফরায়েজীগণ ব্যবহার করেছে।"[১৪৩] এ প্রসঙ্গে H. Beveridge বলেন, "ফরায়েজী আন্দোলন 'প্রিমিটিভ চার্চ আন্দোলনের মত, মোহাম্মদের মৌলিক মতবাদের ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল' এবং 'কুসংস্কারপূর্ণ আচার, যেগুলো কালের বিবর্তনে হিন্দু বা অন্যান্য বিধর্মীদের কাছ থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল, তা পরিত্যাগের আহ্বান করেছিল' এই আন্দোলন।"[১৪৪]

৪. ফরায়েজীদের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ঈদ এবং জুমার নামাজের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফরায়েজীরা ব্রিটিশ আমলে ঈদ ও জুমার নামাজ স্থগিত করে এবং ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলোতে পুনরায় শুরু করে। ফরায়েজীরা মনে করে হানাফী আইন অনুসারে 'মিসর আল জামি'তে (অর্থাৎ যেখানে প্রশাসক এবং কাজী উপস্থিত আছে ও যাঁরা মুসলিম সুলতানদের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত) শুধু ঐ নামাজসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়া বৈধ। তাই ফরায়েজীদের ধারণা ব্রিটিশ আমলে বাংলায় এ ধরনের কোন শহর নেই। সাপ্তাহিক জুমার নামাজ ও ঈদের নামাজের বৈধতা সম্পর্কিত বিতর্ক ফরায়েজীদের সৃষ্টি নয়। ১৩৪৪ সালে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তুঘলক কায়রো থেকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি গ্রহণ করেননি বলে এ বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সুলতান তুঘলকের শিক্ষক 'বুতলঘ খান' তাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, কোনো রাজতন্ত্রই খলিফার স্বীকৃতি ছাড়া বৈধ নয়। তখন থেকে তুঘলক বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, সংগঠিত ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবন খলিফার অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। এ কারণেই তুঘলক জুমা ও ঈদের নামাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তিনি যখন খলিফা থেকে সুলতান বলে স্বীকৃতি পান তখন ঐ নামাজসমূহ পুনরায় চালু করেন।[১৪৫]

পূর্বকালের হানাফী আইন বিশারদবৃন্দ ঈদ এবং জুমার নামাজ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন। এগুলো হলো– (১) স্থানটি মিসর আল জামি হতে হবে, (২) মুসলিম শাসক অথবা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি, (৩) নামাজের জন্য নির্ধারিত সময়, (৪) জামায়াত অথবা জামায়েৎ, (৫) নামাজের স্থানে সকলের প্রবেশাধিকার, (৬) প্রথম দুটি শর্ত মুসলিম শাসিত দেশ ছাড়া যেহেতু পূরণ করা সম্ভব নয়, সেহেতু আইন বিশারদগণ 'দার-আল-হারব' এ বসবাসরত মুসলিমদের জন্য উক্ত নামাজ সমূহ আবশ্যকীয় মনে করেননি।[১৪৬] ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্বের মতো ভারত 'দার আল ইসলাম' হবে না 'দার আল হরব' হবে তা নির্ধারিত হওয়া জরুরি। তাই এ বিষয়ে আইন বিশারদগণের মতামত চাওয়া হয়। এ সমস্যাটি জুমা এবং ঈদের

---

১৪৩. মৌলবি কেরামত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫-৯৭।

১৪৪. H. Beveridge, *The District of Bakergonj its History and statistics*, London, 1876, p. 254.

১৪৫ I. H. Qureshi, *Sultanate of Delhi*, London, 1938, pp. 33-35.

১৪৬ মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮।

নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কারণ ভারত 'দার-আল-হরব' হলে এর অধিবাসীদের জন্য জুমা ও ঈদের নামাজ পড়া আবশ্যকীয় হবে না। সুতরাং দেশের মর্যাদা চিহ্নিত করতে গিয়ে জুমা ও ঈদের নামাজের বিষয়টিও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে। উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে ব্রিটিশ শাসন যখন পুরোপুরি সুসংহত হয়, তখন মুসলিম আইন বিশারদগণের সিদ্ধান্ত হান্টারের মতে, অনুমানের চেয়ে বাস্তবরূপে দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ মৌলবি আবদুল হাই তাঁর ফতোয়ায় মতামত দেন, দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত খ্রিস্টান সাম্রাজ্য এবং হিন্দুস্তান সংলগ্ন অন্যান্য প্রদেশসমূহ 'দার-আল-হরব'[১৪৭] কুফর এবং শিরক সর্বত্র বিরাজমান এবং কোথাও ইসলামের আইনসমূহের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই। যখন কোনো দেশ এ ধরনের পরিস্থিতিতে থাকে তখন সে দেশটি 'দার-আল-হরব'। হান্টার যদিও ফরায়েজীদের উল্লেখ করে কিছু বলেন নি, তিনি ওয়াহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর উল্লেখিত কিছু উদাহরণ ফরায়েজীদের মধ্যেও লক্ষণীয়।[১৪৮] ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত চাকুরে হয়েও কলকাতার সবচেয়ে খ্যাতিমান দু'জন মুসলমান মাদ্রাসা আলীয়ার প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ ওয়াজিহ্ এবং প্রাক্তন কাজী-উল-কুজ্জাত ফজলুর রহমান শুক্রবারের নামাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। তাঁরা ভারতকে শত্রুদেশ হিসাবে বিবেচনা করে তাদের ধর্মীয় জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

ফরায়েজীগণ ফতোয়া দেন যে, হাদিসের এবং নবির সাহাবাগণের জীবন দর্শন এবং হানাফী মাযহাবের মতামত, অন্যান্য মাযহাবের মতামতের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। ফরায়েজীগণ তাদের মতামতের সমর্থনে নবিজির হাদিস এবং সাহাবাগণের মতামত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে নিম্নোক্ত উপসংহারে উপনীত হয়– (ক) যেখানে আমির কাজি বা হাকিম বাস করেন, সে স্থান 'মিসর আল জামি' এবং সেখানে জুমার নামাজ বৈধ। আর যে স্থান 'মিসর আল জামি' নয় অর্থাৎ এরা বাস করেন না, সে স্থানে জুমার নামাজ বৈধ নয়। (খ) সঠিকভাবে বলতে গেলে বাংলার অধিকাংশ গ্রামেই মসজিদ ছিল না। কিছু এবাদত খানা থাকলেও এগুলোতে ওয়াকফ সম্পত্তি নেই বলে মসজিদ নামকরণ করা যায় না। তাহলে এ গ্রামগুলোকে কিভাবে 'মিসর আল জামি' বলা যায় এবং কেমন করে এগুলোতে জুমার নামাজ আদায় করা যায়?[১৪৯]

সুতরাং দেখা যায় 'মিসর আল জামি'কে কেন্দ্র করেই মূলত ফরায়েজীদের যুক্তি ছিল। তাদের মতে, একটি স্থানে অবশ্যই আমির বা কাজি অথবা হাকিমকে বসবাস করতে হবে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় কোনো শহর বা গ্রাম ফরায়েজী ফতোয়ায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না। তাই ফরায়েজীরা ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় জুমার নামাজ আদায়ের কোনো বৈধতা দেখেনি। তবে কেরামত আলী জৈনপুরী ১৮৭০ সালে প্রচার করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন চলমান থাকা সত্ত্বেও এটা 'দার-আল-ইসলাম'। কারণ

---

১৪৭. তবে ভারতকে ১৮০৩ সালে সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দিল্লির শাহ্ আবদুল আজিজ 'দার-আল-হরব' বা শত্রুদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। W. W. Hunter, *The Indian Musalman's, op.cit.*, pp. 142-143.

১৪৮. *Ibid*, pp. 142-143.

১৪৯. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০।

এখানে জনগণের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।[১৫০] এ যুক্তির ভিত্তিতে তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য জুমার নামাজ ফরজ মনে করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শুধু ঈদের নামাজ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই ফরায়েজী মতাদর্শ আবর্তিত ছিল না। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রশাসনিক পরিবর্তন ছিল মুসলিম সমাজের স্বার্থবিরোধী, যা মুসলমানদের অনুভূতির বিরুদ্ধে যায়। ফরায়েজীদের মতাদর্শ ছিল এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। ফরায়েজীদের মতাদর্শে আমির, কাজী ও হাকিম সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এ মতাদর্শের প্রতি সমর্থন বলা যায়।

৫. কুরআন এবং হাদিসে নেই এমন সব ধরনের প্রচলিত আচার এবং উৎসবাদি ফরায়েজীরা ত্যাগ করার আহ্বান জানায়। জনপ্রিয় উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফরায়েজীদের অভিমত যে, এর সঙ্গে শিরক, বেদাত এবং সব ধরনের অনৈসলামিক ক্রিয়া-কর্ম যুক্ত। সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের পরিপন্থি যে কোনো আচরণ এবং বিশ্বাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা 'তাওহীদে'র অংশ। স্বাভাবিক কারণেই হাজী শরীয়তুল্লাহ্ বহুসংখ্যক কুসংস্কার, সামাজিক আচারানুষ্ঠানাদি বর্জনের ঘোষণা প্রদান করেন। কোনো কুফর, শিরকই তাঁর সংস্কার থেকে বাদ পরেনি, সমসাময়িক এবং পরবর্তী উৎস থেকে বিভিন্ন কুসংস্কারের তালিকা এবং বর্ণনা পাওয়া যায় যা হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজীদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত করেন। জেমস্ টেইলর বলেছেন, ফরায়েজীরা পট্টি, চাট্টি এবং চিল্লা– যা শিশুর জন্মদিন এবং চল্লিশ দিনের সময় উদযাপিত অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করে। ফরায়েজীরা ইসলামী বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শুধু আকীকা অনুষ্ঠান পালন করত। এ জন্য ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করে আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন করত এবং শিশুর নাম রাখা হতো। এছাড়া ফরায়েজীরা শিশুর মাথার চুল কামানো, বিবাহ ও মৃত্যুর সময়ের অনুষ্ঠানকে অনাড়ম্বর করে। তারা সকল অনৈসলামিক রীতিনীতি যেমন বিবাহের সময় মিছিল এবং দাফনের সময়ে বিভিন্ন ফাতিহা অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন।[১৫১]

ফরায়েজীরা প্রায় বিনা বাঁধায় সমাজে ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। তবে পীরবাদ, বর্ণপ্রথা এবং দাই নিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কার করতে ফরায়েজীদের রক্ষণশীল সমাজের একটি অংশ থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়; যা নিম্নে বর্ণিত হলো–

পীরবাদ: শরীয়তুল্লাহ্র শিক্ষক তাহির সম্বলের অনুপ্রেরণায় তিনি সুফিবাদে আকৃষ্ট হন এবং সুফিবাদকে ধর্মীয় জ্ঞানের উচ্চতর অংশ মনে করতেন। তাঁর মতে, কোনো ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথে অনুশীলন করতে পারে তখনই, যখন সে শরীয়ত ও তরীকত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তা না হলে ঐ ব্যক্তি বিপথগামী হতে পারে। তাই শরীয়তুল্লাহ খাস্ (নির্বাচিত) এবং আম (সাধারণ) এর মধ্যে পার্থক্য দেখেছেন। শুধু

---

১৫০. মৌলবি কেরামত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪।

১৫১. James Taylor, *op.cit.*, pp. 249-250.

প্রথমোক্ত ব্যক্তিরাই সুফিবাদে দীক্ষিত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।[১৫২] অন্যদিকে, শেষোক্তদের কোরআন থেকে নিয়মিত তেলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যবর্তী হিসেবে পীরদের বিবেচনা করা হতো। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ পীর-মুরিদ সম্পর্ককে উস্তাদ (শিক্ষক) এবং সাগরেদ (ছাত্র) হিসেবে আখ্যায়িত করার কথা বলেন। উস্তাদ এবং সাগরেদ এ দু'টি শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্পণ বুঝায় না, যা 'পীর' এবং 'মুরিদ' শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। শরীয়তুল্লাহ্ আরও মতামত দেন যে, 'পীর' শব্দটি অপঅর্থে ব্যবহৃত হয়ে একটি দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে পীর শব্দটি কুসংস্কার ও অন্যান্য আচারে কলুষিত হয়ে পড়েছে।[১৫৩] তাই তিনি পীর শব্দটি বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি পীরদের মৃত্যু বার্ষিকীতে উরস অনুষ্ঠানেরও বিরোধিতা করেন। পীরবাদ সম্পর্কিত শরীয়তুল্লাহ মতবাদ পীরবাদের প্রতি অনুরক্ত রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এমনকি কোথাও কোথাও এর প্রতিরোধ প্রয়াসও হয়েছিল।

বর্ণপ্রথা ও কুসংস্কার: ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসংখ্যা ছিল চণ্ডাল ও নমশুদ্র। অসম্পৃশ্যতা (?) এবং বর্ণবাদের প্রচলন এ অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।[১৫৪] সৈয়দ, শেখ, পাঠান এবং মোল্লা পদবিধারী ব্যক্তিরা ফরিদপুর জেলার মুসলিম সমাজে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিল। এদের মধ্যে যে কৌলিন্যের মনোভাব বিদ্যমান ছিল, তা অনেকটাই হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়। জেমস্ টেইলর ঢাকা শহরের বিবরণে বলেন, "মুসলিম সমাজের নিম্নশ্রেণির মধ্যে বেশ কয়েক ধরনের বিভক্তি ছিল। জীবিকা এবং চাকুরির পদমর্যাদা ছিল এই এই বিভাজনের মূলসূত্র, যা ছিল বর্ণপ্রথার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিয়ে এবং সামাজিক অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিভাজন ছিল হিন্দুদের মতোই সুস্পষ্ট ছিল।[১৫৫] জেমস ওয়াইজের তথ্যানুসারে,"বাংলার মুসলিম সমাজ হিন্দুদের বর্ণপ্রথার অনেকাংশই অনুসরণ করে থাকে। পিতার পেশা পুত্র অনুসরণ করা সত্ত্বেও বৈষম্যের কোনো হেরফের হতো না।"[১৫৬] এ সব তথ্য প্রমাণ থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমান সমাজে কুসংস্কারমূলক বৈষম্য বহাল ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ মুসলমান সমাজে বিদ্যমান এ বৈষম্যসমূহ গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেন এবং একে গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন, এ ধরনের বৈষম্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। তিনি সকল মুসলমানদের মধ্যে সাম্যনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।[১৫৭] এ নীতির ফলে অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণি তাঁতি, কুলু এবং ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর ও বাকেরগঞ্জের অন্যান্য নিম্নবর্গীয় বলে পরিচিত মুসলমানগণ ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুসলিম সমাজে বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যের ব্যাপারে শরীতুল্লাহ্র অবস্থান মুসলিম সমাজের আশরাফ শ্রেণিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। জানা যায়

---

১৫২. মৌলবি কেরামত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪।

১৫৩. James Wise, *op.cit.*, pp. 10-22.

১৫৪. L. S. S. O. Malley, *Bengal District Gazetteers: Fureedpore*, pp. 46-47.

১৫৫. James Taylor, *op.cit.*, p. 244.

১৫৬. James Wise, *op.cit.*, p. 34.

১৫৭. *Ibid*, p. 22.

যে, এর জের হিসেবে হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌কে তাঁর বিরোধীরা 'জোলার পীর' এবং ফরায়েজীদেরকে 'জোলার পোলা' বলে আখ্যায়িত করতেন।

১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে ফরিদপুরের 'দাই'দেরকে মুসলিম সমাজের নির্দিষ্ট বর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে"[১৫৮] জীবিকা হিসেবে দাইকে নিম্নশ্রেণির বিবেচনা করা হত। ফরায়েজীরা মনে করে, এ ধরনের কুসংস্কারপূর্ণ আচার হিন্দু প্রতিবেশী থেকে এসেছে।[১৫৯] হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ নাড়ি কর্তনের জন্য এককভাবে দাইকে ব্যবহারের প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করেন। তিনি এর বিকল্প হিসেবে পরিবারের বা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা অথবা প্রয়োজনে সন্তানের পিতা নাড়ি কর্তন করতে পারবেন বলে মত প্রকাশ করেন। তবে তাঁর এ মতের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজ প্রতিবাদ করে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে হিন্দুদের জাতীয় পোশাক ধুতির পরিবর্তে পাজামা বা লুঙ্গি পরিধানের পরামর্শ দেন। তিনি উল্লেখ করেন, পাজামা বা লুঙ্গি নামাজ আদায়ের জন্য সুবিধাজনক। যদি কেউ ধুতি পরিধান করে তাহলে তা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে না টেনে সাধারণভাবে পড়তে বলেন। এভাবে পরিধান করলে নামাজ আদায়ে সুবিধা হবে বলে শরীয়তুল্লাহ মনে করেন। ধুতি পরিধানের এ ধারণাটি ইংরেজদের শুধু দৃষ্টিই আকর্ষণই করেনি বরং তাদের মনে সন্দেহও সৃষ্টি করে।[১৬০] এ প্রসঙ্গে হান্টার বলেন, "বাহ্যিকভাবে একজন ফরায়েজী ধুতি পরিধানের সময় দু'পায়ের মাঝ দিয়ে না টেনে দু'পায়ের চারদিকে ধুতি পরিধান করে থাকে, খ্রিস্টানদের ট্রাউজার পরিধানের সাদৃশ্য ত্যাগ করার জন্য।"[১৬১] প্রকৃতপক্ষে, শরীয়তুল্লাহ্‌ ইসলামী নৈতিকতা অনুযায়ী অনুসারীদের উরু যাতে আবৃত থাকে, তাই তিনি করতে চেয়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় চিন্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। বাঙালি মুসলিম সমাজের জাগরণের অগ্রদূত নবাব আবদুল লতিফ একজন আচারনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। মুসলিম সমাজের ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও তিনি মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনাচরণের বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীতা স্বীকার করেন। এজন্যই তিনি শুধু কলকাতা মাদ্রাসাকে রক্ষাই নয়, ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তবে নবাব আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজে প্রচলিত ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদী ধর্মীয় মতবাদে আস্থাশীল ছিলেন না। এজন্যই তিনি মুসলিম সমাজকে জিহাদী মনোভাব পরিহার করার অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, গোড়া মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল যে, বিধর্মীদের অধীনে ভারতবর্ষ

---

১৫৮. James Taylor, *op.cit.*, p. 263.
১৫৯. *Ibid*, p. 50.
১৬০. H. Beveridge, *op.cit.*, p. 255.
১৬১. W. W. Hunter (ed.), *Imperial Gezetteer of India*, Vol. II, London, 1886, p. 399.

মুসলিমদের জন্য ‘দার-উল-হারব’ এবং মুসলিমদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য। মুসলিমদের এ বিশ্বাস যে ভুল, তা দূর করার জন্য আবদুল লতিফ আলেমদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁর আমন্ত্রণে জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী ১৮৭০ সালের ৩০ নভেম্বর কলকাতার এক সভায় জোরালো কণ্ঠে বলেন যে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ ‘দার-উল-হারব’ নয় বরং ‘দার-উল-ইসলাম’। এভাবে তিনি উনিশ শতকে মুসলিমদের একটি ধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাবেরই কেবল পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেননি, বরং তাদের একটি প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা করেন।
বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণের আরেক দূত ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ছিল যুক্তিবাদের উপর ভিত্তিশীল (?)। বাঙালি মুসলিম সমাজের জাগরণের লক্ষ্যে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টির পুনরুদ্ধার এবং ব্যাখ্যার মহান দায়িত্বপালন করেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, মুসলিম সমাজ তাদের অতীত গৌরবময় ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উন্নতির পথে ধাবিত হবে। ইসলাম ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে সৈয়দ আমীর আলী বেশ কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজে চিন্তার উৎকর্ষ বিধান এবং তাদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধন। সৈয়দ আমীর আলীর লেখায় মুসলিম সমাজের অতীত গৌরব ও তাদের শৌর্য-বীর্যের পরিচয় রয়েছে। তবে তাতে উৎকট সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করে আমীর আলী দেখিয়েছেন যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ) একজন আদর্শ মানব ও আদর্শ নেতা ছিলেন এবং তিনি সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। ইসলামকে তিনি একটি প্রগতিশীল বিশ্বধর্ম হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর ভাষ্যমতে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) একটি বিশ্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই ধর্মের মধ্যে সর্বজনীন আবেদন আছে এবং তিনি সর্বজনীন মানবতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।[১৬২] তিনি ইসলামের বর্ণবৈষম্যহীন বৈশিষ্ট্যের কথাও আমীর আলী জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন। ইসলামের উদার মতবাদের উল্লেখ করে আমীর আলী লিখেছেন, “যে বাণী সমগ্র মানবজাতির মধ্যে মুক্তি, সাম্য ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ঘোষণা করেছিল, তা এখন নূতন তেজের সাথে শুনবার সময় এসেছে।[১৬৩] ইসলামের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, “ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের প্রতি কোন ধর্মই ইসলাম অপেক্ষা বেশি নিরপেক্ষ নয়।”[১৬৪] আমীর আলী ইসলাম ধর্মকে একটি প্রগতিশীল ও প্রাণবন্ত ধর্মের রূপে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইসলামে কোনো গোড়ামী ও রক্ষণশীলতার স্থান নেই। তিনি ইসলাম ধর্মের মর্মবাণীর যৌক্তিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর রচনাসমূহে এর প্রতিফলন রয়েছে।

---

১৬২. *Syed Ameer Ali, Spirit of Islam,* উদ্ধৃত, এ এ রহিম, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১৪৩
১৬৩. ঐ
১৬৪. ঐ

বাঙালি মুসলিম সমাজে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের সমাসাময়িক অন্যান্য মুসলমান নেতাদের অপেক্ষা আমীর আলীর অবদান যে অনেক বেশি মূল্যবান ও ফলপ্রসূ ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজ ছিল তাঁর চিন্তার মূলভিত্তি। তবে তিনি পূর্বসূরী বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের মত ইসলাম ধর্মের গতানুগতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীল ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে কখনো স্বীকৃতি দেননি। এমনকি ধর্মের নামে কুসংস্কারমূলক ও অযৌক্তিক বিধি-বিধান পরিহার এবং এর সংস্কারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মুসলমান সমাজের গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করে তাতে আধুনিক ও প্রগতির ধারা প্রবাহে যত্নশীল ছিলেন। এজন্য তিনি মুসলিম সমাজে সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবর্তে আধুনি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি তিনি মুসলমানদের ঐতিহ্যবাদী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা শিক্ষার বিলুপ্তির পক্ষেও মত দিয়েছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলী সর্বপ্রথম ভারতীয় মুসলমানগণ একটি জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমীর আলী তাঁর বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতের সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান অধিবাসী একটি জাতি এবং ভারতে তারই একমাত্র জাতি যাদের মধ্যে সমতা আছে।[১৬৫] শুধু তাই নয়, তিনি মুসলমানদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যানুভূতিতে বিশ্বাস করতেন। আর এ জন্যই শিয়া মতাবলম্বী হলেও বিশ্ব মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে তিনি খিলাফত ব্যবস্থার সমর্থন করতেন।

বাঙালি মুসলিম সমাজের এক বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন দেলোয়ার হোসেন আহমেদ মীর্জা (১৮৪০-১৯১৩)। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল মানুষ। দেলোয়ার হোসেন রেনেসাঁ ভাবদর্শী এবং ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৃহীত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম ছিল মুসলিম সমাজ থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক বিধি-বিধান অনুশাসন ইত্যাদি দূরীকরণের প্রয়াস। সে সময়ের জন্য এরূপ ভূমিকা পালন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল সন্দেহ নেই, তবে তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে নির্ভীক। তিনি মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার প্রয়াসী ছিলেন। এজন্য তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত অযৌক্তিক আইন-কানুন, আচার-নীতি-প্রথা ইত্যাদির বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং প্রগতিশীল ধর্মসংস্কারকদের মতো বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখেন। তিনি বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগ ও গোঁড়ামি পরিহারের তাগিদ দেন। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ইহজাগতিকতায় আস্থাশীল হওয়ায় দেলোয়ার হোসেন আহমদ মীর্জা সামাজিক বিষয়াদিকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততারও পক্ষপাতী ছিলেন না। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধর্মের প্রভাবের কারণে মুসলমান সমাজ সামনে এগুতে পারছেনা বলেও তিনি মনে করতেন। সৈয়দ আমীর আলীর মত তিনিও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান গতানুগতিক

১৬৫. এ এ রহিম, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১৪৪

মাদ্রাসা শিক্ষার বিলুপ্তির পক্ষে ছিলেন। কারণ তাঁর মতে, মাদ্রাসায় প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সময়ের দাবি পূরণে অনুপযোগী এবং অর্থের অপচয় বৈ কিছু নয়।[১৬৬]

ইহজাগতিক যুক্তিবাদী (secular rationalist) হিসেবে পরিচিত দেলোয়ার হোসেন আহমদ মীর্জা হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি দূর করতে তিনি বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং তত্ত্বের নিরিখে জীবন ও জগতের যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেন।[১৬৭] আধুনিক বাঙালি মুসলমান সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় তিনি আধুনিক শিক্ষা বিস্তার এবং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিকের যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে সমাজসংস্কারের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম মুসলমান সমাজকে সত্যিকার অর্থে আধুনিক ধারায় প্রবাহের সূত্রের সন্ধান দিয়েছিলেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় মুসলিম সমাজ একটি ধর্মীয় রক্ষণশীল আবহের মধ্যে অবর্তিত হয়েছে। এ সময় মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব ছিল মূখ্যত ধর্মীয় নেতাদের কাছে। তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতা হারানো মুসলিম সমাজের অধোগতির জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় শৃঙ্খলার অভাবকে অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই মুসলিম সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন শুরু করেন। তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া এবং ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় পূনর্জারণমূলক আন্দোলন। এর সাথে ব্রিটিশ কোম্পানি সরকারকে উৎখাতের জন্য ধর্মীয় ভাবাবেগের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা করে মুসলিম সমাজকে জিহাদী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করার কৌশলও উপর্যুক্ত আন্দোলনসমূহে যুক্ত হয়েছিল। তবে এর দ্বারা মুসলিম সমাজ বিশেষ উপকৃত হয়নি। বরং তাদের জিহাদী তৎপরতার কারণে তারা ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজনে পরিণত হয় এবং সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আরো হতদরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে নেতৃতেত্ব আবির্ভাব ঘটে, তারা যুগ বাস্তবতা উপলব্ধি করে মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। তাঁরা ধর্মীয় ব্যাপারেও মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে তাদের জিহাদী মনোভাব পরিহারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সময় বাঙালি মুসলিম সমাজে রক্ষণশীলতা ও আধুনিক মনস্কতার কিছুটা দোলাচলে থাকলেও তারা ক্রমান্বয়ে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ধর্মীয় চিন্তনের ক্ষেত্রেও রক্ষণশীলতার পরিবর্তে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে। এক্ষত্রে নবাব আবদুল লতিফ, বিশেষ করে সৈয়দ আমীর আলী এবং দেলোয়ার হোসেন মীর্জা প্রমুখ বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

---

১৬৬. আব্দুল মালেক, বিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষাচিন্তা ও সমাজসংস্কার: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পৃ. ৪৬৯

১৬৭. তৎকালীন জনপ্রিয় ইংরেজি পত্রিকা *The Muslmans* এ প্রকাশিত তাঁর একধিক নিবন্ধ এবং অন্যান্য লেখায় এর প্রকাশ ঘটে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মো. আব্দুল মালেক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬৮

চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন

বারো শতকের শেষ দিকে দিল্লীকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তেরো শতকের প্রথম দশকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী। এ সময় ভারতবর্ষের পূর্বাংশে বাংলা ও বিহারে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্ দিল্লীর শাসক মুহম্মদ বিন তুঘলকের কর্তৃত্ব স্বীকার করে বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। ১৩৪২ সালে ইলিয়াস শাহ বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন শুরু করে নিজে 'শাহ-ই-বাঙালা' উপাধি গ্রহণ করেন। এ বংশের পর সৈয়দ বংশ, হাবসী বংশ, হুসেন শাহী বংশ ও আফগান বংশ বাংলা জনপদ শাসন করে। মূলত তেরো শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সাথে সাথে নতুন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পত্তন ঘটে। আকবরের রাজত্ব কালে (১৫৫৬-১৬০৫) ১৫৭৬ সালে মুঘলরা সর্বপ্রথম বাংলা জয় করে। মুঘলরা তাদের ক্ষমতাকে সুসংহতকরণ ও শাসনের স্থায়িত্বের জন্য এদেশে ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণির পরিবর্তে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শ্রেণির বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন, মুঘল আমলে রাষ্ট্রই ছিল সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্র।[২] মুঘলদের মনোভঙ্গি বিশ্বজনীন হওয়ায় তাদের মধ্যে বাদশাহকে আনুগত্য প্রদান করলে বিশ্বের যে কেউ তাঁর রাজ্যে বসবাস করতে পারত, এমনকি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও তার উপর অর্পণ করা হত।[৩] মুঘল সরকারের 'মুক্তদ্বার' নীতিই এদেশে ইংরেজদের আগমনের পথ সুগম করে দেয়। সতের শতকের শুরুতে 'ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসে, অচিরেই বণিকের মানদণ্ডে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। সুদীর্ঘ ১৯০ বছরে তাদের শাসন ও শোষণ ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে নিজেদের অনুকূলে নতুন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি

---

১. A. B. M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, 2nd revised edition, 1962. মোঃ আখতারুজ্জামান, *পূর্ব ভারতে মুসলিম বিজয় : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা*, ইতিহাস, ৩৩ বর্ষ : ১-৩ সংখ্যা, বাংলা ১৪০৬, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ৭২।

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, *প্রথম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩।

করে; যা সৃষ্টি করে মধ্যস্বত্বভোগী, অত্যাচারিত শ্রেণি ও তাদের শোষণের শিকারে পরিণত হয় এদেশের কৃষক সমাজ। এর ফলে ভূমির উপর তাদের মালিকানা হারায়। উদ্ভব হয় এক নতুন সামন্ত শ্রেণির।

এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকলেও এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে বাংলার রাজনীতিতেও নতুন আবহ ও ব্যঞ্জনা তৈরি হয়। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে বাংলার জনসমষ্টি হিন্দু ও মুসলিম -এ প্রধান দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উনিশ শতকের সূচনা লগ্নেই পরিবর্তিত বাস্তবতায় হিন্দু সমাজ সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন। সরকার প্রবর্তিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি পাশ্চাত্য ধাঁচের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সাথেও তারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে তা হয় নি। মুসলিম সম্প্রদায় অতীতে শাসক জাতি ছিল বিধায়, সেই মনোভাব বজায় রেখে বিধর্মী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, ধর্মাশ্রয়ী কতিপয় আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের হাত থেকে রাজক্ষমতা দখল করে নেয়া ইংরেজ শাসককূলের প্রতি তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে। এ সময় উত্তর ভারতে সূচিত তরিকা-ই-মুহাম্মদী বা তথা কথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের জিহাদী প্রবণতা বাংলার মুসলিম জনমতকে প্রভাবিত করে। ফলে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদে তারা সশস্ত্র জিহাদী পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ হয়। এই ভাবনার মধ্যেই মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা আবর্তিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। এ সময় মুসলিম সমাজে নগরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত ও পেশাদার শ্রেণি থেকে আগত এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, নিজেদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে হলে প্রতিবেশি হিন্দুদের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াও ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতামূলক রাজনৈতিক নীতি অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই বোধ দ্বারা তাড়িত মুসলিম সমাজের নব্য নেতৃত্ব নিজ সম্প্রদায়ের মনোজগত তথা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উদ্যোগী হন। এর ফলে বাংলার মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও রূপান্তর ঘটে। তারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের যুদ্ধাংদেহি নীতি পরিহার করে সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার রাজনীতির পথে অগ্রসর হয়। বর্তমান অধ্যায়ে উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার রূপান্তরের প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুসন্ধানের একটি বিনীত প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৩.ক মুসলিম সমাজের উপর কোম্পানি শাসনের প্রভাব ও তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

বাংলায় শাসনতান্ত্রিকভাবে ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা অনুশীলন শুরু হয় ১৭৬৫ সালে। তবে কার্যত কোম্পানির কর্তৃত্ব নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায়। কোম্পানি শাসন এদেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের সূচনা করে। এতে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সনাতন অধিকার ও সুবিধাগুলো বাধাগ্রস্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের উপর কোম্পানি শাসনের প্রভাব ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষতিকর। এর কারণ

কোম্পানির কাছে রাজক্ষমতা হারানোর ফলে মুসলিম সমাজ তাদের কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি, অন্যদিকে কোম্পানি সরকারও মুসলমানদের কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারেনি। এ কারণে কোম্পানি সরকার ভবিষ্যৎ বিপদের ঝুঁকি এড়ানোর অভিপ্রায় নিয়ে শুরু থেকেই মুসলিম সমাজকে হীনবল করার সচেতন কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এদেশে দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন বজায় থাকায় তুলনামূলক বিচারে মুসলনমানরা সুবিধাভোগী ছিল। সেনাবাহিনী, রাজস্ব ও বিচার প্রশাসন এবং অন্যান্য শাসন বিভাগে মুসলমানদের প্রাধান্য তাদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের উৎস বলে গণ্য হতো। কিন্তু কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর তারা একে একে তাদের সমৃদ্ধির পূর্বোক্ত সূত্রসমূহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। কোম্পানি সরকারের নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনানীতি, শিক্ষানীতি ও সরকারি চাকুরিতে নিয়োগনীতি মুসলিম সমাজের স্বার্থানুকূল না হওয়ায় তারা অর্থাগমের এসব উৎস পথ হতে বঞ্চিত হন।

১৮৩৭ সালে কোম্পানি সরকার ফারসির স্থলে ইংরেজিকে রাজভাষা করে। এর ফলে মুসলমানদের দুর্দশা আরো চরম পর্যায়ে পৌঁছে। কিছুটা দারিদ্র্যের কারণে এবং কিছুটা জাত্যাভিমানের কারণে মুসলমান সমাজ সরকারের প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় রাজকীয় ও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তনের ফলে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের সুযোগ মুসলমানদের জন্য প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার মন্তব্য করেছেন যে, চাকুরি ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এমনভাবে বাদ দেয়া হয়েছে যে, কলকাতার অফিসগুলোতে চাপরাশী, কলম মেরামতকারী প্রভৃতি নিম্নতম পদে নিযুক্ত কতিপয় কর্মচারী ছাড়া অন্য কোন পদে মুসলমান নাই বললেই চলে।[৫] S. A Rashid এর বর্ণিত তথ্যের আলোকে M. A. Rahim তাঁর গ্রন্থে কোম্পানি সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে মুসলমানদের দুরবস্থার চিত্রটি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।[৬] উল্লেখ্য যে, সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের এ পশ্চাদপদতার কারণ যে শুধু তাদের ইংরেজি শিক্ষার অভাব ছিল তা নয়, এর পিছনে সরকারের মুসলিম বিদ্বেষ নীতিও দায়ী ছিল। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানদের নিয়োগ না দিয়ে হিন্দুদের নিয়োগ প্রদান করা হতো। এমনকি চাকুরির বিজ্ঞাপনেও উল্লেখ থাকতো যে, কেবল হিন্দুরাই আবেদন করতে পারবেন। ১৮৬৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দূরবীন* নামক

---

৪. কোম্পানি সরকার ও মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক ও কোম্পানি সরকারের মুসলিম স্বার্থ বিরোধী নীতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে– Clive’s Letter to Hastings, 28 November 1767, quoted in H Beveridge and Warren Hastings in Lower Bengal”, *Calcutta Review,* Vol. LXV, 1877; ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে দেয়া স্যার জন ম্যালকমের বক্তব্যে; W W Hunter প্রণীত *The Indian Mussalmans,* Calcutta, 1936 এবং আজিজুর রহমান মল্লিক প্রণীত *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান* (বাংলা অনু. দিলওয়ার হোসেন) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২ ইত্যাদি গ্রন্থে।

৫. W W Hunter, *op.cit.,* p. 162.

৬. দ্রষ্টব্য: Sh. A Rashid, *Central National Mohammedan Association of Calcutta,* Punjab University, 1963 pp. 20-23; M A Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal (A. D. 1757-1947, 2nd Ed.),* University of Dhaka, 2011, pp 57-60.

একটি ফারসি পত্রিকায় সরকারের এ নীতির সমালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।[৭] সরকারি চাকুরিসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য দেয়ার পিছনে যে প্রধান কারণটি ছিল, তা হলো মুসলমানদের প্রতি সরকারের বিদ্বেষ ও তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে তাদের সংশয়। অন্যদিকে শুরু থেকেই হিন্দু সমাজ ব্রিটিশদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাদের কর্মকাণ্ডে শাসকগোষ্ঠীর মনে এ ধারণা জন্মে যে, তারা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত। এমনকি কোম্পানি সরকারের মনে এ ধারণাও জন্মেছিল যে, যতদিন হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকবে, ততদিন মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হয়েও কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।[৮] আর এ কারণেই তাঁরা মুসলমানদের হীনবল করার বিপরীতে হিন্দু সম্প্রদায়কে শক্তিশালীকরণের যে নীতি গ্রহণ করেন, তাতে মুলমান সম্প্রদায় একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হয়। মুসলিম সমাজের সার্বিক দুরবস্থার চিত্র দেখে হান্টার মন্তব্য করেন যে, কোম্পানি শাসন পূর্ব যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে অভাবগ্রস্থ লোকের সন্ধান পওয়া দুরূহ ছিল, আর পঁচাত্তর বছরব্যাপী কোম্পানি শাসনের প্রভাবে তাদের মধ্যে সচ্ছল পরিবার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।[৯]

ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাড়ে পাঁচশত বছরের রাজ ক্ষমতা ও রাজ্য হারিয়ে মুসলিম সমাজ একটি দিকভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল। অবশ্য অচিরেই মুসলমানরা এ দিকভ্রান্তি কাটিয়ে তাদের হৃত রাজ্য হারানোর তথা অতীত গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আঠারো শতকের কিছু প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এসব প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে ছিল ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০ খ্রি.), শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮ খ্রি.), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩ খ্রি.), বরিশালের বলাকী শাহের বিদ্রোহ (১৭৯২) এবং সিলেটের আগা মোহাম্মদ রেজা শাহের বিদ্রোহ ইত্যাদি।[১০] এসব প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপকতা ও জনসম্পৃক্ততা বিবেচনায় ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে উদ্ভূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ফকির নেতা মজনু শাহ ও সন্ন্যাসী ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আঠারো শতকে পরিচালিত অন্যান্য প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোও প্রকৃতিগত দিক থেকে প্রায় একই রকম ছিল। এসব আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ভূমিতে অধিকার হারানোর প্রতিবাদ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক দোসর হিসেবে আবির্ভূত নতুন ভূমিজ পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যায়-অন্যায্য শোষণের

---

৭. M A Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal (A. D. 1757-1947, 2nd Ed.)*, University of Dhaka, 2011, p. 56.

৮. এ প্রসঙ্গে সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮১৩ সালে কর্ণেল টমাস মনরোর দেয়া একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্পষ্ট করেই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃতিটি দ্রষ্টব্য আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩।

৯. W W Hunter, *op.cit.*, p. 175.

১০ এসব প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৩; রতন লাল চক্রবর্তী, "প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃপৃ. ১৮৩-২২৬।

বিরুদ্ধে। কোম্পানি সরকার তার দোসরদের রক্ষায় এগিয়ে এলে প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এ সংঘাতে কোম্পানি সরকারের উন্নত রণকৌশল ও সামরিক প্রযুক্তির কাছে এসব দেশীয় প্রতিরোধের অবসান ঘটে।

৩.খ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম রাজনীতির স্বরূপ ও ধারা

বাংলার ইতিহাসে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা বলতে যা বুঝায়, তার উদ্ভব হয়েছে মূলত এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরোক্ষ ফল হিসেবে। আঠারো শতকের শেষের দিকে এদেশে যে ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা শুধু এদেশে একটি বিদেশি রাজ প্রতিষ্ঠা ছিল না, বরং এর মাধ্যমে এদেশ পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসে যার মাধ্যমে এ অঞ্চলের জীবন মানসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ইউরোপে যে নব নব চিন্তাধারা ও বিধিব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঘটছিল তার ছোঁয়া এসে লেগেছিল এদেশে; যার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা হয়। ইংরেজ শাসন এদেশে কোনো উন্নততর ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে এমনটি না হলেও তাদের প্রবর্তিত কর্মকাণ্ডই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম করেছে। বস্তুত উনিশ শতকে এদেশে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ইংরেজ রাজত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আর এ কারণেই বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক ইতিহাসেও উনিশ শতক যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। অনেকেই উনিশ শতককে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের উন্মেষপর্ব বলে উল্লেখ করেছেন। এই শতকেই এখানকার মুসলিম সমাজ নিজেদের স্বতন্ত্র বাঙালি জাতি হিসেবেও চিহ্নিত করতে শুরু করে। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বা মহাবিদ্রোহের পর মুসলিম মননে রাজনীতি সম্পর্কে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। বিবর্তনের যুগ হিসেবে উনিশ শতকের শেষ পঞ্চাশে এদেশের মুসলিম জনগণের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত দেখা দিতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে। তবে এ পাশ্চাত্যকরণের প্রক্রিয়া ছিল মন্থর। এ প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে ব্রিটিশ রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; যা এদেশে সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তাছাড়া এদেশে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে আরো দুটি উপাদান চিহ্নিত করা যায়। একটি হলো আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং দ্বিতীয়টি হলো সংবাদপত্রের প্রকাশনা।[১১] উল্লেখ্য যে, এশিয়া মহাদেশে প্রথম সংবাদপত্র বাংলাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এসব অভিঘাত কিছুটা দেরিতে হলেও মুসলিম সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। ফলে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায়ও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়।[১২]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তনের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কারণে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা যায়। উনিশ শতকের সূচনা লগ্নেই

---

১১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭১।
১২. ঐ, পৃ. ২।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তন ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে এই বোধ চেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে প্রথমেই যার অবদান উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তিনি ছিলেন একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক এবং ব্রিটিশ রাজের ঘোর সমর্থক। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম (১৭৮৪-১৮৩২)-এর যুক্তিবাদী ও উপযোগবাদী মতবাদ দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সুবিধা আদায় করতে, যদিও প্রয়োজনে বৈষম্যমূলক আচরণে তাদের বিরোধিতা করতেও তিনি দ্বিধা-সংকোচ করেননি। উদারহণস্বরূপ ১৮২৩ সালে যখন বড়োলাট উলিয়াম এডাম একটি আইনের বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করেন তখন রামমোহন রায় ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের কাছে এর প্রতিবাদ করে আবেদন প্রেরণ করেন, এর প্রতিবাদে তিনি তাঁর ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র মিরাত-আল-আখবার-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।[১৩] ১৮২৩ সালের ভারতীয় জুরি আইনের বৈষম্যমূলক বিধির বিরুদ্ধেও রামমোহন রায় এবং এদেশের হিন্দু-মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এ সকল পদক্ষেপকে এদেশে জাতীয় চেতনা উন্মেষের প্রথম ধাপ বলা যায়।

লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্যকর করলে বাংলায় কিছুটা সামাজিক স্থিতিশীলতা আসে। তবে এর ফলে কিছু নতুন সমস্যাও দেখা যায়। মূলত এ ব্যবস্থা হয়েছিল জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮০৭ সালে বাংলার জমিদারগণ ভূম্যধীকারি সভা বা Zamindary Association of Bangal (Landholders Association নামে পরবর্তিতে পরিচিত) গঠন করেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দেশীয় জমিদারদের অসন্তুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এটি গঠিত হয়। উনিশ শতকে এদেশের উল্লিখিত বিত্তশালী সম্প্রদায়, যাঁদের অধিকাংশ ছিল জমিদার এবং পেশাদার। এঁরাই এদেশের জনমত নিয়ন্ত্রণ করত, যে জনমতের প্রতিফলন ঘটত বিভিন্ন সংবাদ ও সভা সমিতির মাধ্যমে। ভূম্যধীকারি সভা বা Zamindary Association of Bangal ছিল এমনই একটি সংগঠন। পরবর্তীতে এ সভার নাম পরিবর্তন করে ‘Bengal Landholders Society’ রাখা হয়। প্রথম জনসংস্থা হিসেবে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয়েছিল।[১৪] ১৮৪৩ সালে ‘British Indian Society’ নামে আরও একটি নতুন সমিতি গঠিত হয়েছিল, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারি চাকুরিতে অধিক সংখ্যক এদেশীয় লোক নিয়োগের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাছাড়াও এ সময় অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির সমালোচনা করা হয়। ফলে উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হতে থাকে, যা মুসলিমদের মধ্যে তখনও উদয় হয়নি।

---

১৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৪।

১৪. B. B. Majumdar, *Indian Political Association and Reform of Legislatures 1817-1917*, Calcutta, 1965, p- 23.

১৮৫১ সালে রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এদের মতো সংস্কারপন্থি হিন্দু নেতৃবৃন্দের দ্বারা গঠিত সংগঠনও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টিতে অনেক সহায়তা করেছিল। যদিও ১৮৫৯-এর পরে এখানে কিছু সংখ্যক মুসলমান দেখা যায়। ১৮৬৪ সালে মীর মোহাম্মদ আলি নামে ফরিদপুরের এক জমিদার এ সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেও এ সংস্থা কখনো মুসলমানদের জনমতকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।[১৫]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ইউরোপে নব নব চিন্তাধারা ও বিধিব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজ ইউরোপীয় নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন তখনো মুসলিম সমাজের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয়নি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রগতিমনস্ক নেতৃত্বের অভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চিন্তা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছিল সুন্নি আদর্শে বিশ্বাসী। ইতিহাসবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, উপনিবেশ শাসন পূর্বযুগে শিয়া মতাদর্শের অনুসারী নবাবদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনে সুন্নিদের অংশীদারিত্ব ক্রমশ হ্রাস করা হয়। নবাবগণ বহিরাগত শিয়া ও অবাঙালি মাড়োয়ারী হিন্দুদের সাহায্যে সরকার পরিচালনার নীতি গ্রহণ করায় বাঙালি মুসলমানরা ক্রমশ সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক সচেতনতাও হারিয়ে ফেলেন।[১৬] বাংলায় রাজপৃষ্ঠপোষকতায় যে বহিরাগত অবাঙালি মুসলিম অভিজাত শ্রেণি গড়ে ওঠেছিল, ইংরেজ শাসনের অভিঘাতে তাঁরাও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম সমাজের নেতৃত্বে এক ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় বাংলায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় ভাবধারাপুষ্ঠ যে নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা হয়, হিন্দু সমাজ এর মমার্থ উপলব্ধি করে এর সাথে যুক্ত হলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম সমাজ সে রাজনীতির ধারা আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হয়।

এক দিকে পুরনো অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয়, অন্যদিকে উনিশ শতকের নতুন বাস্তবতার উপযোগী নতুন নেতৃত্ব বিকশিত না হওয়ায় বাঙালি মুসলিম সমাজের এ শূন্যতা পূরণ করেন সাধারণ মানুষ থেকে উঠে আসা কতিপয় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এঁরা হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০খ্রি.), মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া (১৮১৯-৬২ খ্রি.) এবং মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.) প্রমুখ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে তাঁরাই নেতৃত্ব দেন। এদের মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের তিন পুরোধা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৯২ খ্রি.), শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-৬২ খ্রি.) এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.) প্রমুখের

---

১৫. Jayanti Maitra, *Muslim Politics in Bengal : Collaboration Confrontation (1885-1906)*, Calcutta, 1984, p- 73.

১৬. মুঈনুদ্দীন আহমেদ খান, "মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১, দ্বিতীয় খণ্ড)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৮।

ধর্মচিন্তা দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত ছিলেন। ফরিদপুরের এক সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহর। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন প্রবাহ অতিক্রান্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। মক্কায় সুদীর্ঘ সময় অবস্থান করে তিনি যে ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন দেশে ফিরে তা দিয়ে এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর সূচিত এ সংস্কার আন্দোলন " ফরায়েজি আন্দোলন" নামে পরিচিত।[১৭] শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনের কালসীমা ছিল ১৮১৮-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কার। মুসলিম সমাজ থেকে অনৈসলামিক কুসংস্কার দূর করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণ হাজী শরীয়তুল্লাহর সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল। ফরিদপুর জেলা থেকে এ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তবে অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল), ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলাসমূহে এবং আসাম প্রদেশে এ আন্দোলন বিস্তারলাভ করে। হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব ও মহৎ চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দুঃখ ও দুর্দশাকাতর বাঙালি মুসলমানরা তাঁর দলে যোগ দেন।

লক্ষণীয় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ ছিল না। তবে তিনি স্বজাতীয় মুসলমানদের কোম্পানি সরকারের সহযোগী ও দোসর নব্য জমিদারদের নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নব্য জমিদারগণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন বহু অতিরিক্ত আবওয়াব (অবৈধ কর) কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়।[১৮] হাজী শরীয়তুল্লাহ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং জমিদারদের এ সকল অবৈধ কর প্রদান না করার জন্য তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দেন। শুধু অত্যাচারী জমিদার নয়, ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন সম্পর্কেও হাজী শরীয়তুল্লাহর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। তিনি বাংলায় ব্রিটিশ শাসনকে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতেন। হাজী শরীয়তুল্লাহও এ দেশকে "দারুল হরব" বলে ঘোষণা করেন।[১৯] হানাফি আইনের অনুসরণে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বাংলায় যতদিন বৈধভাবে নিযুক্ত একজন মুসলিম শাসক দায়িত্ব গ্রহণ না করবেন অর্থাৎ এ দেশ "দারুল ইসলাম" না হবে, ততদিন এখানকার মুসলমানদের জুমআ ও ঈদের নামাজ পড়া সঙ্গত হবে না।

---

১৭. ফরায়েজি আন্দোলন সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য Muin-Ud-Din ahmed Khan, *History of the Faraidi Movement,* Pakistan Historical Society, Karachi, 1965.

১৮. ১৮৭২ সালে ফরিদপুরে কর্মরত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের এক তদন্তে প্রকাশ পায় যে, কৃষকদের উপর জমিদারদের আরোপিত এরূপ অবৈধ করের সংখ্যা ২৩ এর কম ছিল না। http://bn.banglapedia.org/index.php? title=□□□□□□□□□_□□□□□□□□

১৯ ব্রিটিশ ভারতকে প্রথম দারুল হরব হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন প্রখ্যাত আলেম শাহ আবদুল আজিজ রহ.। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবির (১৭০৩-৬২ খ্রি.) পুত্র। হাদিস শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুজাদ্দিদ বলে বিবেচিত শাহ আবদুল আজিজ ১৮০৫ সালে কোম্পানি সরকার কর্তৃক দিল্লি দখলের পর ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া দেন এবং এর আজাদীর জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের জন্য ফরজ বলে ঘোষণা করেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : John Kelsay, "Jihad", in *Islamic Political Thought: An Introduction*, ed. by Gerhard Bowering, Princeton University Press, 2015, pp. 86-104.

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে হাজী শরীয়তুল্লাহর এ মনোভাব এবং বিশেষ করে জমিদারদের অন্যায় আচরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান বাংলার জমিদারদের শঙ্কিত করে তোলে। শরীয়তুল্লাহর প্রচারিত সাম্যের মতাদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলার মুসলিম প্রজাসাধারণ এক মহাপরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করলে এ জমিদাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁরা নানা অজুহাতে শরীয়তুল্লাহর অনুসারীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন শুরু করে। কোম্পানি সরকারও তাঁদের সাথে যোগ দেয়। শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলাসহ নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ হয়রানি মোকাবিলা এবং তাঁর শিষ্যদের রক্ষার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ একটি নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[২০] তবে এ বিষয়ে কার্যকর অগ্রগতি অর্জনের পূর্বেই ১৮৪০ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন আরো ব্যাপক ও সংগঠিতরূপ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবদ্দশায় পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মুখ্যত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের প্ররোচনার কারণে দু'একটি সংঘর্ষ ব্যতীত কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনে কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়নি। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে আন্দোলনে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে হলেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গও যুক্ত হয়। শুধু ধর্মীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন নয়, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় খ্রিস্টান নীলকরদের নির্যাতনের হাত থেকে মুসলিম কৃষক প্রজাসাধারণকে রক্ষার জন্য দুদু মিয়া তাঁর সর্বশক্তি নিয়ুক্ত করেছিলেন। পিতার আর্থ-সামাজিক নীতি অনুসরণ করে দুদু মিয়া মানব কল্যাণে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দেন এবং শ্রমের ওপর জমির মালিকানা নিহিত এ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি অত্যাচারী জমিদারদের খাজনা প্রদান না করতে কৃষকদের উৎসাহিত করেন। দুদু মিয়ার এ ঘোষণা নির্যাতিত কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের কৃষকরা ফরায়েজি আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর চারপাশে ভিড় জমাতে থাকে। দুদু মিয়া তাঁর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি ফরায়েজিদের নেতৃত্বে সনাতন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (পঞ্চায়েত) পুনঃপ্রবর্তন করেন।[২১] দুদু মিয়ার তৎপরতায় ফরায়েজিগণ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে ওঠেন এবং অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেন। ফলে জমিদার ও নীলকরদের সাথে ফরায়েজিদের সংঘাত শুরু হয়।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বাধীন ফরায়েজি আন্দোলন নিজেদের স্বার্থ-পরিপন্থি হওয়ায় জমিদার ও নীলকররা এ আন্দোলনকে অকার্যকর করতে এক জোট হয়। ফরায়েজিদের উপর শুধু হামলা নয়, দুদু মিয়াসহ ফরায়েজি আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলাও করা হয়। ফলে তাঁদের উপর পুলিশী হয়রানি ও নির্যাতন নেমে আসে। এমনকি দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে মুসলিম শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।[২২] তবে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার প্রত্যক্ষ তৎপরতার তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালিত

---

২০. M A Rahim, *op.cit.*, p. 87.

২১. http://bn.banglapedia.org/index.php? title=ফরায়েজী_আন্দোলন|

২২. আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭।

হতো অত্যাচারী জমিদার, নীলকর ও তাঁদের সমর্থক-সহযোগীদের বিরুদ্ধে। আর জমিদার ও নীলকরদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল কোম্পানি সরকার। এ বিবেচনায় দুদু মিয়ার তৎপরতাকে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি সরাসরি কোম্পানি সরকার উৎখাত তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন এমনটা বলা যায় না। এতদসত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় সরকার দুদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। কারণ সরকারের আশঙ্কা হয় যে, তিনি এ বিদ্রোহে যোগ দিলে তা সরকারের জন্য বড় রকমের হুমকির কারণ হবে। তাঁকে আলিপুর জেলে বন্দি করে রাখা হয়। ১৮৬১ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৮৬২ সালে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গাজীউদ্দিন হায়দর (১৮৬২-৬৪ খ্রি.), আবদুল গফুর নয়া মিয়া (১৮৬৪-৮৩ খ্রি.) এবং সইদউদ্দিন আহমদ (১৮৮৩-১৯০৬ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের সময় এ আন্দোলনের গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে পড়ে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাঁর সমকালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী উত্তর ভারতে "তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া" নামক এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।[২৩] ব্রিটিশ সরকার ও তার সমর্থক ইতিহাসবিদগণ সৈয়দ আহমদ পরিচালিত এ আন্দোলনকে "ওয়াহাবি আন্দোলন" নামে আখ্যায়িত করেন। ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনটি শুরু হলেও পরে এটি জিহাদি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সৈয়দ আহমদ বেরলভী অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক এবং তাঁদের এদেশীয় দোসরদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে জিহাদের ডাক দেন। অনেকেই বাংলায় পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলনকে তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের সমার্থক বলে দাবি করেন। তবে এ মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিম সমাজে বিশুদ্ধ ধর্মীয় রীতিনীতির পুনঃপ্রবর্তন এ আন্দোলন দু'টির লক্ষ্য ছিল সত্য, তবে ফরায়েজিগণ ওয়াহাবিদের মতো বিপদজ্জনক জিহাদি রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন না। এদেশ থেকে কোম্পানি শাসন উৎখাতে তাঁদের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিও ছিল না। বস্তুত এটি ছিল জমিদার, নীলকর ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার কৃষকদের শ্রেণি সংগ্রাম।[২৪] অত্যাচারী জমিদার ও নীলকররা নিজেদের স্বার্থে ফরায়েজিদের একটি বিপদজ্জনক সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন পূর্ব বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন সে সময়ই পশ্চিম বাংলায় আরেকটি আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন মীর নিসার আলী তিতুমীর। পশ্চিম বাংলার বারাসত জেলার অধিবাসী কৃষক পরিবারের সন্তান তিতুমীর প্রথম জীবনে একজন মল্লযোদ্ধা ছিলেন। জীবনের এক পর্যায়ে মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি নিজ

---

২৩. এ আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Muin-Ud-Din Ahmad, *The Wahabi Movement in India,* Firma K. L. Mukhopadhyay, Delhi, 1966; আবদুল মওদুদ, *ওয়াহাবী আন্দোলন*, সপ্তম মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১১

২৪. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৩।

এলাকায় এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।[২৫] প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আন্দোলনেরও লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার। কিন্তু অচিরেই তাঁর কর্মপ্রয়াস বাংলার প্রজাকুলের উপর স্থানীয় জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ নিয়ে স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের সাথে তাঁর বিরোধ ও সংঘাত শুরু হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিতুমীর এক মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন এবং তাঁর অনুসারী ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুমকে এ বাহিনীর অধিনায়ক করা হয়। তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে জমিদারগণ তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোম্পানি সরকারকে সম্পৃক্ত করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারকেলবাড়িয়ায় এক দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর তিতুমীর নিজেকে “বাদশাহ” বলে ঘোষণা দেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদারদের নিকট রাজস্ব দাবি করেন। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বেই স্থানীয় জমিদারদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তিতুমীরের বিরুদ্ধে লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে কলকাতা থেকে এক ইংরেজ বাহিনী প্রেরণ করেন। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী মুজাহিদদের উপর আক্রমণ চালায় এবং সহজেই তাদের পরাজিত করে। ইংরেজদের কামানের গোলাবর্ষণে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বহুসংখ্যক অনুসারীসহ তিতুমীর এ যুদ্ধে শহীদ হন।[২৬]

কোম্পানি সরকারের কর্মকর্তা এবং হান্টারসহ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণের অনেকেই মনে করেন যে, তিতুমীরের আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আর এ উদ্দেশ্যটি হলো ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আজিজুর রহমান মল্লিক অবশ্য এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি এ আন্দোলনকে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন বলেই মনে করেন।[২৭] সুপ্রকাশ রায়সহ ভারতীয় অনেক মার্ক্সীয় ইতিহাসবিদ তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত কৃষকশ্রেণির সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেন।[২৮] সন্দেহ নেই তিতুমীরের আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য তাই ছিল। তবে পরবর্তীতে এ আন্দোলন রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে এবং মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়রোধ প্রয়াসের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধ তৎপরতায় পর্যবসিত হয়।[২৯]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উপর্যুক্ত দুটি আন্দোলন ছাড়াও বাংলায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী পরিচালিত তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের প্রভাবে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি আন্দোলনও পরিচালিত হয়। শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ

---

২৫. তিতুমীরের আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: Muin-Ud-Din Ahmed Khan, *Titu Mir and His Followers in British Indian records, Barnamicil,* Dhaka, 1977.

২৬. আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮-১০০।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

২৮. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩।

২৯. মুঈনুদ্দীন আহমেদ খান, “*মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন*”, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৭।

বেরলভী ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরে তিনি ধর্ম রক্ষা ও ন্যায়ের জন্য মুসলমানদের ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৩০] হজ্ব করতে মক্কায় গমনকালে সৈয়দ আহমদ কলকাতায় আসলে বাংলার বহু মুসলমান তাঁর কাছে দীক্ষা নেন এবং তাঁর জিহাদি তৎপরতায় যুক্ত হন। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শিষ্য মৌলবী এনায়েত আলীর পাটনায় অবস্থিত খানকাহ বাংলার জিহাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। বাংলাদেশ ও বিহার হতে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ করে পাটনা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুদূর পাঞ্জাব অঞ্চলে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা হতো। ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদের শাহাদত বরণের পরও বাংলায় জিহাদিদের তৎপরতা কিছু পরিমাণে অব্যাহত ছিল।[৩১]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারাপুষ্ট আধুনিক রাজনৈতিক কর্মধারা অনুপস্থিত ছিল। এ সময় তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মূলত ধর্মভিত্তিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এসময় মুসলমানদের পরিচালিত আন্দোলনগুলো ছিল বিশেষভাবে আঞ্চলিক, সম্প্রদায়গত ও পেশাভিত্তিক। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সমাজ। তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনগুলোর মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আকুতি ছিল প্রধান। তবে এতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি যুক্ত হওয়ায় এসব আন্দোলন মিশ্ররূপ ধারণ করে। এসব আন্দোলনে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ প্রয়াস মুখ্য হওয়ায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্যান ইসলামিজমের ধারণার বীজ বপিত হয়। ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তাতে জিহাদি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির উৎখাত করাকে তাঁদের কেউ কেউ ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তবে উত্তর ভারতের মতো বাংলায় জিহাদি প্রবণতা এতটা প্রকট ছিল না। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতাকে যাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য বলে এ ধারায় মুসলমান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের এ চিন্তা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত ছিল বলে মানা যায় না। কারণ ভারতে কোম্পানি সরকার তখন একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি। এ শক্তিকে বল প্রয়োগে বিতাড়িত করার সামর্থ তখন এদেশীয় মুসলমানদের ছিল না। তাই তাদের উচিত ছিল ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাসমূহ গ্রহণ করে প্রথমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা এবং এরপর নিজেদের সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু তাঁরা এটি করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত এ সময় যাঁরা মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেন যুগ বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। চিন্তাধারায় তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল এবং অনেকাংশে পশ্চাদমুখী। তাঁরা অতীতের গৌরবময় স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তাই ভবিষ্যতের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ সম্প্রদ্রায়ের জন্য উপযোগী করণীয় নির্ধারণে তাঁরা ব্যর্থ হন। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে নতুন আদর্শ, ভাবধারা ও জীবনবোধের জন্ম হয়েছিল, কোম্পানি

৩০. I H Qureshi, *Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent 610-1947*, The Hague, 1952, p. 198.
৩১. M A Rahim, *op.cit.*, p. 96-104

শাসনের সূত্র ধরে উনিশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় এর আগমন ঘটে। কিন্তু বাংলার মুসলিম সমাজে নেতারা এর মর্মার্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় এটি গ্রহণ না করে নিজেদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়ে থাকেন। ফলে এর দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি বিধানে তাঁরা ব্যর্থ হন। তবে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের নেতাগণ এদেশে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের মনে অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, এর ফল হিসেবে এদেশে সাধারণ মানুষ কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে লড়াই সংগ্রামে প্রেরণা পেয়েছে। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৮৫৯-৬০ সালে পরিচালিত নীল বিদ্রোহ এবং ১৮৭২-৭৩ সালে পরিচালিত পাবনার কৃষক বিদ্রোহে।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম সমাজ যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তাঁদের করণীয় নির্ধারণে অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও হিন্দু সমাজে তা হয়নি। তাঁরা ব্রিটিশদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শুরু থেকে তৎপর ছিল। এজন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে তাদের উৎখাতের জন্য যখন জিহাদি তৎপরতায় লিপ্ত, তখন হিন্দুরা ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। কোম্পানি সরকার প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রি.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এ তৎপরতা দেখা যায়। স্বসমাজের প্রতি ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদ তাঁরা করেছেন, তবে তা কোনো সোচ্চার প্রতিবাদ বা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই তাঁরা বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'Zamindary Association of Bengal' (বাংলার ভূম্যধিকারী সভা) ছিল এরূপ একটি সংগঠন। পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'Bengal Landholders Society'। এটি ছিল প্রথম জনসংস্থা যেটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয়েছিল।[৩২] ১৮৫১ সালে 'British Indian Association' নামে আর একটি নতুন সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের সনদ আইনকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় হয়ে উঠে। নতুন সনদ প্রাপ্তিকে সামনে রেখে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগগুলোর প্রতি ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আশু ফল লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এসব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকাসহ কিছু সংবাদ মাধ্যমের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম সমাজে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়নি।

---

৩২. B.B. Majumdar, *Indian Political Association and Reform of Legislatures 1817-1917*, Calcutta, 1965, p. 23.

৩.গ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ: বাংলার মুসলিম রাজনীতির রূপান্তর

ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহাম্মদী বা তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলিম মানসে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বা মহাবিদ্রোহ[৩৩] একে আরো প্রবল করে তোলে। ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় এটি ছিল এক বিরাট প্রতিরোধ সংগ্রাম বা গণ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের উপক্রম হয়। কিন্তু নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ সফল হয়নি। সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে এ বিদ্রোহ দমন করে। এ বিদ্রোহের সূত্র ধরে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হয় এবং ব্রিটিশ রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহের পরবর্তী সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজ অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ দুঃসময়ে পতিত হয়। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় যোগদান করলেও সরকার এর জন্য মুখ্যত মুসলমানদের দায়ী করে। সরকার বিদ্রোহের সার্বিক দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে তাদের উপর নানা ধরনের উৎপীড়ন ও চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে থাকে। এমনিতেই ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অধিকতর দুর্দশার কারণ হয়েছিল; নবতর পরিস্থিতিতে এ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও তৎপরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের উপর সরকারি আক্রোশ ইত্যাদির ফলে মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ নেতৃত্ব ছিল নগরবাসী ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভকারী উদার মনোভাবাপন্ন। উপরে বর্ণিত মুসলিম সমাজের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তির উৎখাত কোনোভাবেই মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, এতদিন মুসলিম সমাজের যে অংশটি জিহাদের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের স্বপ্নে বিভোর ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে তাঁদের সে স্বপ্নেরও সমাধি রচিত হয়েছিল। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের নতুন নেতৃত্ব জিহাদি তৎপরতা পরিহার করে নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা ব্রিটিশ মানস থেকে মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অনাস্থা ও সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণে প্রয়াসী হন। আর ব্রিটিশ সরকারও নতুন অনুগত মুসলমান নেতাদের সহযোগিতার মনোভাবকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।[৩৪] এভাবেই সিপাহী বিপ্লব পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক চিন্তনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

---

৩৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উৎস ও ঘটনাবলির বিবেচনায় কারও মতে এটি ছিল নিছক একটি সিপাহী বিদ্রোহ, কারও মতে জাতীয় সংগ্রাম এবং কেউ কেউ একে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : R C Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, Calcutta, 1957; রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী বিদ্রোহ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

৩৪. ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩১।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত বাস্তবতায় যে সব মুসলিম নেতা মুসলমান সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে প্রয়াস নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন– মৌলভী আবদুর রউফ, নবাব আবদুল লতিফ (১৯২৮-৯৩ খ্রি.), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮খ্রি.) প্রমুখ। তাঁরা সকলেই ছিলেন নব্য শিক্ষিত পেশাজীবী এবং আধুনিক নাগরিক সমাজ থেকে আগত। প্রগতিশীল মুক্ত ও সম্প্রসারিত চিন্তায় পরিপুষ্ট। নব্য ধারার এ নেতৃত্বই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজের আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে এর রাজনৈতিক চিন্তনের যথার্থ উন্মেষের সহায়তা করেন।[৩৫] এঁরা ব্রিটিশ রাজের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। কারণ তাঁরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনে অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে বাংলার মুসলমানরা আর্থ-সমাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। মুসলিম চিন্তকগণ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, এতে তাদের লাভের তুলনায় ক্ষতি হয়েছে বেশি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত বাস্তবতায় বাঙালি মুসলিম সমাজের নব্য নেতৃত্ব মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে হিন্দু সমাজের মতো তাঁরাও মুসলমানদের জন্য আধুনিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। এক্ষেত্রে যিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন, তিনি হলেন মৌলভী আবদুর রউফ। মৌলভী আবদুর রউফ ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার আরবির অধ্যাপক এবং *দূরবীন* পত্রিকার সম্পাদক। প্রধানত তাঁর উদ্যোগ এবং কলকাতা আদালতের কাজী-উল-কুজ্জত ফজলুর রহমান ও মুহম্মদ মাজহার প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী মুসলিম নেতার প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালের ৮ মে কলকাতায় আঞ্জুমান-ই-ইসলামি নামে একটি সংগঠন প্রতিাষ্ঠত হয়। এটি ছিল মুসলমানদের তৈরি প্রথম সংগঠন। এর আগে মুসলমানদের অনুরূপ কোনো সংগঠন ছিল না। তবে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'British Indian Association' এ কয়েকজন মুসলিম নেতা সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। এদের মধ্যে ফরিদপুরে একজন বিশিষ্ট জমিদার মীর মুহাম্মদ আলী এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতির পদ লাভ করেছিলেন।[৩৬] অবশ্য এ সংগঠনের কর্মসূচিতে মুসলিম স্বার্থ ও জনমতের প্রতিফলন না থাকায় এর প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ হ্রাস পায়। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে আঞ্জুমান-ই-ইসলামি নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি এর একটি 'কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠন করা হয়:

সভাপতি : কাজী ফজলুর রহমান, খান বাহাদুর, কাজী-উল-কুজ্জাত

সহ-সভাপতি : কাজী আবদুল বারী, কলিকাতা সদর আদালত

সম্পাদক : মোহাম্মদ মজহার ও মোহাম্মদ আবদুর রউফ।

---

৩৫. মুহম্মদ কাসেম উদ্দিন মোল্লা, 'মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা', *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৭, চতুর্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩।

৩৬. আ ফ সালাহউদ্দীন আহ্মদ, "উনিশ শতকে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, পৃ. ২৭৭।

সদস্য : মোহাম্মদ ওয়াজিহ্, আবদুস সামাদ, আবদুল লতিফ খান, আবদুল জব্বার, ফজলুল করিম, গোলাম ইসহাক, রহমত আলী, আহমদ, জোওয়াদ, আবদুল হামিদ ও গোলাম ইয়াহিয়া।[৩৭]

ভারতের মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বিধান ও তাদের কল্যাণ সাধন করা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও মুসলমান প্রজার মধ্যে সংহতি গড়ে তোলা, ইসলাম ধর্মের উৎকর্ষ সাধন ও প্রচারে সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। মুসলিম সমাজ তাদের দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের কাছে বিধিসম্মত উপায়ে আবেদন করবে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবে এটি ছিল এ সংগঠনের মূল নীতি।[৩৮] সংগঠনটির মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক ফারসি পত্রিকা *দূরবীন*। এটি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে মুসলিম জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিল। আঞ্জুমানের প্রতি জনগণের সমর্থন আছে, এই মর্মে মত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র বিলি করার এবং গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩৯]

আঞ্জুমান-ই-ইসলামের জন্মের ২৩ দিন পরে 'সোম প্রকাশে' (২৯ মে, ১৮৫৫) 'মুসলমানের সভা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা হয়:

> নগরবাসী সদ্বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিত বর্দ্ধনার্থে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা ইংরাজি পত্রে পাঠ করিয়া যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। ইংরাজ ও বাঙালির মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের উপকার হইতেছে ও ইংরাজ জাতির সহিত হিন্দু জাতির সদ্ভাবের ক্রমশ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দু মণ্ডলীর মধ্যে একতা বন্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে; কিন্তু কি পরিতাপ! যবন জাতির মধ্যে একাল পর্যন্ত কোন প্রকার সভা স্থাপিত হয় নাই, গবর্নমেন্ট যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, তাঁহাদিগের কার্যবিষয়ে যবনজাতি কোন কথাই উল্লেখ করেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভারতবর্ষবাসি যবনগণকে অসভ্য বলেন। -এদেশে অল্প যবন বাস করে না, কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অধিক, অতএব তাহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশ্যে কোন প্রকার সভা না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম; অধুনা নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান যবনেরা আমাদিগের সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন। এইক্ষণে আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই নবীন সভা চিরস্থায়ী হউক এবং নগরীয় ও অন্যান্য স্থানের যবনগণে তাহার প্রতি বিহিত সাহায্য ও উৎসাহে প্রদানপূর্বক স্বজাতির সম্মান বৃদ্ধি করুন।[৪০]

---

৩৭ দূরবীন (ফারসি সাপ্তাহিক) ৪ ও ৭ মে, ১৮৫৫ কলিকাতা। কাজী আবদুল বারি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা সদও আদালতে ১৮২৭ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত কাজী পদে রত ছিলেন। মোহাম্মদ মজহার মুসলমান আইন-অফিসার ছিলেন। মোহাম্মদ ওয়াজিহ ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান আরবি অধ্যাপক। মোহাম্মদ আবদুর রউফ ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনা বিভাগের 'প্রথম অনুবাদক' ছিলেন। আহমদ (পরবর্তী নাম : দেলওয়ার হোসেন আহমদ) হুগলীর অধিবাসী ছিলেন, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট (১৮৬২)। গোলাম ইয়াহিয়া বীরভূমের প্রধান সদও আমীন (১৮৪৩-৫৫) ছিলেন। *Selection from the Records of the Govt. of India,* Home Dept. Calcutta, 1886, PP, 23, 49,74.

৩৮. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৩৮।

৩৯. দূরবীন, *পূর্বোক্ত*।

৪০. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড)*, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৭৭৫।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটি বিশেষ ঘটনা মুসলমানদের আঞ্জুমান-ই-ইসলাম বা Mohammadan Association গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। স্মর্তব্য যে, ১৮৫৩ সাল ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনদ লাভের বছর। কলিকাতার 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ১৮৫৩ সালে এক সভার প্রস্তাবের মাধ্যমে আইন ও শাসন সংক্রান্ত দাবি-দাওয়ার একটি আবেদনপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদান করেন। ঐ আবেদনপত্রে ভারতবর্ষের জন্য একটি স্বতন্ত্র 'বিধান পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব ছিল; পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবে বলে দাবি করা হয়। স্যার হ্যালিডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এই বলে যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য আছে, সুতরাং উপযুক্ত ভারতীয় নেতা থাকলেও কোন একজন ব্যক্তিকে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি মনোনীত করা কঠিন হবে। লর্ড এলেনবরা হ্যালিডের মত সমর্থন করেন এবং আইন প্রণয়নের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের দুটি পৃথক পরামর্শ-সমিতি গঠন করার প্রস্তাব দেন। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'কে ভারতের মুসলমানরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করতেন না; তাঁরা হ্যালিডের মতের পোষকতা করে নিজেদের উপযোগী 'মহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, কলিকাতার 'মহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপনের প্রকৃত পটভূমি ছিল এটাই। সুতরাং বলা যায় যে, আঞ্জুমান-ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, যদিও উদ্যোক্তরা একে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করেছেন।[৪১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আঞ্জুমান-ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন মুসলিম সমাজের অভিজাত শ্রেণিভুক্ত। ব্রিটিশ রাজের সাথে তাঁদের এক রকমের সখ্যতা ছিল এবং এ কারণে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রতিও সরকারের এক রকমের আর্শীবাদ ছিল। আর এ জন্যই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'র মত আঞ্জুমান-ই-ইসলামও ব্রিটিশ রাজের ব্রিরোদ্ধে ভারতীয়দের পরিচালিত সিপাহী বিদ্রোহকে (জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কাছে যা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে পরিচিত) সমর্থন করেনি, বরং উভয় প্রতিষ্ঠানই পৃথক পৃথক সভা করে এর নিন্দা করে। সিপাহী বিদ্রোহ দমনকার্য শেষ হলে 'আঞ্জুমান-ই ইসলাম' ১৮৫৮ সালের ১৪ নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়াকে 'অভিনন্দনবাণী' প্রেরণ করেছিল।[৪২]

ভারতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্জুমান-ই-ইসলামের কয়েকটি শাখা ছিল। তবে ১৮৬৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এ সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে, মহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আবদুল লতিফও আঞ্জুমানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

---

৪১. *দূরবীন*, ২১ মে ১৮৫৫।

৪২. *Indian Political Associations and Reform of Legislature,* p- 221.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)।[৪৩] ফরিদপুরে জন্মগ্রহণকারী নবাব আবদুল লতিফের পিতা কলকাতা সদর দিওয়ানি আদালতের আইনজীবী কাজি ফকির মাহমুদ নিজেকে প্রাচীন অভিজাত বংশীয় বলে দাবি করতেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর পূর্ব পুরুষগণ মক্কা থেকে এসেছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ফকির মাহমুদ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে নতুন পরিস্থিতিতে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর পুত্র আবদুল লতিফকে মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যানুসারে মাদ্রাসায় ভর্তি করালেও আরবি, ফারসি ও উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। আবদুল লতিফ তাঁর কর্মজীবনে প্রথমে দমদমে বসবাসরত এক সিন্ধী আমিরের ব্যক্তিগত সচিবের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে কিছুদিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং কলকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো-অ্যারাবিক বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে চাকুরি করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৩ সালে তিনি বিশেষ পেনশনের সুবিধা নিয়ে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ১৮৬২ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। সে সময় থেকেই তিনি বাংলার মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি ও নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮৮০ সালে মুসলিম সমাজের জাগরণ ও উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য সরকার তাঁকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।[৪৪] মুসলিম নেতারূপে তাঁর খ্যাতি শুধু বাংলায় নয়, বরং একজন সর্বভারতীয় মুসলিম নেতা হিসেবেও তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা অবস্থায় আবদুল লতিফ বিভিন্ন মফস্বলে ঘুরে বেড়াতেন এবং তিনি চাকুরিরত অবস্থায় কৃষকদের উপর ইংরেজ নীলকরদের জোর জুলুম বন্ধ করার চেষ্টা করেন। ১৮৬০ সালে নীলকরদের অত্যাচার অনুসন্ধানে ইন্ডিগো কমশিন গঠনের পিছনে নবাব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। বাংলার মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আবদুল লতিফের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন যে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থতা, ইংরেজি শিক্ষা বর্জন এবং সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতির কারণে মুসলমান জাতি সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তিনি মুসলিমদের শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতিকল্পে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এসব উদ্যোগের মধ্যে ছিল ব্রিটিশদের নতুন শাসন পদ্ধতির সুফল ভোগ করার জন্য মুসলিমদেরকে প্রস্তুত করা; ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি তাদের মধ্যে আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি করা এবং এভাবে মুসলিমদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা।

১৮৬৩ সালে এপ্রিল মাসে নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে “Mohamedan Literary and Society” নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এটি ছিল

---

৪৩. নবাব আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে Enamul Haque সম্পাদিত *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, Dacca,1968. এবং M Mohar Ali, *Autobiography and other Writings of of Nawab Abdul Latif Khan Bahadur,* Chittagong, 1968. আবু জাফর শামসুদ্দীন (অনু.), নওয়াব বাহাদুর মৌলভী আব্দুল লতিফ খান, সি. আই. ই., *মুসলিম বাঙ্গালা : আমার যুগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, ইত্যাদি গ্রন্থে।

৪৪. সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫।

বাংলার মুসলমানদের সবচেয়ে কার্যকরী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এটি দীর্ঘদিন মুসলমানদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন এই সংগঠনের সেক্রেটারি।[৪৫] সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে নতুন জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বিতরণ করা, মুসলিম চিন্তাধারা ও মূল্যবোধে নতুন চেতনা জাগ্রত করাই সমিতির যাবতীয় কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য ছিল।[৪৬]

আবদুল লতিফ ইংরেজদের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। যদিও তিনি ধর্মীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন, তথাপি যখন ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহাম্মদিরা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হারব' ঘোষণা করেছিল এবং দেশকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেন তখন তিনি মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীকে সাথে নিয়ে এর বিরোধিতা করেন এবং ব্রিটিশদের পক্ষে জনমত গঠনে চেষ্টা চালান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষিত মুসলিমগণ সরকারের উদ্দেশ্য, শক্তি ও কৌশল বুঝতে পারলে তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি শাসকশ্রেণির সঙ্গে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ পরিহার করার পক্ষে ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে সরকার বিরোধী তৎপরতা ত্যাগ করে সরকারের প্রতি অনুগত থেকে রাজকৃপায় নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তরিকায়ে মুহাম্মদী ও ফরায়েজিরা ব্রিটিশ ভারতকে 'দারুল হারব' ঘোষণা দিয়ে মুসলিমদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। নবাব আবদুল লতিফ এ রাজনৈতিক তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এটি যে ভুল ধারণা তা প্রমাণের জন্য মক্কার প্রধান মুফতিসহ সে সময়কার প্রখ্যাত কয়েকজন আলেমের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁর আমন্ত্রণে জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী ১৮৭০ সালের ৩০ নভেম্বর কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমিতির (Mohamedan Literary Society) এক সভায় জোরালো কণ্ঠে বলেন যে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ "দার-উল-হারব" নয়, বরং "দার-উল-ইসলাম"। যেহেতু ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজ নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারছে, তাই ভারতকে 'দারুল হরব' বলে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা মুসলমানদের জন্য ন্যায় বিরুদ্ধ ও ধর্মদ্রোহিতার শামিল বলে তিনি ঘোষণা দেন। আবদুল লতিফ নিজেও এ সভায় বক্তৃতা করেন এবং ওয়াহাবিদের জিহাদি তৎপরতার সমালোচনা করেন।[৪৭] এভাবে তিনি উনিশ শতকের মুসলিমদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন।

---

৪৫. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ রহিমুদ্দীন এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা জাহান কাদের বাহাদুর ও মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ নাসিরুদ্দীন হায়দার। কমিটির মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা আসমান জাহ বাহাদুর ও প্রিন্স মুহম্মদ জাহ আলী বাহাদুর এবং মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ হরমুজ শাহ ও প্রিন্স মুহম্মদ বখতিয়ার শাহ। বাংলার ছোটলাটকে সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক করা হয়েছিল।

৪৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন (অনূদিত), নওয়াব বাহাদুর মৌলভী আবদুললতিফ খান, সি. আই. ই, *মুসলিম বাঙ্গালা: আমার যুগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৭।

৪৭. *Abstract of the Proceedings of the Mohamedan Literary Society of Calcutta* held at the residence of Moulvi Abdu Latif Khan Bahadur on Wednesday the 23rd November 1870, Enamul Haque (ed.), *op.cit.* p. 102.

বাংলার মুসলমান সমাজের জাগরণে নবাব আবদুল লতিফের অবদান অনস্বীকার্য। তবে এ অবদান স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা প্রয়োজন যে, তাঁর চিন্তাধারায় কিছু স্ব-বিরোধীতা ছিল। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনে উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের উদার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা প্রচলনের ঘোর বিরোধীও ছিলেন । পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা লাভ ও পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনকারীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজ ও রাজনীতির সংশ্রব ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। বাঙালি মুসলিম মুসলিম তরুণ সমাজও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা লাভ করার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হচ্ছিল। নবাব আবদুল লতিফ তা বেশি পছন্দ করতেন না। এমনকি আবদুল লতিফ তাঁর সমকালীন সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) মতো উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিশীল মুসলিম নেতাদেরও তীব্র সমালোচনা করতেন একথা বলে যে, এঁরা বিলেতি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে ও বিলেতি কায়দা-কানুন অনুসরণ করে এবং নিজেদের সংস্কারপন্থী বলে প্রচার করে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।[৪৮]

নবাব আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত হলে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করবে। ভারতীয় রাজনৈতিক ও আর্থ-সমাজিক বাস্তবতায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী হবে বলে তিনি মনে করতেন। তাই নবাব আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিযুক্ত রেখে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তবে এ কথাও সত্য যে, তিনি মুসলিম সমাজে রাজনীতির বিস্তার পছন্দ না করলেও তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। আর এ আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরবর্তীতে তারা রাজনৈতিকভাবেও সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে এ কথা বলা যায় যে, নবাব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টা পরোক্ষভাবে বাংলার মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষেও ভূমিকা রেখেছিল।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদের রাজনৈতিক সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। ১৮১৭ সালের ১৭ অক্টোবর দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুত্তাকী খান,[৪৯] মাতার নাম ছিল আজিজ-উন-নেছা এবং দাদার নাম সৈয়দ হাদী। তাঁর জীবনী লেখক কর্নেল গ্রাহামের মতে, স্যার সৈয়দ আহমদ খান হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত ঈমাম হোসাইনের বংশধর। তিনি উক্ত বংশের ৩৬তম ব্যক্তি বলেও জানা যায়।[৫০] ১৯ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিতে সেরেস্তাদারের চাকুরিতে যোগদান করেন এবং

---

৪৮. W. S. Blunt, *India Under Ripon*, London, 1909, p- 97.

৪৯. ইসলামী বিশ্বকোষসহ কিছু গ্রন্থে মীর তাকী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২০১।

৫০. G. F. I. Graham, *Life & Works of Sayed Ahmed Khan*, London, 1885, p- 19-20.

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ফতেহপুর সিক্রির মুন্সেফ পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে চাকুরি হতে অবসর নিয়ে আলীগড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা কমিশনের এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কে.সি.এস.আই. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এলএল.বি. ডিগ্রি প্রদান করেন। শিক্ষা ও রাজনীতিতে বহুমুখী অবদান রাখার পর ২৭ মার্চ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মক্ষেত্র ছিল প্রধানত উত্তর ভারত। তবে বাংলার মুসলিম সমাজের উপরও তার চিন্তাধারা ও কর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আর এ কারণেই এ পর্যায়ে তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ইংরেজরা মুসলমানদের দায়ী করে মুসলমানদের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার চালাতে থাকে। মুসলমানদের এ বিপর্যয় দেখে সৈয়দ আহমদ খান এ থেকে তাদের উত্তরণের চেষ্টা করেন। মূলত সিপাহী বিপ্লবই স্যার সৈয়দ আহমেদের চিন্তার রূপান্তর ঘটায়।[৫১]

মুসলমানদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল বলে মুসলমানদের তারা সবসময় ভীতি ও সন্দেহের চোখে দেখত। অন্যদিকে মুসলমানরাও নিজেদের শাসক জাতি মনে করে সর্বদা ইংরেজ বিরোধী মনোভাব পোষণ করত। ইংরেজি পত্রিকাগুলোতে প্রতিদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁদের সম্মান ও অবস্থান শূন্যে নেমে আসে।[৫২] এ অবস্থায় সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ ভক্ত হয়েও মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তাঁর কর্ম প্রয়াসের মূল কথা ছিল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অগ্রগামী করে তোলা, সরকারি চাকুরিতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার লাভের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের সাথে মোকাবেলা করে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা অর্জন করা। তিনি মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব পরিহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ইংরেজ সরকার প্রদত্ত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে তিনি ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সৌহার্দ্য স্থাপন করা কে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তিনি নিজে রাজভক্ত ছিলেন এবং ইংরেজদের প্রতি এক রকমের তোষণ নীতি গ্রহণ করেন।

---

৫১. M. M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy*, Vol. II, Wiesbaden, 1963, p- 1598.
৫২. Mr. Abdur Rafay Khan, *Sir Sayyid Ahmed Khan's political Ideas and Activities*, in the proceedings of the Pakistan History Conference (second session), Pakistan Historical Society, Lahore, 1952, p- 255.

সিপাহী বিদ্রোহের ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের দায়ী করলে তিনি তাদের এ মনোভাব পরিবর্তনের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এতদদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন *আসবাব-এ-বাঘাওয়াত-এ-হিন্দ* নামক একটি গ্রন্থ। এটি পরে *'On the Causes of the Indian Revolt'* নামে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি সিপাহী বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করে এটিকে ভারতীয় জনগণের জাতিগত ভুল বোঝাবুঝি ও প্রশাসনিক মারাত্মক ভুলের ফসল বলে উল্লেখ করেন।[৫৩] তাঁর মতে বিদেশি শাসকের প্রতি স্বদেশি জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে এ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া তিনি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের ভুল ধারণা দূর করার জন্য ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে *The Loyal Mohammadans of India* নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। এ দু'টি গ্রন্থে তিনি ইংরেজদের মন থেকে মুসলিম বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা চালান। তিনি এ সময় ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন যে, অনতিবিলম্বে ভারতীয় আইন সভায় দেশীয় প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীতে তার অনুরোধে ভারতীয় সাংবিধানিক আইনের (১৮৬১ এবং ১৮৯২ সাল) মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে আইন সভার সদস্য মনোনীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৫৪]

সৈয়দ আহমদ খান ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ সময় অ্যাংলো মুসলিম সম্পর্কের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। এমতাবস্থায় উইলিয়াম হান্টার কর্তৃক *Our Indian Musalmans* গ্রন্থটি রচিত হলে ব্রিটিশরা ওহাবীদের ব্রিটিশ রাজত্বের জন্য হুমকি বলে চিহ্নিত করেন। মুসলমানদের এ সংকটপূর্ণ অবস্থায় স্যার সৈয়দ 'Review on W.W. Hunter's Indians Muslmans' নামক লেখনী প্রকাশ করে হান্টারের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার প্রচেষ্টা করেন। তিনি আরও বলেন যে, ইসলাম মোটেও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের শিক্ষা দেয় না এবং তিনি এ মর্মে ইংরেজদের আশ্বস্ত করেন যে, ওহাবীরা খাঁটি মুসলমান এবং একনিষ্ঠ সংস্কারক। তাঁরা ব্রিটিশ রাজত্বের অনুগত নাগরিক।[৫৫]

সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করেই থেমে যাননি, বরং তিনি মুসলমানদেরকেও ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানান। তিনি *Tahzib-al-Akhlaq* পত্রিকায় তাঁর মত প্রচার করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কিছুটা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনই ভারতের জন্য উত্তম। তাছাড়া তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালান। তিনি এ উদ্দেশ্যে বলেন, "... if united, we could support each other, if not, then the effect of one community arraying it self against the other would tend to the distruction

---

৫৩. M. M.Sharif, *op.cit.*, p- 1580.

৫৪. আ. ফ. সালাহউদ্দীন আহমদ, 'উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৮১।

৫৫. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৬৩।

of both."[৫৬] তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য শিক্ষার দ্বার খোলা রেখে হিন্দু-মুসলিম তথা সর্বভারতীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, যদিও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তাঁর চিন্তার রূপান্তর ঘটতে থাকে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চিন্তক ও উদারমনা সংস্কারক।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের চেতনায় ছিল মুসলমানদের উন্নয়ন। তিনি একজন বিজ্ঞ রাষ্ট্র চিন্তাবিদ। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সাথে সাথে মুসলমানরা যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হন তাহলে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারবে না এবং সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব ছিল, উচ্চ শিক্ষার অভাব ছিল, তদুপরি ছিল অর্থের অভাব।[৫৭] আর তাই তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্প্রসারণের চেষ্টা স্বরূপ গাজীপুরে একটি 'ট্রান্সলেশসন সোসাইটি' গঠন করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানসম্পদের সাথে মুসলমানদের দ্রুত পরিচিত করার জন্য ইংরেজি বই উর্দুতে তর্জমা করাই ছিল এ সমিতির লক্ষ্য। নবাব আবদুল লতিফের মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির অনুকরণেই এ সমিতি গঠন করা হয়। ১৮৭৫ সালে সৈয়দ আহমদ খান আলীগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের উচ্চস্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তার করা। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানেই পাক-ভারতীয় মুসলমানদের আত্মচেতনা তথা জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়।[৫৮]

সৈয়দ আহমদ খান ও নবাব আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও জাগরণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারকে মুখ্য নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে এর প্রসারে কাজ করেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণের অনুকূলে তাঁদের দৃশ্যমান প্রচেষ্টা না থাকলেও তাঁদের কর্মপ্রয়াস প্রকারান্তরে মুসলিম সমাজকে রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করেছিল।

বাংলার মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের আন্দোলেনে সৈয়দ আমীর আলী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।[৫৯] লন্ডন থেকে আইন বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রিধারী আমীর আলী ছিলেন এক বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইনশাস্ত্রে তাঁর দখল ছিল অগাধ। এ কারণেই তিনি প্রিভি কাউন্সিলে নিযুক্ত প্রথম

---

৫৬. *The Moslem Chronicle*, Calcutta, June 4, 1896.

৫৭. Muin-Ud-Din Ahmed Khan, *Muslim straggle for freedom in Bengal*, Dacca, 1963, p. 95.

৫৮. মুহম্মদ কাসেম উদ্দিন মোল্লা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪।

৫৯. সৈয়দ আমীর আলীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো– K K Aziz সম্পাদিত *Ameer Ali: His Life and Works*, Lahore, 1968. এ গ্রন্থটি *সৈয়দ আমীর আলী: জীবন ও কর্ম* (আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৮)-এ শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মাদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী।

ভারতীয় হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন।[৬০] তিনি প্রথমে 'Bengal legislative Council'-এর সদস্য এবং পরে 'Imperial legislative Council'-এর মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Tagore Professor of Law' হন। ১৮৯০ সালে কলকাতা হাইকোর্টের জজ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সুদীর্ঘ ১৪ বছর ঐ পদে বহাল থেকে ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করে ইংল্যান্ডে চলে যান।

সৈয়দ আমীর আলী শুধু উচ্চপদস্থ একজন রাজ কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন তা নয়, তাঁর খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর মননশীলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রখর পান্ডিত্য। মুসলিম সমাজকে তিনি এক নতুন ধরনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬১] ইসলামের ইতিহাসের উপর তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দু'টি গ্রন্থ লিখে। এ গ্রন্থ দু'টির একটি 'The Spirit of Islam' ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় 'A short History of the Saracens.'[৬২] আমীর আলী, সৈয়দ আহমদ খানের মতো ইসলামকে উনিশ শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে পুনর্মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।[৬৩] তাঁর মতে, প্রাচীনপন্থি আলেমরা তাঁদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে কুরআনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেভাবেই মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাঁর ভাষায়,

> Enlightenment must precede reform, and there can be a renovation of religious life, the mind must first escape from the bondage which centuries of literal interpretation and doctrine of 'Confarmity' have imposed upon it. The formalism that does not appeal to the heart of the worshipper must be abandoned; external must be subordinated to inner feelings.[৬৪]

আমীর আলী নবাব আবদুল লতিফ অপেক্ষা বয়োঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তবে চিন্তা-চেতনায় তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ নবাব আবদুল লতিফ, এমনকি ভারতে মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের আরেক অগ্রদূত ও আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান অপেক্ষা প্রাগ্রসর। মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণে পূর্বসূরীদের মতো তিনিও ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব স্বীকার করতেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁর অন্যতম জীবন ব্রত ছিল। তবে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রশ্নে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর মতভিন্নতা দেখা যায়। তিনি রাজনীতির প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। উনিশ শতকের মুসলমান নেতাদের মধ্যে

---

৬০. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩১৩।
৬১. আ. ফ. ম. সালাউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৮।
৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮।
৬৩. আমিনুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৩।
৬৪. Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam*, London, 1961, p- 168.

তিনিই একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা প্রথম চিন্তা করেছিলেন।[৬৫] নবাব আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে উদগ্রীব ছিলেন, তবে পাশ্চাত্যের উদার রাজনৈতিক মতবাদের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টিও তিনি সমর্থন করতেন না। একই রকম মনোভাব পোষণ করতেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানও। তিনি মনে করতেন, এ মুহূর্তে মুসলিম সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতির মঞ্চে আসার জন্য প্রস্তুত নয়। তাঁর ধারণা ছিল হিন্দুদের তুলনায় সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ মুসলমানরা এ মুহূর্তে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাদের বিরোধ তৈরি হবে; যা প্রকারান্তরে তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। তাই তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি পরিহার করে ব্রিটিশদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের অবস্থার উন্নতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। আর এভাবেই মুসলমানদের ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[৬৬] অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী মনে করতেন যে, ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস মুসলমান সমাজের সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালানো।[৬৭]

সৈয়দ আমীর আলী লক্ষ্য করেন যে, হিন্দু সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি, বাংলা সাহিত্য, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রভাবে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। এর প্রভাবে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ে ইতোমধ্যে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে সফল হয়েছে। ১৮৭৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে গঠিত 'Indian Association' ছিল তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির একটি বড় মাইলফলক। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের আভাসের পটভূমিতে হিন্দু সমাজের সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতার বিপরীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তাকে সৈয়দ আমীর আলী তাদের জন্য বিপদজনক বলে মনে করেছিলেন। তিনি মনে করেন যে, হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে মুসলমানদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা, তাদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে উপস্থাপন, সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা, এবং সাংবিধানিক সুবিধা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে হবে।[৬৮] আমীর আলী লন্ডনে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে সাক্ষাতের সময় মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কথা বলেছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদকে বলেছিলে যে, হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে সেরূপ না হলে তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে।[৬৯] তবে সৈয়দ আহমদ তখন আমির

---

৬৫. উল্লেখ্য যে, ১৮৮৫ সালে কলকাতার কয়েকজন উর্দুভাষী নেতৃস্থানীয় মুসলমানের উদ্যোগে The Mohammedan Association বা আঞ্জুমান-ই-ইসলামী নামে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্থা গঠিত হয়েছিল।

৬৬. মোহাম্মাদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী (অনূ.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩।

৬৭. *M A Rahim, op.cit.,* p. 192.

৬৮. *M A Rahim, op.cit.,* p. 193.

৬৯. *Ibid.*

আলীর সাথে একমত পোষণ করেননি। নবাব আবদুল লতিফও সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগের বিরোধিতা করেন। এমনকি আবদুল লতিফ পাশ্চাত্য পোশাক পরিধানকারী ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুরাগী শিয়া মতাবলম্বী আমীর আলীর বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছিলেন।[৭০]

সমসাময়িক প্রধান দু'জন মুসলিম নেতার বিরোধিতা সত্ত্বেও সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। তিনি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নবাব আবদুল লতিফ এর একজন সমালোচক ছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি 'National Muhammedan Association' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক স্থাপিত 'Muhammedan Association'-এর বিকল্প ছিলো। নবাব আবদুল লতিফের মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রায় পনেরো বছর পর আমীর আলী এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি নিছক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল না, বরং একে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ সংগঠনটিকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনও বলা হয়ে থাকে। এমনকি ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন বলেও আখ্যায়িত করা হয়।[৭১] মাত্র ২০০ সদস্য নিয়ে ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন যাত্রা শুরু করলেও পাঁচ বছরের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ছয়শ-তে পৌঁছে। সংগঠনটির সেক্রেটারি সৈয়দ আমীর আলীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা, বিহার, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমনকি লন্ডনে এর প্রায় ৫০টি শাখা স্থাপিত হয়। এমতাবস্থায় ১৮৮৩ সালে এটিকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য এর নাম পরিবর্তন করে 'Central National Muhammedan Association' করা হয়।[৭২]

ন্যায্য ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করা সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের মূল লক্ষ্য ছিল। ১৮৮৩ সালে এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়-

> The Association has been formed with the object of promoting, by all legitimate and constitutional means, the well-being of the Mussulmans of India. It is founded essentially upon the principle of strict and loyal adherence to the British Crown. Deriving its inspirations from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the age. It aims of the political regeneration of the Indian Mahomedans by a moral revival and by constant endeavours of

---

৭০. আ ফ সালাহউদ্দীন আহ্মদ, "উনিশ শতকে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড", *পূর্বোক্ত* পৃ. ২৮৭।

৭১. আবদুল খালেক, ' সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন', *বাংলাপিডিয়া*, *https://bn.banglapedia.org/ সেন্ট্রাল_ন্যাশনাল_মোহামেডান_অ্যাসোসিয়েশন*

৭২. আ. ফ. ম. সালাউদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯০।

the Indian Mahomedans by a moral revival and by constant endeavours to obtain from Goverment a recognition of their just and reasonable claims.[৭৩]

মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা, ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে উজ্জীবিত করা, তাদের নৈতিক উন্নতি সাধন এবং সরকারের কাছে স্মারকলিপি ও প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে স্বীকৃতি আদায় করার মাধ্যমে সংগঠনটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও ঐক্যের জন্য এসোসিয়েশন বিভিন্ন সময় বক্তৃতা, সামাজিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করত। সংবাদপত্রে লেখনি, বিবৃতি ও জনসভার মাধ্যমেও এসোসিয়েশন মুসলিম সমাজের দাবি আদায়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ১৮৮১ সালে মুসলমানদের শিক্ষার সমস্যাবলি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ ছিল এ্যাসোসিয়েশনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবর্ধনাকালে লর্ড রিপনকে এসোসিয়েশন 'A cry from the Indian Muhamedans' শীর্ষক ২৮টি পরিচ্ছেদের একটি দীর্ঘ 'স্মারকপত্র' প্রদান করে।[৭৪] এটি মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে পরবর্তীকালে সরকারের গৃহীত নীতিসমূহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতে ও ইংল্যান্ডে যুগপৎ আই.সি.এস. পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং মনোনয়ন পদ্ধতি বলবৎ রাখার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী যে দাবি করেছিলেন সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। এর দাবি ছিল ব্যাপক হারে মুসলমানদের নিয়োগ, নির্বাহী পরিষদের সম্প্রসারণ ও ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ। স্থানীয় পরিষদসমূহে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি করা হয়েছিল এই সংগঠনটির পক্ষ থেকে। এসোসিয়েশন সরকারের কাছে দাবি করেছিল যে, মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে অধিক সংখ্যক মুসলমানদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত এবং তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সহায়তার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর সম্পত্তিগত যোগ্যতার মান কমিয়ে দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে করে মুসলমানরা যোগ্য বা যথাযথভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে পেশ করতে সমর্থ হবে।[৭৫] সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে এসোসিয়েশনের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় যখন ১৮৯২ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইন বিভিন্ন স্বাথ-সংশ্লিষ্ট দলের স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

---

৭৩. Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association and its Branch Associations with the Quinqunnial and Annual Reports and List of Menbers. Thomas S. Smith. City Press, Calcutta, 1885, p- 11.

৭৪. Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association, *op.cit.* , p- 10.

৭৫. I. H. Qureshi, *A Short History of Pakistan*, Book IV, University of Karachi, 1967, pp- 155-157.

পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, 'Central National Muhamedan Association'-কে ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এর পূর্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের ন্যায্য পাওনা ও অধিকার, রাজভক্তি এবং সরকারের কাছে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনো যোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। ইতোপূর্বে যে সব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সবের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো। কিন্তু আমীর আলীর প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক জাগরণের পাশাপাশি মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে উজ্জীবিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস নেয়। সংগঠনটি তার পরবর্তী ২৫ বছরের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলমানদের আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধকরণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ উচিত কি-না এ নিয়ে মুসলিম নেতৃত্ব যখন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত, সে সময় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতে "সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" (The All Indian National Congress) নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব পাক-ভারতীয় উপমহাদেশকে আন্দোলিত করে। বিশেষ করে ইতালি ও জার্মানির একত্রীকরণ ও আয়ারল্যান্ডের স্বদেশ (Home Rule) আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় জনগণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উৎসাহিত হয়। এ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তদানীন্তন বড়লাট ডাফরিনের অনুমতি নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু সংখ্যক ভারতবাসীর সহায়তায় ইংরেজ সরকারের সাবেক সেক্রেটারি অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৬] থিওজোফিক্যাল সোসাইটির কিছু 'অকাল্ট' হিউমকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাকারীদের মধ্যে দাদাভাই নওরোজি, দিনশ এদুলজি ওয়াচা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপমহাদের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি করা হয়েছিল।

ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা এ কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার বিরোধী দল হিসেবে গড়ে উঠেনি। প্রথম দিকে কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত একটি উদারনৈতিক মধ্যপন্থি রাজনৈতিক দল। তাত্ত্বিক ভাবে এটি ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল। হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্যই এ দলটির দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ফলে প্রথম দিকে এতে কিছু সংখ্যক মুসলমানদেরও অংশগ্রহণ ছিল। এমনকি ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন বোম্বের বিখ্যাত ব্যারিস্টার বদরুদ্দিন তৈয়বজী।

---

৭৬. Mr. Abdur Rafay Khan, *Sir Sayyid Ahmed Khan's Political Ideas and Activities*, in the Proceedings of the Pakistan History Conference (second session), Pakistan Historical Society, Lahore, 1952, p. 263.

জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেনি। এর পশ্চাতে সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বক্তব্য ও চিন্তনে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি ১৮৮৪ সালে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত এক সংবর্ধনার জবাবে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যর উপর জোর দিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন। এ সময় পর্যন্ত তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের এক জাতি বলেই মনে করতেন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি ত্যাগ করে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৭৭] কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরই তাঁর মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তাঁর কংগ্রেস বিরোধিতার পশ্চাতে মুসলিম স্বার্থ চিন্তা মুখ্য ছিল বলে ধারণা করা যায়। বস্তুত কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হলেও এর মধ্যে হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের মনোভাব প্রবল ছিল। কংগ্রেস কর্তৃক ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে নির্বাচন প্রথার উপর ভিত্তি করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ প্রদানের দাবি ইত্যাদিকে তিনি মুসলিম স্বার্থ পরিপন্থি বলে মনে করতেন। সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম স্বার্থের প্রতি সজাগ ছিলেন বিধায় কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটির বিরোধিতা করেন। তাঁর বিরোধিতার মূল কারণ ছিল কংগ্রেস কর্তৃক ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে নির্বাচন প্রথার উপর ভিত্তি করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি করা। তা পূরণ হলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাঁর মতে, হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সাধারণ নির্বাচনের ফলে তারাই ক্ষমতার সুযোগ পাবে। মুসলমানরা অবহেলিত থেকে যাবে। তাছাড়া ১৮৯২ সালে 'Indian Council Act' অনুযায়ী দেখা যায় কম সংখ্যক মুসলমানই নির্বাচিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭-১৯২০) এর ন্যায় কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক নেতা কংগ্রেসে থাকার ফলে মুসলমানদের মনে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দেবার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের সমর্থন লাভে সচেষ্ট হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্বীকার করেন যে, মুসলমানদের কংগ্রেসে টানার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন,

> Our critics regarded the National Congress as a Hindu Congress, and the oppositions papers described it as such. We are straining every nerve to secure the co-operation of our Mohamedan fellow-countrymen in this great national work. We sometimes paid the fares of Mohamedan delegates and offered the other facilities.[৭৮]

---

৭৭. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।
৭৮. S. N. Banerjee, *A Nation in Making*, Oxford University Press, Madras, 1925, p. 108.

এ কারণে সৈয়দ আহমেদ খান মুসলমানদের কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাবধান করে দেন। তিনি কংগ্রেসের সাথে সব রকম সম্পর্ক ও সহযোগিতা ছেদ করে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন–

> Is it possible that under these circumstances two nations the Mohamadan and Hindu Could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable.[৭৯]

এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, হিন্দু-মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি। তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। যেহেতু কংগ্রেস হিন্দু প্রধান সংস্থা। তাই এর মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা হতে পারে না। তিনি কংগ্রেসের সাথে সব রকম সম্পর্ক ও সহযোগিতা ছেদ করেন।[৮০] তিনি কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে 'United Indian Patriotic Association' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখ্য যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানকালে ১৮৮৭ সালে লখনৌ ভাষণে হিন্দু মুসলিমকে দু'টি আলাদা জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন; যা ভারতের অন্য কোন মুসলিম চিন্তক ইতোপূর্বে করেননি। আর এর মাঝেই তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন।[৮১] সৈয়দ আহমদ কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দূরে রেখে রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করেছিলেন, সেটিই ১৯০৬ সালে অঙ্কুরিত হয়ে 'মুসলিম লীগ' নাম ধারণ করে। আর এ অঙ্কুরই ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং আরো পরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের।

কংগ্রেস সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মনোভাব এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা শুধু উত্তর ভারতে নয়, বাংলার মুসলমান নেতাদেরও প্রভাবিত করেছিল। ফলে মুসলিম সমাজের প্রধান দুই নেতা নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী উভয়েই বাংলার মুসলমানদের কংগ্রেসে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন। ১৮৮৫ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথম অধিবেশনে 'Central National Mohammedan Association' ক্ষীণ সমর্থন জানায়। পরের বছর 'Mohammedan Literary Society' ও 'Central National Mohammedan Association' কোনো প্রতিনিধি না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁদের এ অবস্থানের ফলে বাংলায় বিশেষ করে এখানকার মুসলিম সমাজে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের

---

৭৯. Sir Sayed Ahmed Khan, *The Present State of Indian Politics*, Allahabad, 1888, p- 37.

৮০. Sir Sayed Ahmed Khan, *The Present State of Indian Politics*, Allahabad, 1888, p. 37.

৮১. Hafeez Malik, 'Sir Sayyid Ahmad Khan's Contribution to the Development of Muslim Nationalism in India', *Modern Asian Studies*, 4, 2 (1970), Printed in Great Britain, p- 131.

দ্বাদশ অধিবেশনে বাংলা থেকে ৩৯ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত চর্তুদশ অধিবেশনে বাংলার মুসলিম সদস্যের সংখ্যা ছিল তেত্রিশ।[৮২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ পরিচালিত আলীগড় আন্দোলনের বিপরীত ধারায় মাওলানা আবুল কাশেম নানতুভীর নেতৃত্বে দেওবন্দ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে একটি আন্দোলন ও মতবাদ গড়ে ওঠেছিল। বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ঐক্যবোধ সৃষ্টি, ইসলামী চেতনার বিকাশ সাধন দেওবন্দ আন্দোলনের অনুসারীদের মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁরা স্যার সৈয়দ আহমদের কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন। শুরুর দিকে তাঁদের সাথে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তবে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব থাকায় তারা কংগ্রেসের রাজনীতি সমর্থন করেন।[৮৩] আলীগড় আন্দোলন অপেক্ষা দেওবন্দ আন্দোলনের প্রভাব কম ছিল। বাস্তব রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকায় তাঁরা মুসলিম জনমতকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। ফলে সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর অনুসারীদের মতামতই মুসলিম সমাজে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। তাই কংগ্রেস ভারত তথা বাংলার মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

উনিশ শতকে শেষপাদে বঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতির উপর্যুক্ত পটভূমিকায় বাঙালি মুসলিম সমাজে পরস্পর বিরোধী দু'টি ধারার উদ্ভব পরিলক্ষিত হয়। একটি ধারার মাধ্যমে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ১৮৮১ সালে প্যান ইসলামিজমের প্রবক্তা সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানির কলকাতা সফরের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে বিশ্ব মুসলিমবাদের ধারণা শক্তিশালী হয়। এসময় মুসলিম সম্পাদিত *আখবারে এসলামীয়া*, *ইসলাম*, *আহমদী*, *সুধাকর*, *ইসলাম প্রচারক*, *মিহির ও সুধাকর এবং নূর আল ইমান* ইত্যাদি সংবাদপত্র ও সাময়িকী মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য সময়ে মুসলিম সমাজে একদল সাহিত্যসেবীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষী লেখনীর বিপরীতে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে মুসলিম সমাজে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা ক্রমান্বয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠেন।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী যুক্তিবাদী ও আমূল সংস্কারবাদী ধারার আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ধারার প্রতিনিধিত্বকারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নেন। এ

---

৮২. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengla 1884-1912*, Dacca, 1974, p. 382 & 388.

৮৩. Moin Shakir, *Khilafat to Partition 1919-1947,* Delhi, 1970, p. 40.

প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন দেলোয়ার হোসেন আহমেদ মীর্জা (১৮৪০-১৯১৩)। দেলোয়ার হোসেন ১৮৪০ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. প্রথম বিভাগে পাশ করেন, এরপর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। চাকুরি জীবনে শেষ পর্যায়ে ১৮৯৫ সালে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৮ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট দেলোয়ার হোসেন আহমেদ ছিলেন পুরোপুরি যুক্তিবাদী একজন মানুষ। তিনি বাংলার মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী যুক্তিবাদী ও আমূল সংস্কারবাদী ধারার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। চাকুরিতে থাকাকালীন এবং অবসর গ্রহণ করার পর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সমকালীন মুসলমান সমাজের নানাবিধ সমস্যার উপর ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখতেন। ১৮৮৯ সালে দু'খণ্ডে রচিত তাঁর ইংরেজি বই 'Essays on Muhammaan Social Reforms' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর চিন্তায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদী দর্শনের গভীর প্রভাব দেখা যায়। তিনি প্রথম মুসলিম বুদ্ধিজীবী যিনি ঘোষণা করেন যে, মুসলমানদের জাগতিক আইনকে ইসলামী ধর্মীয় আইন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করাই হলো গোটা মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পূর্বশর্ত। তিনি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক আইন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেন। উত্তরাধিকার আইন, মহাজনী কারবার, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি একাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন।[৮৪] বস্তুত তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে একত্র করার ফলে মুসলিম সমাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষের অভাবে মুসলমানরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। তিনি মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অধিকতর চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করতেন।

দেলোয়ার হোসেন আহমেদের অগ্রগামী চিন্তাধারা সমকালীন রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ ব্যাপক মাত্রায় গ্রহণ করেনি। তাছাড়া তাঁর রচনাগুলো ইংরজি ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর আধুনিক ও প্রগতিশীল মতামত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। বস্তুত তিনি ছিলেন অনেকটাই স্রোতের বিপরীত ধারায় চলা মানুষ। তাঁর চিন্তা ও মতকে

---

৮৪. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬।

সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো উপযুক্ত সহযাত্রীও তিনি খুব একটা পাননি। মুসলিম সমাজে প্রগতি চিন্তার বিপরীতে রক্ষণশীলতার প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকে।

বঙ্গ-ভারতে বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম সমাজে জাতীয় চেতনায় স্বাতন্ত্র্যবোধ তৈরি হয়। এ সময় মুসলমানদের স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষার পক্ষে কাজ করার জন্য একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছিল। ১৮৯০ সাল নাগাদ এ শ্রেণি সারা ভারতের মুসলিম সমাজের পক্ষে কথা বলা শুরু করে। ১৮৯৫ সাল হতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'The Moslem Chronicle'-এ শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এতে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মতামত প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুত বাঙালি মুসলিম জনমত গঠনে এ পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম এ শ্রেণি নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। বিশ শতকের সূচনালগ্নে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্যবোধ আরো প্রবল আকার ধারণ করে। যার পরিণতি ১৯০৬ সালের সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। মুসলিম সমাজে রক্ষণশীল ধারার প্রাধান্য মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনার পেছনে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই। তবে এর পেছনে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ স্বার্থবাদী মনোভাব মুসলিম সমাজের মনে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা তৈরি করেছিল।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নানা রূপান্তর ঘটে। বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এ রূপান্তর ধারার তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ধারটি হলো ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী। বস্তুত বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা এবং কোম্পানি সরকারের গৃহীত আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক নীতির ফলে তৎকালীন মুসলিম অভিজাত শ্রেণির পতন ঘটে। ক্ষয়িষ্ণু এ অভিজাত শ্রেণি উনিশ শতকের শুরুতে নবতর পরিস্থিতে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলিম রাজনৈতিক অঙ্গনে যে নেতৃত্ব শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণে সাধারণ মানুষ থেকে ধর্মাশ্রয়ী নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, মীর নিসার আলী তিতুমীর ছিলেন এ ধারারই প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল না এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনো আগ্রহও ছিল না। চিন্তাধারায় তাঁরা ছিলেন পশ্চাদমুখী। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের মধ্যেই তাঁরা মুসলিম সমাজের মুক্তি ও উন্নতির চিন্তা করেছেন। ফলে ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই মুখ্যত তাঁরা তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছেন। ক্রমান্বয়ে তাঁদের কর্মকাণ্ডে কিছু আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি যুক্ত হলেও ব্রিটিশ বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা কম ছিল। ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তাতে কিছুটা জিহাদি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রবণতা মুসলমান সমাজের জন্য স্বার্থনুকূল ছিল না, বরং তাদের জন্য ক্ষতির কারণ

হয়েছিল। কেননা এটি মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকার থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ফলে তারা ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমশ একটি চরম দুর্দশাগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হয়।

বাংলার মুসলিম সমাজের উপর্যুক্ত হতাশাজনক পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজে নগরবাসী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদার মনোভাবাপন্ন এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ নতুন নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতা পরিহার এবং সরকারের সাথে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে শুরুতে মতভিন্নতা থাকলেও সৈয়দ আমীর আলী এ বিষয়ে অনেককে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় এক দশক পূর্বে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামে তাদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হয়। তবে এ রাজনৈতিক সংগঠনটির মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক তৎপরতা দেখা যায় না। বরং মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটি আবেদন নিবেদনের রাজনীতিকেই শ্রেয় বলে মনে করে। আর এটিই ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার মূলধারা।

উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তনে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও বিশ্ব মুসলিমবাদের প্রভাব প্রকটভাবে দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, বাস্তব কারণে দেরিতে হলেও মুসলমানরা যুগ বাস্তবতা উপলব্ধি করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সরকারের প্রদত্ত সুবিধাগুলো গ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন। ফল হিসেবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজে একটি আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। রাজনীতি, পেশাগত ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠা লাভে এ শ্রেণিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধে রূপান্তরিত হয়। এ সময় নিজেদের “ভদ্রলোক” বলে মনে করা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করে। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ অদ্ভুত ও বিকৃত আচরণ নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশকে বিক্ষুব্ধ ও জাত্যাভিমানী করে তোলে। এ অবস্থায় উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ দেখা দিলে তাদের মধ্যে মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের একটি বড় অংশ হিন্দু বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় প্যান ইসলামিজম ভাবধারায়ও তাঁদেরকে অনেক অনুপ্রাণিত করে। ফলে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ঘটে। এতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে অবনতি ঘটে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়। হিন্দু-মুসলিম এ বিভাজনের পিছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সচেতন প্রয়াস ছিল বলেও মনে হয়। বস্তুত তাদের চিরাচরিত ‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতির স্বার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে তারা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজেদের নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়।

সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা নানা ভাবদ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম রাজনীতি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের এবং কিছু পরিমাণে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি তৎপরতার মধ্যে সীমিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে এসে নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে ব্রিটিশ বিরোধী মুসলিম রাজনীতির সংগ্রামী ধারার অবসান ঘটানো হয় এবং নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ সময় থেকে নিয়মতান্ত্রিক আবেদন নিবেদনের রাজনীতি শুরু করে। এ শতকের শেষ দিকে মুসলিম রাজনীতির গতিধারা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্যান ইসলামী ভাবাদর্শ ধারা প্রভাবিত হয়। এর জের পরিলক্ষিত হয় বিশ শতকে। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা শেষোক্ত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক চিন্তনেরই ফল।

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙালি মুসলিম সমাজে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কৃতির রূপান্তর

আধুনিক ভারত তথা বাংলার রূপান্তর ঘটেছিল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার হাত ধরে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে ভারতবাসীর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় নব চেতনার উন্মেষ ঘটে।[১] পাশ্চাত্যের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, বিজ্ঞানচেতনা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতবাদ ও শিক্ষা ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালির চিন্তা ও মননশীলতাকে আধুনিকতায় রূপান্তরিত করেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়েই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ইংরেজ শাসনামলের একশত নব্বই বছরে (১৭৫৭-১৯৪৭) ধীরে ধীরে তা বিকশিত হয়েছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষত উনিশ ও বিশ শতকে কোম্পানি ও ইংরেজ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ ভারতবাসীকে আধুনিক করে তুলেছিল। কিন্তু ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক ভাবধারাপুষ্ট হয়ে উঠেছিল এক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। একদিকে, ইংরেজ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার নিদারুণ বেদনা; অন্যদিকে, বাস্তবতাকে অস্বীকার করার ফলে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকেও শেষ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের বাস্তবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল মূলত নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই। আর এই ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়েই বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। তারা আধুনিক জাতিসত্তায় উন্নীত হয়। উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং এর ফলে তাদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাচেতনার বিকাশ- আলোচ্য অধ্যায়ের মূল উপজীব্য।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার[২] সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সময়ে এদেশে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে নতুন নতুন চিন্তার ও ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটেছিল, তা এদেশে পাশ্চাত্যের ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য প্রভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক রূপান্তর ঘটে এবং নানামুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উনিশ শতকব্যাপী (১৮০১-১৯০০) বাংলার শিক্ষা, অর্থনীতি ও

---

১. T. N. Sequeira, *Modern Indian Education*, Oxford University Press, 1960, p. 1.

২. এখানে বাংলা বলতে ১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বোঝানো হয়েছে।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখী সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। এ সময়েই ভারতের বিশেষ করে বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে পশ্চাদমুখী ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়; হিন্দু মহাজন-জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন বিদ্রোহে পরিণত হয়। এর ফলে এ আন্দোলন ও বিদ্রোহ মুসলিম সমাজের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।[৩]

সমাজ একটি জীবন্ত সত্তা এবং এ সত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজ অভিজ্ঞতা নিজস্ব নিয়ম-পদ্ধতি আবিষ্কার করে, আর এটাই হচ্ছে সমাজের স্বকীয়তা। কোনো নতুন বহিঃশক্তি হঠাৎ করে সে স্বকীয়তা ধ্বংস করে নতুন নিয়ম-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করলে সমাজ তার আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করে। বিশ্ব ইতিহাসের এ বৈশিষ্ট্যকে আর্নল্ড টয়েনবি 'Challenge and Response' নামে আখ্যায়িত করেছেন, যার দ্বারা সৃষ্ট ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পরিবর্তন হয় বিশেষ সমাজের ঐতিহাসিক গতিধারা। বাংলার সমাজ কাঠামোর জন্যে কোম্পানির শাসন ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং এ চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার কৌশলগুলো ইতিহাসে এখনও প্রায় অলিখিত রয়েছে।

ইংরেজ শাসক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ী প্রায় সবাই ইংরেজ শাসনকে বাংলার মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ মন্তব্য করেছেন। ইংরেজ শাসকদের চিত্রিত করেছেন শান্তি ও প্রগতির প্রতিভূ হিসেবে। বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করেনি। কেননা কোম্পানি শাসনের প্রথম দু'দশকে দায়িত্বহীন দুঃশাসন, অভাবনীয় অরাজকতা, শোষণমুখী রাজস্বনীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সম্পদ পাচার, দুর্ভিক্ষ ও মর্মন্তুদ পরিবেশ বাংলার মুসলমানদের কাছে ইতিবাচক মনে হয়নি। দ্বিতীয়ত, লর্ড কর্নওয়ালিস থেকে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আগমন পর্যন্ত ভূমিভিত্তিক সমাজবিন্যাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, নতুন শাসন ও বিচারব্যবস্থা, পুরাতন মূল্যবোধ ও হাজার বছরের প্রথা-প্রতিষ্ঠানে যে আমূল পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক ভাঙা-গড়া ও অনিশ্চয়তার সুযোগে সৃষ্ট পরিবেশ প্রভৃতি বাঙালি মুসলমান সমাজকে কোম্পানি সরকারের প্রতি অতিষ্ঠ করে তোলে। তৃতীয়ত, বেন্টিঙ্কের সামাজিক সংস্কার, মিশনারীদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কৌশল এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি (১৮৩৭ সাল) ভাষার প্রচলন ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার নতুন ধারা বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুভূতিতে নির্মমভাবে আঘাত করে। চতুর্থত, লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করে পুরোনো সামাজিক আভিজাত্যকে ম্লান, অবাধ বাণিজ্যনীতির নামে ব্রিটেনের কলকারখানাজাত সস্তা পণ্য এনে স্থানীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন, সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়ে নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে কায়েম করে ত্রাসের রাজত্ব।

---

৩. A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, International Center for Bengal Studies, Dhaka, p. 9.

ব্রিটিশদের এরূপ শাসন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বাঙালিরা যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তার কিছু তথ্য পাওয়া যায় ব্রিটিশ উৎস থেকেই। এরূপ সমাজে সমালোচনার স্থলে শোষণই ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে ওঠে।[৪] যদিও ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন খান কোম্পানির দুঃশাসনে দেশবাসীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখলেও তিনি তাঁর 'সিয়ার-ই-মুতাখখিরীন' এ রেকর্ড করেননি। তিনি শুধু প্রকাশ করেন যে, ইংরেজ শাসনে দেশবাসীরা খুশি নয়। সিয়ার অনুবাদক ফরাসি লেখক হাজী মোস্তফা উল্লেখ করেন যে, গোলাম হোসেনের গ্রন্থে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় প্রতিরোধের আভাস মেলে।[৫] কিন্তু সেটা আভাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

১৮১৮-৩৫ সালের মধ্যে এদেশের শিক্ষা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামো বেশ কিছুটা নির্মিত হয়েছে। নতুন আইনব্যবস্থার ভিত্তিও রচিত হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার ফলে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের উন্মেষও ঘটেছিল এ সময়েই। বাংলার সংবাদপত্রসমূহে এদেশের বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের চিন্তাচেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে শুরু করেছিল।[৬]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় এক নয়া বণিকসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। নতুন এ বণিকদের মধ্যে শুধু দেশীয় হিন্দুরাই নয়, বরং ছিলেন উত্তর ভারতীয় মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ী, ইরানি ও আফগান বংশোদ্ভূত মুসলমান; যারা কলকাতায় বসবাস করত এবং মুঘল সওদাগর নামে পরিচিত ছিল। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ এ নয়া ভারতীয় বণিকসম্প্রদায়ের বিকাশকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছিল। ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে আন্দোলনকে বেশ কিছুসংখ্যক ভারতীয় ব্যবসায়ী সমর্থন করেন এবং অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হন। ভারতের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ইউরোপীয় পুঁজি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের সম্ভাবনাও তারা দেখতে পেয়েছিলেন।[৭] এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় জোর দিয়ে বলেছিলেন, "ইউরোপীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের সঙ্গে আমাদের যতই লেনদেন হবে ততই আমরা আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করবো।"[৮] দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাথে সাথে নীলকরদের কার্যকলাপের প্রশংসা করেন, যদিও তিনি স্বীকার করেন যে কোনো নীলকরকে কৃষকদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করার দায়ে দোষী করা যায়।[৯] দ্বারকানাথ ঠাকুরও অবাধ ব্যবসার পক্ষে আন্দোলনকারীদের

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪-২৬৫।
৫. Golam Hussain Khan, *Seir-I-Mutakherin*, 1926, Translator's Preface, p. 6.
৬. সালাউদ্দীন আহমেদ, *উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১২-১৩।
৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭।
৮. *Bengal Hurkaru*, 10 December 1829.
৯. *Ibid.*

অন্যতম একজন সমর্থক ছিলেন এবং যখন অবাধ বাণিজ্যের অধিকাংশ দাবি ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টে মেনে নেওয়া হয় তখন দ্বারকানাথ একজন ব্যবসায়ী হিসেবে নতুন সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।[১০]

কলকাতার অভিজাত শ্রেণির লোকেরা বাস করতেন বড়ো বড়ো অট্টালিকায়। তাঁদের বাসভবন ইউরোপীয় কায়দায় রুচিশীল ঝাড়বাতি, বড়ো বড়ো আয়না, গদি আঁটা কেদারা বা সোফা, দেরাজওয়ালা আলমারি, লেখার টেবিল এবং দুই তিনশত চেয়ার দ্বারা সজ্জিত থাকত। তাদের মধ্যে অনেকে আবার ইংরেজদের মতো চা পান করার অভ্যাস করেছিলেন এবং কেউ কেউ ইংল্যান্ডে তৈরি বিলাসবহুল জুড়ি-গাড়ি রাখতেন, একজনের ছিল ইংরেজ কোচম্যান।[১১] এভাবে কলকাতা শহর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। বাংলার অন্যান্য শহরগুলো কলকাতার প্রতিচ্ছায়ায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। তবে বাংলার একসময়ের রাজধানী মুর্শিদাবাদ তার মর্যাদা দ্রুত হারাতে শুরু করেছিল। নদীর উভয় দিকে আট মাইল জুড়ে বিস্তৃত এ শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ছিল- নবাবের প্রসাদ, যেটিকে ইউরোপীয় স্থাপত্যের নিদর্শন বলা যায়। বাংলার অন্য একটি বিখ্যাত শহর ঢাকার সুবিখ্যাত মসলিন বস্ত্রের উৎপাদনের উপর এ শহরের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল; কিন্তু মসলিন উৎপাদনের অবক্ষয়ের কারণে ঢাকা শহরও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বেশ কিছু সংখ্যক ইংরেজ, গ্রিক, আরমেনীয় ও পতুর্গীজ ব্যবসায়ী এ শহরে বাস করতেন। ঢাকার তৎকালীন নবাব এবং সাধারণ অধিবাসীরা সমকালীন প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মকতাদের প্রতি আনুগত্য ছিল।[১২] ১৮২৪ সালে ঢাকা পরিদর্শনে এসে বিশপ হেবার মন্তব্য করেন, "শহরের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস্তূপে পরিণত"। তিনি অবশ্য ঢাকার অভিজাত মুসলিম বাসিন্দাদের দেখে চমৎকৃত হন; তাদের "তুলনামূলক গায়ের রং ফর্সা, মার্জিত ও মর্যাদাসম্পন্ন চালচলন (বিশেষ করে ঘোড়ার পিঠে চরা অবস্থায়), জমকালো পোষাক পরিচ্ছদ, তাদের অনুসারিদের ভীড়, উত্তেজিত কর্মব্যস্ততা এবং জাকজমক"।[১৩] বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাটোর, দিনাজপুরসহ অন্যান্য শহরগুলো দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এসব মফস্বল শহরগুলোর অবক্ষয়ের প্রধান কারণ ছিল পুরাতন অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয়। এসব শহর এবং অভিজাতদের অবক্ষয়কালে কলকাতা শুধু এক নতুন

---

১০. ১৮৩৩ সালের চার্টার এক্টের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা হারায়। ইউরোপীয়দের নিজেদের নামে ভূসম্পত্তি ক্রয় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সালাউদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮, ৩২।

১১. *East India Gazetteer*, London, 1828, i, p. 324.

১২. *Ibid*. p. 478.

১৩. R. Heber, *Narative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay*, 1824-25; With an account of a Journey to Madras and Southern India, London, 1828, iii p. 296-297.

যুগের সূচনা, নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটায় নি; বরং এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়।[১৪]

আঠার শতকের শেষের দিকটা ছিল বাংলার সমাজের ক্রান্তিকাল। পুরাতন দেশীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর এক নতুন বিদেশি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন শুরু হয় এ সময়ে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাতে ভাঙন দেখা দেয়। তবে সামাজিক নেতৃত্বে ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই। উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্যের প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রাচীন প্রথা[১৫] বেশ কিছুটা নমনীয় হয়ে পড়েছিল। গত শতকের রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তার প্রভাবে এ সময় সমাজে নানাপ্রকার দুর্নীতি দেখা দেয়। ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমানরা প্রায় আটশ বছর শাসন করার ফলে এক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। ইসলাম এ দেশে এসে ভারতীয় রূপ পরিগ্রহণ করে। ইসলাম ও হিন্দুধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতির সমান্তরাল দুটি ধারা; এ দুই ধারাকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করেছে অসংখ্য উপধারা। তা সত্ত্বেও এ দুটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে এ দেশের সংস্কৃতিকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে। উভয় সম্প্রদায় বহুকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিতে এবং শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।[১৬] অনেক দিক দিয়ে অভিজাত হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতির যথেষ্ট মিল ছিল; যা মুসলিম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবলুপ্তির বহুকাল পর উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত টিকে ছিল। তারা একই সাথে ফারসি চর্চা করতেন, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এবং হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ আরবি ভাষার চর্চা করতেন।[১৭] উভয়ের যাত্রাপথ ভিন্ন হতে শুরু করে ১৮৩৫-৩৭ সালের পর থেকে যখন সরকারি ভাষা ফারসির বদলে ইংরেজি প্রবর্তিত হয়।[১৮]

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইংরেজ শাসনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবধারা এদেশে আসতে শুরু করে, যা বাঙালি সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে মুসলমান সমাজের মনোভাব এ পরিবর্তনকে সহজে মেনে নেয়নি। বস্তুত সুদীর্ঘকাল ধরে মুসলিম রাজত্বকালে মুসলমানরা যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিল সেগুলো তারা দ্রুত হারাতে থাকে। ইংরেজ বড়লাট স্যার জন শোর লিখিত বিবরণীতে উল্লেখ করেন

---

১৪. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১-২২।

১৫. যদিও বাঙালি হিন্দু সমাজে বর্ণশ্রম প্রথা কঠোরভাবে পালিত হতো এবং ধর্মগত কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, আন্তঃবর্ণ ও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক সব সময় বিরোধপূর্ণ ছিল এ কথা বলা যায় না। সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২।

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৪।

১৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য হাউজ অফ কমন্স কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির নিকট রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত সাক্ষ্য, Parliamentary Papers, House of Commons, 1831, V 320A, 739-41; সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫ থেকে নেয়া।

১৮. *প্রাগুক্ত*, ২৪।

যে, দেশের প্রশাসন কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে চলে যাবার ফলে প্রাক্তন মুসলমান শাসকদের অগণিত পরামর্শদাতা ও তাদের পোষ্য হারিয়েছে তাদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি; তার সঙ্গে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জনের সুযোগ সুবিধা এবং এর ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অভিজাত বংশীয় পরিবার যারা এককালে ছিল বিত্তশালী তারা বিত্ত ও প্রতিপত্তির উৎস থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়েছে।[১৯] তিনি স্বীকার করেন যে, এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।[২০] সুতরাং মুসলমানরা নতুন শাসনকে সন্দেহ এবং আশঙ্কার চোখে দেখতো। এ সময় মুসলিম ব্রিটিশ সম্পর্ক পরস্পরের প্রতি সন্দেহের উপর কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ১৮৩২ সালে জনৈক প্রাক্তন ইংরেজ কর্মকর্তা বলেন,

> আমি বলতে পারি যে, আমরা ভারতবর্ষ মুসলমানদের হাত থেকে দখল করে নিয়েছিলাম এবং সেজন্য মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ ... আমি একথা বলছি না মুসলমানরা এদেশ থেকে আমাদের বিতাড়িত করার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। বস্তুত আমি বিশ্বাস করি উচুঁ শ্রেণির অনেক মুসলমান তাদের হৃদয়ে এ আশা এখনও পোষণ করে; এবং আমি মনে করি যে, নিজেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার ন্যূনতম সম্ভাবনা দেখা দিলে তারা যে কোন ইউরোপীয় শক্তির সাথে যোগ দিতে পারে। আমি একথা বলব যে, সাধারণত হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে আমাদের শাসনের প্রতি অনেক বেশি অনুগত।[২১]

ক্ষমতা, গৌরব ও প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমানদের অনেকে অন্তর্মুখী হয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। উনিশ শতকে ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষে তথা বাংলায়ও এসে পৌঁছেছিল; যা চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।[২২] ভারতীয় অনেক মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হতে থাকে যে, মুসলমানরা ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাই ভারত তথা বাংলার মুসলমানরা অধঃপতনের সীমায় পৌঁছে গেছে। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সময়ের ইসলামের পুনরুত্থান ঘটাতে পারলে মুসলমানরা তাদের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। তাই ধর্মীয় নেতারা কাফের বা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেন।[২৩] তবে এসব আন্দোলন সমাজের নিম্ন শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে ততটা সাড়া ফেলেনি। যেমন, পূর্ববাংলার হাজী শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[২৪] পশ্চিম

---

১৯. *Bengal Secret Consultation*, No. 11, 22 June 1795.
২০. R. Hehber, *op. cit.*, p. 298.
২১. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪-২৫।
২২. আজিজুর রহমান মল্লিক (অনু: দিলওয়ার হোসেন), *ব্রিটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৩০-১৩২। ২৩ ইংরেজ শাসনকে তারা কাফেরের শাসন বলে এবং ভারতবর্ষকে দারুল হরফ বলে ফাতোয়া দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইলাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১-৩।
২৪. মুহাম্মদ ইলাম-উল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০; মঈন উদ-দীন আহমদ খান (অনু : গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া), *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮৬।

বাংলায় বারাসত অঞ্চলে তীতুমীর এবং তাঁর অনুসারীরা ব্রিটিশ জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিপ্ত হন।[২৫] এসব আন্দোলন যদিও ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছিল, কিন্তু দ্রুত তা কৃষক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পরিণত হয়। কারণ, বাংলার কৃষকদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র মুসলমান, তারা বিক্ষুব্ধ ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে (বিশেষত হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে)।[২৬]

তরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। যা ছিল বাংলা সাহিত্য বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[২৭] এ সময় বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের এ কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনুভব করে এসকল শিক্ষকরা বেশ কিছু নতুন পুস্তক সরল ও মার্জিত ভাষায় রচনা করেন। এর ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্য এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষ উইলিয়াম কেরীকে প্রথমে কলেজের শিক্ষক এবং পরে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেন। কেরী এ পদে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসুর মত অনেক ব্যক্তিকে কেরী সাহেব শিক্ষক হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিয়ে আসেন। এ সময় পণ্ডিতগণ পরিমার্জিত ভাষায় নতুন নতুন অনেক বই রচনা করেন। এভাবে বাংলা ভাষা গ্রাম্য উপভাষা থেকে পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক রুচিশীল ভাষায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এ সময় বেশ কিছু ইংরেজি বইও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এ প্রক্রিয়ার ফলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ বাংলার মানুষের জীবন ও মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এ প্রভাবের ফলে বাংলার মানুষ বিশেষ করে হিন্দু সমাজ ইংরেজি শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে। ইংরেজি শাসকদের ভাষা হওয়ায় শিখতে পারলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।[২৮] ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য বাঙালি হিন্দুরা প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে তারা সরকারি সাহায্য ছাড়াই ১৮১৬ সালে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেয় এবং তারা ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত আগ্রহী কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এর নিকট থেকে সক্রিয় উৎসাহ লাভ করে।[২৯]

---

২৫. মুহাম্মদ ইলাম-উল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০-২১।
২৬. S. K. De, *History of the Bengali Literature in the Nineteenth Century* 1800-25, Calcutta, 1919, p. 116.
২৭. *Ibid*, p.119.
২৮. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫-২৬।
২৯. P. C. Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare*, Calcutta, 1877, p. 63.

এদেশে পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনা এবং ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা সমানভাবে সচেষ্ট ছিলেন। রামমোহন রায় মনে করতেন, এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ইংরেজি ভাষার বিকাশ ঘটলে জনমানসের মধ্যে বিরাজমান তাঁদের চিরায়ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে এবং তাদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের সূচনা হবে। অন্যদিকে, হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহী ছিল নেহাত জাগতিক কারণে; যাতে তারা সরকারি সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে। বলতে হয় দুই পক্ষের প্রচারণার ফলে ইংরেজি শেখার জন্য কলকাতার হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।[৩০] মূলত তাদের আগ্রহের ফলে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ[৩১] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অচিরেই কলেজটি একটি জনপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জে. সি. মার্শম্যান হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে বাঙালির উন্নতির জন্য প্রথম জাতীয় সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করেন।[৩২] বস্তুত হিন্দু কলেজ হয়েছিল হিন্দুদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য একটা বিরাট হাতিয়ার।[৩৩]

১৮১৭ সালের জুলাই মাসে স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[৩৪] এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্কুলে উন্নতমানের পুস্তক উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে সরবরাহ করা। সোসাইটিতে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃতি, হিন্দু, ফার্সি এবং আরবি প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। সরকারি অর্থ সাহায্য ছাড়াই ১৮২১ সালে সোসাইটি বিভিন্ন বিষয়ের ১,২৬,৪৪৬ খানা প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করে। এ বছর থেকে সরকার অর্থ অনুদান দেওয়া শুরু করে।[৩৫] বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান দুটি প্রশংসনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৬] শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি অনুদান বিতরণের জন্য ১৮২৩ সালে কলকাতায় 'General Committee of Public Instruction' নামে একটি শিক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল "Devising measures with a view to the better instruction of the people, to the introduction among them

---

৩০. J. C. Marshman, *Life and Time of Carcy*, Marshman and ward, London, 1859) vol. 11, p. 119.

৩১. কলেজটি ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে চালু হয়। সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।

৩২. K. C. Mitra, *The Hindoo College and its Founder*, in P. C. Mitra, *op. cit.*, Appendix B, xxx.

৩৩. *First Report of the Calcutta School- Book Society*, Calcutta, 1818, p. vi.

৩৪. প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। ১৮১৭-১৮ সালে প্রথম ব্যবস্থাপক কমিটি গঠিত হয়। যার সদস্যরা হলেন– পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও তারিণীচরণ মিত্রের মত হিন্দু নেতৃবৃন্দ। মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল মৌলভি আমানউল্লাহ্ এবং মৌলভি করম আলী, মৌলভি আবদুল ওয়াহিদ ও মৌলভি আবদুল হামিদের মতো বিশিষ্ট ফার্সি ও আরবি পণ্ডিতবর্গ। বড় লর্ড হেস্টিংস ও তাঁর মন্ত্রী ছিলেন পৃষ্টপোষক। বেশ কিছু হিন্দু মুসলিম জমিদার ও ব্যবসায়ী সোসাইটিকে অনুদান দিয়েছেন। ১৮১৮ সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সালাউদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮।

৩৫. ১৮২৩ সালের এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির আবেদনক্রমে সরকার স্কুল সোসাইটিকে মাসিক ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

৩৬. *Bengal Public Consultation*, no. 5, 23 April 1823; সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮-২৯।

of usefull knowledge and to the improvement of their moral character."[৩৭] সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি মতামত প্রদান করেন এবং সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার জন্য তহবিল ব্যয় করে এবং ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়।[৩৮]

১৮৩০ সালে জুলাই মাসে লন্ডনের সোসাইটি ফর ডিফিউশন অফ ইউজফুল নলেজ এ মর্মে অনুমতি দেওয়া হয় যে, এখন থেকে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এ প্রতিষ্ঠানের পুস্তকসমূহ পুনর্মুদ্রণ করতে পারবে। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ১৮৩২ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত সভাপতি স্যার এডওয়ার্ড বায়ান লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে অবহিত করেন যে, হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র সোসাইটির নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কয়েকটি সুপরিচিত ইংরেজি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেছে। জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যই তারা এ কাজটি করছেন।[৩৯]

ব্রিটিশ শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতির ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজ শাসনকে হিন্দুরা স্বাগত জানিয়েছিল। অন্যদিকে, মুসলমানরা একে বিপর্যয় ভেবে পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারেনি। এর ফলে তাদের অবস্থার চরম অবনতি ঘটে, যা কাটিয়ে উঠতে তাদের বহুযুগ অপেক্ষা করতে হয়। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক ও ব্যবধান বেড়ে যায় অনেকখানি।[৪০] শিক্ষা হচ্ছে মাপকাঠি যার সাহায্যে একটি সম্প্রদায়ের উন্নতি-অবনতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শিতা ও সামাজিক অবস্থা বোঝা যায়। ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছিল তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন কাল থেকে জ্ঞানচর্চার একটা প্রথা চলে আসছিল এবং ভারতীয়দের উপর এর স্থায়ী ও কার্যকর প্রভাব ছিল।[৪১] মুসলিম শাসনামলে বাংলার মুসলমানগণ শিক্ষা-দীক্ষায় তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিলেন। মুসলমানরা শিক্ষাকে ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গস্বরূপ মনে করতেন। শাসক, উলামা, সুফি, আমির-ওমরাহ ও মুসলিম জমিদারগণ শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করতেন। বাংলার মুসলিম শাসকগণ কলা, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য এবং

---

৩৭. *Report of the Education Commission*, 1881 (CHAP. 2), Calcatta, p. 16.
৩৮. Austin A D'souza, *Anglo-Indian Education,* A Study of its Origins and Growth in Bengal upto 1960, Oxford University Press, Delhi, 1976, p. 67.
৩৯. Sir E. Rayan to Lord William Bentinck, 29 January, 1832, Bentinck Papers.
৪০. মুসলিম বিচ্ছিন্নবাদী মনোভাবের সূত্রপাত হয় এ সময়ে। ফলে বিশ শতকে প্রবলভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪, ৩৫।
৪১. Sufia Ahmad, *Muslim Community in Bengal,* Dacca, 1974, p. 4.

স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৪২] প্রত্যেক পরগণার কসবা বা গ্রামে মাদ্রাসা, মসজিদ ও মক্তব নির্মাণ করা হত। তখন শিক্ষা ছিল মূলত মসজিদ কেন্দ্রিক। সমগ্র দেশে এমন কোন মসজিদ ছিল না যাকে কেন্দ্র করে মক্তব বা মাদ্রাসা গড়ে ওঠে নি।[৪৩] প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মক্তব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলো মাদ্রাসা নামে পরিচিত হত।[৪৪] প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়সহ শিক্ষার সকল স্তর ছিল অবৈতনিক। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার বেতন দিতে হত না।[৪৫] মুসলিম শাসক, জমিদার ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ লাখেরাজ (নিষ্কর) ভূমি দান করে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন।[৪৬] ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার সময় সুমলমানদিগকে ১৫ প্রকার নিষ্কর ভূমি বা এক চতুর্থাংশ (¼) অংশ দানের প্রমাণ পায়[৪৭]; যা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত। প্রতিটি গ্রামপ্রধান নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন।[৪৮] শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি-ফারসি। তবে সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। রাজপদ লাভের জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ফারসি ভাষায় শিক্ষা লাভ করতেন। সতেরো আঠারো শতকের দিকে উত্তর ভারত থেকে শাসক শ্রেণির মৌখিক ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার প্রচলন হয়; এবং তা আরবি-ফারসির পাশে স্থান করে নেয়। মাতৃভাষা হিসেবে মুসলমানরা বাংলা ভাষা এবং হিন্দুরা ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে সংস্কৃতির চর্চা করতেন। ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাংলায় মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতুষ্পাঠীতে এ পাঁচটি ভাষার চর্চা করা হত।[৪৯] রাজভাষা ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ফারসি ছিল প্রিয় ভাষা, ফারসি বুঝতে সহজ, মুসলিমরা তাদের রুচি অনুযায়ী সাহিত্য পেতেন এবং তাঁদের সন্তানদিগকেও ফারসি শিক্ষা দিতেন।[৫০] প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তর– শিক্ষার এ তিনটি স্তর ছিল। ফারসি মাদ্রাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে ন্যায়শাস্ত্র, জোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, আইনশাস্ত্রসহ ইসলামের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেয়া হত। ফারসি মাদ্রাসায় ব্যাকরণ, চিঠিপত্র লিখন, অলংকারশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানো হত। সে সময়ের শিক্ষার প্রশংসা করে ইংরেজ পণ্ডিত জেনারেল শ্লীমান মন্তব্য করেন, "ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে

---

৪২. আব্দুল করিম (অনু. মোকাদ্দেসসুর রহমান), *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭৪-৮৯; A. K. M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh* (Down to A. D. 1980), Dhaka, 1983, p. 13.

৪৩. M. Mohar ALi, *History of the Muslims of Bengal*, vol. IB, Riyadh, 1985, p. 827.

৪৪. A. K. M. Ayub Ali, *op. cit.*, p. 15.

৪৫. Mohar Ali, *op. cit.*, p. 838; A. K. M Ayub ALi. *op. cit.*, p. 14; মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি* (১৮৮৫-১৯২১), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭ পৃ. ভূমিকা-১।

৪৬ A. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and Muslim in Bengal (1757-1856)*, Dacca, 1961. p.150; Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education* (1765-1855), Dacca, 1973, p. 11.

৪৭. এম. এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৯; মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ভূমিকা-১।

৪৮. A. K. M Ayub Ali. *op. cit.*, p. 15.

৪৯. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪৭২।

৫০. Mohammed Shah, *In Search of an Indentity: Bengali Muslims 1880-1940*, Calcutta, 1996, p. 82; এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৯-৬০।

শিক্ষার যেরকম অগ্রগতি হয়েছে পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরকম প্রসার হয়েছে। ... একজন শিক্ষিত মুসলিম যুবক অনর্গল সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, হিপোক্রটিস?, গেলেন ও ইবনে সিনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে।"[৫১] স্কটিস মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডামের তিনটি রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) থেকে বাংলায় ফারসি শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর তিনটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শুধু মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহূত জেলায় ফারসি মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৭৪২টি।[৫২]

সে সময় শিক্ষকতা অত্যন্ত পছন্দনীয়, শখের এবং মর্যাদার পেশা ছিল। রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল ব্যতীত অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন-ভাতা নিতেন না। শিক্ষকরা শিক্ষাদানকে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করতেন। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচার করে শিক্ষকগণই শিক্ষার্থীকে সনদ দিতেন। বাংলার মুসলিম শিক্ষার প্রশংসা করে এ. এম. ই. সি. বেইলি মন্তব্য করেন,

> They (Muslims) possessed a system of education which; we have abolished, was capable of affording a high degree of intellectual training and polish, was founded on principle not wholly unsound, though presented in an antiquated form; which was infinitely superior to any other system of education than existing in India-a system which secured to them an intellectual as well as material supremacy… .[৫৩]

উইলিয়াম হান্টারের (১৮৪০-১৯০০) বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হান্টারের ভাষায়:

> Before the country passed to us, they were not only the political but the intellectual power in India… During the first seventy-five years of our rule, we continued to make use of this system as a means for producing officers to carry out our administration.[৫৪]

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতায় আসার পর বাংলার সার্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসঙ্গটি একটি জটিল রূপ ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে প্রদীপ সিনহা বলেছেন, "The question of Muhammadan learning presents a variety of facets, some of which are of fascinating complexity."[৫৫] কোম্পানি সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিশেষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কলকাতাবাসী যে নব্য জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, তাদের

---

৫১. S. M. Ikram, *History of Muslim Civilization in India and Pakistan*, Lahore, 1965, p. 469.
৫২. J. Long, Adam's, *Reports on Vernacular Education in Beugal & Bihar,* Submitted to Government in 1835, 1836, 1838, 1868, p. 153-160.
৫৩. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans,* Lahore, 1964, p. 133.
৫৪. *Ibid.*
৫৫. Pradip Sinha, *Ninteenth Century: Aspect of Social History*, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1965, p. 50.

জমিদারি এলাকায় অনুপস্থিতির ফলে ভূমিতে নানা প্রকারের মধ্যস্বত্বভোগীর অভ্যুদয় ঘটে। এ সময় ভূমিতে নির্ধারিত করের বাইরেও জমিদারদের ভোগ-বিলাসের জন্য বাড়তি অর্থ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অন্যায় অর্থ আদায়ের ফলে রায়তদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। আর এই রায়তদের গরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলিম।[৫৬] মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বরাদ্দকৃত লাখেরাজ সম্পত্তির আয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। অনেক সময় ভূস্বামী ও অভিজাত শ্রেণি শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। একে তাঁরা এক রকমের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে গণ্য করতেন। কিন্তু কোম্পানি আমলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কোম্পানি আমলের শুরু থেকেই মুসলিম শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার এবং ভূ-স্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কিত নতুন নতুন আইন তৈরির ফলে বাংলার পুরোনো অভিজাত মুসলিম পরিবারের প্রায় ৯৮% নিষ্কর ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাঁদের সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও অপমৃত্যু ঘটে।[৫৭] মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডাম সরকারের পক্ষে তদন্ত কার্য পরিচালনা করে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শিক্ষকের বেতন খুব কম, তাঁরা অদক্ষ এবং শিক্ষার মান অত্যন্ত নিচু; বড় বড় মুসলিম জমিদারদের বিপর্যয়ের ফলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫৮] কোম্পানি শাসনের অভিঘাত প্রসঙ্গে ডব্লিউ হান্টার বলেন, "Hundreds of ancient families were ruined, and the educational system of the Musalmans, which was almost entirely mainrained by rent-fee grants, received its death-blow."[৫৯]

একদিকে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ অন্যদিকে কোম্পানি সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যয় বহুল হওয়ায় দরিদ্র মুসলমানদের পক্ষে এই শিক্ষা গ্রহণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অবশ্য আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও মুসলমানগণ প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহ্য কিছুটা বজায় রাখতে সক্ষম হয়, কিন্তু মাদ্রাসা ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ভার বহন করতে পারেনি। ফলে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে পড়ে। বলা হয় যে, বাংলায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যুদ্ধ, ব্যবসা, রাজস্ব, বিচার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে প্রথম দিকে প্রায় অর্ধশতকের অধিককাল, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষার প্রতি কোনো রকম দৃষ্টি

---

৫৬. মোহাম্মদ শাহ, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সংস্কৃতিক ভিত্তি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭২৯; মোঃ আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পটভূমি-৩।

৫৭. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পটভূমি ৩-৪।

৫৮. Long, J., *Adam's First Report on the state of Education in Bengal*, 1835, pp. 19-20, 194.

৫৯. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 139.

দেয়নি। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিক্ষার সুযোগ হ্রাস পেতে থাকে। এ সময়ে ব্রিটিশ নীতি ছিল: "To leave the traditional modes of instruction undisturbed and to continue to them the support which they had been accustomed to receiving from the Indian rulers."[৬০] ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মনে করত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলে ভারতের সমাজ ও প্রচলিত ধর্মে আঘাত লাগবে; দেশবাসী এতে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়বে। এছাড়া শিক্ষার প্রসার ঘটলে তাদের মধ্যে স্বাধীন মতামত গড়ে উঠবে এবং তারা আত্মসচেতন হয়ে উঠবে। ফলে ব্রিটিশ শাসনক্ষমতা হুমকির সম্মুখীন হবে।[৬১] তাদের ধারণা ছিল শিক্ষা বিস্তৃতির ফলেই আমেরিকা ব্রিটিশ হস্তচ্যুত হয়েছে।[৬২] এটা দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা হয় যে, শিক্ষার প্রসারে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হলে আত্মজাগরণ ও মুক্তি আন্দোলন হবে, যার পরিণতি ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত হবে। কিন্তু একটি দেশ ও জাতিকে চিরকাল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না; তাছাড়া সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন পরিচালনার জন্য দেশীয় জনগণকে শিক্ষিত করা জরুরি হয়ে পড়ে।[৬৩] এরকম অনুভূতি থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় বাংলায় বেসরকারি পর্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় মিশনারিদের অবদান ছিল ব্যাপক। একজন বিবেকবান খ্রিস্টান বলেছিলেন, অন্ধকার দূর করার জন্য আলো প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রদেশে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার আলো প্রবেশ করাতে হবে। এ ব্যবস্থায় বিজিত জাতি বিজেতার কাছে এসে একত্র হবে। গোঁড়ামিও অনেকাংশে চলে যাবে। ফলে তারা নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে পারবে। খ্রিস্টান ধর্মের ক্রমপ্রভাবে তাদের পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কার বিলুপ্তি ঘটবে।[৬৪] বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে প্রথম কৃতিত্বের দাবিদার মিশনারিরা। বেসরকারি উদ্যোগে তারা সাংগঠনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস নিয়েছিলেন। বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে মিশনারিদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় 'The Society for Promoting Christian Knowledge' (SPCK)[65] এবং 'The free School Society' ইত্যাদি সংগঠনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সুইডিস পাদ্রী Zacharich Kierhand আঠারো শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ভারতীয় ও ইউরোপী

---

৬০. সুফিয়া আহমেদ (অনু. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ), *বাংলার মুসলিশ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪।

৬১. Syed Mahmood, *A History of English Education in India* (1781-1893), MAO College, Aligarh, 1895, p. 2.

৬২. মৌলানা নূর মোহাম্মদ আযমী, 'ইংরেজী শিক্ষা গোড়ার কথা', *মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, পৃ. ৪৫৮; মো. আব্দুল্লাহ আল-সাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪; আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬।

৬৩. ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৮।

৬৪. সিলেক্ট কমিশন (এইচ. সি.), ১৮৩১, পৃ. ৩৮৯; ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৭।

৬৫. The Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) ছিল একটি যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক খ্রিস্টান দাতব্য সংস্থা। Thomas Bray কর্তক ১৬৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বব্যাপী খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার প্রসার এবং শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে। আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে বাংলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

ছেলেদের বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি স্কুল খোলেন।[৬৬] একই শতকের শেষপাদে পাদ্রী মি. আর্চার এবং মি. ব্রাউনও কলকাতায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে প্রয়াস নেন। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ খ্রিস্টব্দের মধ্যে তাদের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়। ধর্ম প্রচারের কৌশল হিসেবে তারা বিনামূল্যে স্থানীয়দের মধ্যে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান।

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে পাদ্রী উইলিয়াম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি ১৭৯৩ সালে বাংলায় আসেন এবং স্কুল স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করেন এবং বাংলাভাষায় প্রচুর বইপত্র প্রকাশ করেন।[৬৭] তিনি চার্লস গ্র্যান্ট প্রমুখকে নিয়ে ১৭৯৩ সালে অক্টোবরে 'ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৮] কেরীর সমসাময়িক সময়ে জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭), উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ বাংলায় আগমন করেন। তারা ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনের গোড়া পত্তন করেন।[৬৯] তখন পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো আইন তৈরি না হলেও ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়েলসলি মিশনারিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। তিনি কেরীকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করেন। এ অবস্থায় ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চেতনা জাগে এবং ১৮১৩ সালে ২০ বছর মেয়াদি সনদ লাভের সময় কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষাদানের জন্য সর্বপ্রথম বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন লাভ করে। সাথে সাথে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানিকে মিশনারিদের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার নির্দেশ দেন।[৭০] এর পর থেকে মিশনারিদের কর্মতৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা সরকারি-বেসরকারি সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৮ সালের মধ্যে তাঁরা কলকাতা, ঢাকা, হাওড়া, চুঁচড়া, চব্বিশ পরগণা, যশোরসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮০টি স্কুল স্থাপন করেন। সেগুলোর মোট শিক্ষার্থী ছিল ১৩,৩৪৭ জন।[৭১]

উল্লেখ্য যে, ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ আইনে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও ১৮২৩ সালে 'General Committee of Public Instruction' বা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ এক লক্ষ টাকার সুষ্ঠু ব্যয় সম্ভব হয়নি। হোরেস হেম্যান উইলসন

---

৬৬. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিশ সাধনা*, প্রথম খণ্ড, রাজশাহী, ১৯৬১, পৃ. ৮-৯; মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫।

৬৭. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।

৬৮. এ সকল শিক্ষাবিদ মিশনারিগণ 'Evangelist' (ইভানজেলিস্ট) নামে পরিচিত ছিলেন। তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল লন্ডনের ক্ল্যাপহ্যাম স্ট্রীটে। এজন্য এ গোষ্ঠীকে 'Clapham Sect'-ও বলা হয়। Percival Spear, *India, Pakistan and West*, London, 1952, p. 158.

৬৯. Mohammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christion Missionary Activities (183-1857)*, Chittagong, 1965, p. 2.

৭০. মোহাম্মদ আজজিুল হক (অনু : মুস্তফা নূরুল ইসলাম), *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, ঢাকা, পৃ. ১০; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭৪; মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পটভূমি ৬।

৭১. সুনীল কুমার চ্যাটার্জী, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন*, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২০।

এর পরিচালক নিযুক্ত হয়ে বিচারপতি এডওয়ার্ড হাউড ইস্টকে নিয়ে ঐ এক লক্ষ টাকার বেশির ভাগ টাকা বেসরকারি হিন্দু কলেজের জন্য ব্যয় করেন। ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হয়। এই দুটি প্রতিষ্ঠান ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রেখেছিল। উল্লেখ্য যে, মিশনাররিদের শিক্ষা কার্যক্রম দ্বারা যেমন মুসলমান শিক্ষার্থীদের কোনো উপকার হয়নি, তেমনি সরকারি প্রয়াসে পরিচালিত হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের দ্বারাও উপকার হয়নি। মিশনারি বিদ্যালয়গুলোতে বিনা পয়সায় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও ধর্মীয় কারণে এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠগ্রহণে মুসলমান পরিবারের সন্তানদের পাঠানো হতো না। অন্য দিকে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের দ্বার মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য রুদ্ধ ছিল।[৭২] ফলে উপরে বর্ণিত শিক্ষা কার্যক্রমে সুফল হিন্দু সমাজ নিজেদের ঘরে তুলতে সক্ষম হলেও এর দ্বারা মুসলমানদের কোনো উপকার হয়নি। এ কারণেই মহারাজ নবকৃষ্ণ (১৭৩৩-১৭৯৭), জয়নারায়ণ ঘোষ (১৭৫২-১৮২০), রামপ্রাসাদ মিত্র প্রমুখ ইংরেজি জানা বাঙালিদের পরিচয় পাওয়া গেলেও সমকালে কোনো মুসলিম বাঙালি ইংরেজি জানা মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না।[৭৩]

ইংরেজি শিখে, ইংরেজদের সন্তুষ্ট করা ‘নানা রকম মর্যাদায়’ ভূষিত হওয়া সুযোগের সন্ধানে সূচনা থেকেই হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার চর্চা শুরু করেন। ফলে হিন্দুদের সাথে ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ অভিন্ন হয়ে পড়ে; ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দুদের বন্ধুত্ব লাভ করে। সরকার হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যে দৃষ্টি দেয়। চার্লস গ্রান্ট, আলেকজেন্ডার ডাফ বাংলার জনসংখ্যাকে হিন্দু জনসংখ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৪] এ সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিক এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৪৪) মন্তব্য করেন “It is a historical fact that a very large section of the Hindu community welcomed the advent of the English Power.”[৭৫]

পূবেই বর্ণিত হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য কোম্পানি সরকার ১৮২৩ সালে ‘General Committee of Public Instruction’ গঠন করেন। জন হার্বাট হ্যারিংটন এর সভাপতি এবং হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৩) এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উক্ত কমিটিকে ১৮৩৩ সালে শিক্ষা বাবদ দশ লক্ষ টাকা খরচ করার অনুমতি দেয়। উক্ত টাকা কীভাবে ব্যয় হবে তা নিয়ে কমিটির দশজন সদস্য একমত হতে পারেননি। কমিটির পাঁচ সদস্য প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার পক্ষে এবং বাকি পাঁচ সদস্য পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে তাঁরা সবাই একমত প্রকাশ করেন যে, এ দেশে

---

৭২. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭৮-৭৯।
৭৩. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজ*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৬৬।
৭৪. ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯২-১৯৩।
৭৫. M. N. Roy, *India in Transition*, Calcutta, 1941, p. 17.

প্রথম শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে এবং পরে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

উক্ত কমিটির প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকগণ মনে করেন যে, ভারতীয়দের জন্য তাদের প্রাচীন শিক্ষা বজায় রাখা উচিত এবং এ শিক্ষার সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় কিছুটা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তারা উপকৃত হবে। পাশ্চাত্যপন্থিগণ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৭৬] এ সময় ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার এবং শিল্প শহরের ধনপতিরাও সরকারকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। তারা সরকারকে অবহিত করেন যে, ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটলে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জীবন ধারায় অভ্যস্ত হবে এবং ভারতে ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য বেশি বিক্রি হবে। এ সময় দেশীয় লোকদের মধ্যে বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজ ইংরেজ জাতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন ছিল। মেকলে ছিলেন ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতি।[৭৭] তিনি এদেশের উচ্চ শ্রেণির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি দুটি যুক্তি দেন; প্রথমত, উচ্চ শ্রেণিকে শিক্ষা দিলে তাঁরা পরে নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ করে নিবে, এটাই মেকলের 'ফিলট্রেশন থিওরি' বা 'অভিসচেতন তত্ত্ব' নামে খ্যাত। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি হবে। এতে ভারতীয়দের মধ্যে এমন এক শ্রেণি তৈরি হবে যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় হলেও চিন্তাধারা, নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে পড়বে। তারা সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে অনুগত্য বজায় রাখবে। মেকলে তাঁর বাবাকে লেখা চিঠিতে আরও যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি চিঠিতে বলেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করি তা হলে ত্রিশ বছর পরে বাংলাদেশে কোন পৌত্তলিক থাকবে না।"[৭৮] উল্লেখ্য, তিনি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার কথা ইঙ্গিত করেছেন। মেকলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শুধু ইংরেজি শিক্ষা খাতে সরকারি অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়।[৭৯] এই সরকারি সিদ্ধান্তও হিন্দু সমাজের স্বার্থানুকূল হয়েছিল। কেননা তারা ইতোমধ্যেই এই শিক্ষা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে হিন্দু সমাজের আগ্রহ ইতোমধ্যেই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। রামমোহন মনে করতেন যে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে বাঙালি সমাজ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাবধারার সাথে পরিচিতি

---

৭৬. A. R. Mallick, *op. cit.*, p. 224-231.
৭৭. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পটভূমি ৮।
৭৮. A. R. Mallick, *op.cit.*, p.168; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭৯।
৭৯. *Ibid*, p. 202.

লাভ করবে। এর ফলে তারা চিরায়ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুর্নজাগরণ ঘটবে। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে এমন অনুরাগী ছিলেন যে, উইলসনের পরামর্শে বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮ খ্রি.) সরকারি অর্থে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। রাজা রামমোহন রায় এর প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের নিকট একটি প্রতিবাদলিপি পেশ করেন এবং সরকারি অর্থে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্প্রসারণের দাবি জানান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সরকার ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এদেশীয় হিন্দুদের তুষ্টি বিধানের জন্য সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শিক্ষার ক্লাস খোলা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হলেও তখন পর্যন্ত মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাই ছিল একমাত্র ভরসা। তবে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষাও যে তখন চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল সে কথা সর্বজনবিদিত। অনেকেই মনে করেন, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি সাধারণভাবে মুসলমানদের মনোভাব ছিল নেতিবাচক। যারা তাদের হাত থেকে রাজ ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, তাদের প্রতি তাদের ছিল অসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ফলে ইংরেজদের প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা উৎসাহী হয়নি, তাদের দ্বারা আনীত ভাবধারাও তারা গ্রহণ করেনি। বিনয় ঘোষ বলেন যে, আরবি, ফারসি ও মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের প্রায় অন্ধ অনুরাগ ছিল।[৮০] এ অভিযোগের কিছুটা সত্যতা আছে বৈকি। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এ যাবৎ কোম্পানি সরকার বা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের উৎসাহিত বা তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির কোনো প্রয়াস ছিল কী-না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ পরিচালনায় সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি ক্লাস খোলা হয়। কিন্তু কলকাতা মাদ্রাসার অবস্থা তখন পর্যন্ত কী ছিল? ১৭৮১ সালে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে একে নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়, মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে নানা পরিবর্তন আনা হয়। কিন্তু এর পাঠ্যসূচিতে তেমন উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়নি। শেষপর্যন্ত ১৮২৯ সালে সেখানে একটি ইংরেজি ক্লাস খোলা হয় এবং এ বছরই এর ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২ জনে। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কলকাতা মাদ্রাসায়ও নানা প্রতিকূলতা ছিল।[৮১] তাদের পাঠ্যসূচিতে এসব অসুবিধা সত্ত্বেও ১৮৩০, ১৮৩১ ও ১৮৩৩ সালে পরিচালিত পরীক্ষায় তাদের সাফল্য ইংরেজ সাহেবদের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।[৮২] ১৮৩৫ সালে কলকাতা মাদ্রাসার

---

৮০. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা ২০০০, পৃ. ১৮১
৮১. শিক্ষকের অপ্রতুলতা, এবং পাঠ্যসূচি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। অন্যদিকে তখন হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষার মান ছিল অনেক উন্নত।
৮২. Azizur Rahman Mallick,, *op.cit,* p, 214

ইংরেজি ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩১ জনে। কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজি ক্লাসে ছাত্র সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এবং পরীক্ষায় তাদের প্রশংসাব্যঞ্জক ফলাফল পর্যালোচনা করলে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের বিরাগ ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের আগ্রহের আরো দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ১৮২৪ সালে মুর্শিদাবাদ হাউসের (নবাব পরিবার) এবং স্থানীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সেখানকার ইংরেজ প্রশাসকের নিকট একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। প্রায় একই সময় ঢাকা শহরের মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহের কথাও জানা যায়। তখন তারা বিশপ হেবারের কাছে তাদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহের কথা বলেছিলেন এবং এ শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে চেয়েছিল।[৮৩] কিন্তু তখন কিছুই করা হয়নি। কাজেই মুসলমানরা সংস্কার বা বিরাগবশে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি এরূপ ঢালাও মন্তব্য করা তাদের প্রতি অবিচারেরই শামিল।

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি আরম্ভ হয়েছিল যখন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রি.) বড়লাটের দায়িত্ব নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন উদার নীতির অনুসারী, তবে পাশ্চ্যবিদ্যার সমর্থক। তিনি ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ কেবল ইংরেজি শিক্ষায় ব্যয়ের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে প্রাচ্য নয়, বরং কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিবে। সরকারের এরূপ সিদ্ধান্ত আকস্মিক ছিল না। বস্তুত ইতোমধ্যে হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করায় তারা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি শিক্ষা এবং রাজভাষা হিসেবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালুর দাবি জানাতে শুরু করে। ১৮২৮ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতার একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ দাবি জানানো হয়। পরবর্তীকালে একই পত্রিকায় সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে ফারসি নয়, বরং ইংরেজিকে যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি করার জন্য সরকারের কাছে দাবি করা হয়।[৮৪] রাজা রামমোহন রায়, নব্য শিক্ষিত "ইয়ং বেঙ্গল"[৮৫]- এর পক্ষ থেকেও ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে জোর দাবি জানানো হয়। কেবল এ দেশীয় হিন্দুই নয়, এ সময় ব্রিটিশদের মধ্যেও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। সময়ের দাবি মেনে নিয়ে প্রাচ্যবাদী ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের বিষয়টি সমর্থন করলেও তারা পাশাপাশি ভারতীয়দের জন্য তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা বজায় রাখার পক্ষে মত দেন। কিন্তু পাশ্চাত্যবাদীরা প্রাচ্য নয়, কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষেই মত দেন। কোম্পানি কর্মকর্তারাও এসময় বুঝতে পারেন যে,

---

৮৩. R. Heber, *Narrative of a Journey through the Upper provinces of India from Calcutta to Bombay, 1824-25; with an account of a journey to Madras and Southern India*, III, London, 1828, pp. 297-298

৮৪. R C Majumadar, *Glimpses of Bengal in 19th Century*, Calcutta, 1960, pp. 23, 28, 32, 48

৮৫. হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিষ্যগণ ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত ছিল। এ কলেজের ছাত্ররা ডিরোজিওর পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মুক্ত-বুদ্ধির চর্চা ও ভাল-মন্দ বিচারের শিক্ষা এবং জ্ঞান লাভ করেন।

বেসরকারি পর্যায়ে যেভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটছে এরপর সরকারের এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকা সমীচীন নয়। এসময় ম্যানচেস্টার ও অন্যান্য শিল্প শহরের নব্য ধনপতিরাও সরকারকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য চাপ দেন। কারণ তারা মনে করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জীবনধারায় অভ্যস্ত হলে এদেশে তাদের শিল্প পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে। আর সরকারি প্রশাসনে কম বেতনে ইংরেজি শিক্ষিত স্থানীয় লোক নিয়োগ করা গেলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে– এ প্রত্যাশায় কোম্পানি সরকারের অনেক রাজপুরুষই ইংরেজি শিক্ষার চালুর পক্ষে অবস্থান নেন। প্রসঙ্গত তারা এসময় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাঙালিদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথাটিও বিবেচনায় নেন।[৮৬] বাঙালিদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখে খ্রিস্টান মিশনারীদের মধ্যেও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও ফারসির স্থলে ইংরেজিকে রাজভাষা করার দাবি করে। তাছাড়া জেরেমি বেন্থামের (১৭৮৪-১৮৩২ খ্রি.) হিতবাদী দর্শনের অনুসারীরাও (যারা ব্রিটেনে উপযোগবাদী নামে খ্যাত) ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকেন।[৮৭] জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) সরকারের নিকট লিখেন, "... a utilitarian, should not be to teach Hindu or Muhammadan learning, but useful learning."[৮৮] বেন্থাম ১৮২৯ সালে গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিংকে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুমোদনের জন্য আহ্বান জানান।[৮৯]

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে ১৮৩৪ সালে সুপ্রিম কাউন্সিলের আইন উপদেষ্টা লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকেলে (১৮০০-৫৯ খ্রি.) কোম্পানি সরকারের শিক্ষা পরিষদের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ঘোরতর পাশ্চাত্যবাদী।[৯০] তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণে পাশ্চাত্যবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মেকেলে মনে করতেন যে, একটি ইউরোপীয় ভালো লাইব্রেরির এক সেলফের বইয়ের মূল্য ভারতীয় ও আরবি সাহিত্যের সমস্ত বইয়ের মূল্যের সমান। তিনি ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদানের অসারতা প্রকাশ করে মন্তব্য করেন যে,

> We are to teach false history, false astronomy, false medicine because we find them in the company of a false religion… And while we act thus, can we reasonably or decently bribe men, out of the revenues of the State, to waste their youth in learning

---

৮৬. এ আগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সি ই ট্রেভেলিয়ান। তিনি কলকাতায় ইংরেজি গ্রন্থের ক্রমবর্ধমান বিক্রির একটি হিসাব তুলে ধরে বাঙালি সমাজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেন। C. E Trevelyan, *On the Education of the People of India*, London, 1838, pp. 8-9

৮৭. P, Spear, `Bentinck and Education', *The Cambridge Historical Journal,* Vol. VI, 1938, pp. 83-84

৮৮. P. Spear, 'Bentinck and Education', *The Cambridge Historical Journal,* vol. VI, 1938-40, p. 83.

৮৯. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পটভূমি, পৃ. ৯।

৯০ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মেকেলের যেমন অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি ছিল, তেমনি প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি ছিল তাঁর অসীম অবজ্ঞা। তিনি মনে করতেন, একটি ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক সেলফ বইয়েরমূল্যমান ভারতীয় ও আরবি সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল্যের সমান, মো. আবদুল্লাহ আল-মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

how they are to purify themselves after touching an ass or what text of the Vedas they are to repeat to expiate the crime of killing a goat?[৯১]

১৮৩৫ সালে মেকলে প্রাচ্য শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে বেন্টিঙ্কের নিকট একটি Minute পেশ করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, ইংরেজি মাধ্যমে সকল ভারতীয়কে একযোগে শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারতীয়দের মধ্য থেকে এমন এক শ্রেণি সৃষ্টির প্রস্তাব দেন, যারা রক্ত, মাংস ও রঙে ভারতীয় হবেন, কিন্তু রুচি, চিন্তা-চেতনা, নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি-বৃত্তিতে হবে খাঁটি ইংরেজ।[৯২] তিনি প্রস্তাব করেন যে, নব্য এ শ্রেণির হাতেই ইংরেজি শিক্ষার ভার ন্যস্ত করতে হবে। আর এর মাধ্যমে শিক্ষা উপর থেকে নিচের দিকে চুঁইয়ে পড়বে এবং পর্যায়ক্রমে তা চারদিকে বিস্তার লাভ করবে। ইতিহাসে মেকেলের এ তত্ত্ব 'Filtration Theory' নামে পরিচিত।[৯৩]

আগেই বলা হয়েছে যে, বড়লাট বেন্টিঙ্ক ছিলেন পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থক। ১৮২৯ সাল থেকেই তিনি ইংরেজি শিক্ষা চালুর পক্ষে মত দিয়ে আসছিলেন। এবার মেকেলের Minute প্রাপ্তির পরপরই তিনি এটি গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ তাঁর বিখ্যাত শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় যে, এখন থেকে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ অর্থ ইংরেজি ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। তিনি প্রচার করেন:

> ... the great object of the British government ought to be the promotion of European Literature and science among the natives of India; and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone.[৯৪]

এর দুই বছর পর ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালু করা হয়। এর আগে ১৮২৬ সালে আদালতের নিম্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ ইংরেজি সার্টিফিকেটধারী ভারতীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার রীতি চালু করা হয়। ১৮৪৪ সালের ১০ই অক্টোবর হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারি সকল নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইংরেজি ভাষায় দক্ষদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৯৫] এতে উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টের সুপারিশ আগ্রাহ্য করা হয়। এ রিপোর্টে গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।[৯৬] বেটিঙ্কের ঐ সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতগণ[৯৭] জোর চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন।

---

৯১. B. D. Bhatt, J. C. Agarwal, *Educational Documents in india (1813-1968)*, New Delhi, 1969, P. 3.
৯২. John Clive, *Macaulay: The Shaping of the Historian*, New York, 1973, pp. 356-65
৯৩. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সহিত্যে মুসলিম সাধনা*, .পৃ. ১৫-১৬
৯৪. A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change (1818-1835)*, Leiden, 1965, p.189.
৯৫. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, Dacca, 1974, p. 5.
৯৬ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮০।

এদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজি বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় ও আইন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৩৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বিদ্যালয়টিকে ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা তদারকি ও পরিচালনার জন্য ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত General Committee of Public Instruction স্থলে Education Council গঠন করা হয়।[৯৮]

১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাংলার মুসলমান সমাজের স্বার্থানুকূল হয়নি। তাই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রাক্কালে কলকাতার আট হাজার মুসলমান সরকারের কাছে একটি প্রতিবাদপত্র জমা দেন।[৯৯] অনেকেই মনে করেন এটি ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা ও তাদের সংস্কারাবদ্ধ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। তাদের বক্তব্য মতে, মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা সংস্কারের সাথে আরবি ও ফারসি ভাষার নিবিড় সংযোগ ছিল। তদুপরি ফারসি ভাষা ছিল তাদের রাজভাষা। তাই এ ভাষা তাদের কাছে যেমন প্রিয় ছিল, তেমনি এ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণকে তারা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করত।[১০০] মাহাম্মদ আজিজুল হকের ভাষ্য অনুযায়ী, মুসলমানরা মনে করতেন তাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ইংরেজদের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ তাদের জন্য হবে প্রতিরোধবিহীন আত্মসমর্পণ।[১০১] আবদুল করিম মনে করেন, সময়ের পরিবর্তন অনুসরণে ব্যর্থ মুসলমানরা তাদের শিক্ষাপ্রণালীকে শ্রেষ্ঠ বলে তা আকঁড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করায় নতুন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।[১০২] উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পরিচালিত মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদী আন্দোলনের প্রবক্তারাও মুসলিম মানসকে প্রভাবিত করেছিল বলে কেউ কে মনে করেন। তাঁদের ভাষ্য মতে, এ আন্দোলনের সমর্থকরা ইংরেজি ভাষা ও বিদ্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে ঐ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকে হারাম বলে ফতোয়া দেন।[১০৩] বলাবাহুল্য যে, গ্রামীণ অশিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রভাব পড়েছিল। মীর মশাররফ হোসেনের লেখনীতেও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক মননের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।[১০৪]

---

৯৭. প্রাচ্যবাদী জেমস প্রিন্সেপ, মেকনাটেন জনশিক্ষা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এবং লে. কর্ণেল মরিস প্রতিবাদ জানান। কাজী আব্দুল মান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬; আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩।

৯৮ . এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১০৭

৯৯. Abdul Karim, *Muhammadan Education in Bengal*, Calcutta, 1900, p.3

১০০. W Adam, *Reports on the State of Education in Bengal*, Anath Nath Basu (ed.), Calcutta, 1941, pp. 156-157

১০১. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

১০২ . আবদুল করিম, 'মুসলমান সমাজের শিক্ষা' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ১৯৯

১০৩. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙলি মুসলমানের মুসলিম চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৮, ১২৩

১০৪. মনে করা হতো যে, ইংরেজি শিখলে ছোট খাট শয়তান হয়,নামাজ-রোজায় ভক্তি থাকেনা, আদব তমিজ থাকেনা। মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী*, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৩

আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের সংস্কার ছিল বটে কিন্তু তা অনেকটাই কোম্পানি শাসনের প্রথম দিককার বাস্তবতা, যখন ইংরেজি শিক্ষার মূল ব্যবস্থাপনা ছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে। কিন্তু ইতোমধ্যেই মুসলমানদের মনোভাবের যে কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছিল, তার প্রমাণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে যে, এ পর্যায়ে এসে তাঁরা ব্রিটিশ শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে কেন প্রতিবাদলিপি দিয়েছিলো? এক্ষেত্রে যে বিষয়টি তেমন কেউ আমলে নেননি, সেটি হলো মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যতটা না উৎকণ্ঠা ছিল, তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা ছিল নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে তাদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান কলকাতা মাদ্রাসার ভবিষ্যত সম্পর্কে। তাছাড়াও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য হিন্দু সম্প্রদায় যতটুকু প্রস্তুত হয়েছিল, নানা কারণে মুসলমান সমাজের সামগ্রিক প্রস্তুতি সে পর্যায়ে ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে সরকারের নানামুখী তৎপরতা থাকলেও মুসলমানদের ব্যাপারে তা হয়নি। মুসলিম পণ্ডিত আবুল ওয়াজেদ খাঁন চৌধুরীর মতে, মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনীহা ভাবের কারণ ইংরেজি ভাষার প্রতি তাদের ঘৃণা নয় বরং ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তাদের ধর্মীয় শিক্ষার অনুপস্থিতি। ইচ্ছে করলেই সরকার এ সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস ইত্যাদি নানা কারণে সরকার আদৌ এর প্রয়োজন মনে করেননি।[১০৫] অতএব বলা যায় যে, কেবল ইংরেজি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা নয় বরং শাসকগোষ্ঠীর বিদ্বেষী মনোভাব ও মুসলমানদের প্রতি তাদের অনাচার এবং সর্বোপরি দারিদ্র্যতার কারণে মুসলমানদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১৮২৯ সালে এ প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি বিভাগ খোলা হলে দেখা যায় যে, ইংরেজি পড়ার ব্যয় সংকুলানের সামর্থ্য মুসলিম ছাত্রদের নেই।[১০৬] এ প্রসঙ্গে A. R. Mallick এর মন্তব্য হলো:

> The obvious conclusion that suggests itself in respect of education under state patronage up to 1835 is that the Muslims who cared for education was not in any way prejudiced against receiving English or Western education, but that they had very limited opportunities of acquiring this education. The system and course of studies offered to them were defective and their only Institution was very badly managed and inefficiently run. Again, the early efforts of the company to educate the people were made in the city of Calcutta where the Hindus Predominated. The overwhelming Muslim majority districts of East and North Bengal did not receive

১০৫. আবুল ওয়াজেদ খাঁন চৌধুরী, 'ব্রিটিশ আমল ও মুসলিম সমাজ', মোহাম্মদী, ২২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৭, পৃ. ১৩৬
১০৬. A. R. Mallick, *op. cit.*, p.189.

> the much needed attention of the Government till very late. Another factor was the known poverty of the Muslims which made it impossible for them to educate themselves without adequate help from the Government. Without, it can also be said the policy of the ruling authorities was often faltering and, in most cases, though well-intentioned, it served to benefit the Hindus rather than the Muslims.[১০৭]

এ থেকে বুঝা যায় যে, ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে বাংলার মুসলমানদের কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাব থাকলেও ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা। আর্থিক সচ্ছলতা ছিল বলেই যুক্তপ্রদেশের মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হতে পেরেছিল।[১০৮] ১৮৫২ সালের ২৬ এপ্রিল সেসিল বেডন (Cecil Beadon) বলেছিলেন, মুসলমানদের এমন উপায় নেই যে, উচ্চ বেতন দিয়ে পড়াশুনা করবে।[১০৯] ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। এখানে স্বল্প বেতনে[১১০] মুসলিম ছাত্ররা ইংরেজি পড়ার সুযোগ পান। আর ১৮৫৬-৫৭ সালে ১৫৮ জন মুসলিম ছাত্র ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন।[১১১] তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এ সময় কলকাতা মাদ্রাসায় যে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করা হত, তার মান ছিল সাধারণ ও প্রাথমিক মানের। ফলে এখান থেকে ইংরেজি শিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থীরা কলেজের উচ্চশিক্ষিত শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারতেন না।[১১২] উপর্যুক্ত বাস্তবতার মধ্যে ১৮৩৭ সালে রাজভাষার পরিবর্তন এবং ১৮৪৪ সালে চাকুরির ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞানকে একমাত্র মাপকাঠি করা হলে মুসলমানরা চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত ফারসি অফিস আদালতের ভাষা থাকায় মুসলমানদের মধ্যে যারা নিম্নপদস্থ হলেও চাকুরিতে নিয়োজিত ছিল তারা চাকুরি হারিয়ে একবারে সর্বস্ব হারিয়ে ভিখারীতে পরিণত হয়।

কোম্পানি সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে ১৮৫৪ সাল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড প্রণীত একটি খসড়ার উপর ভিত্তি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। “Wood’s Education Despatch, 1854” নামে পরিচিত এ ডেসপাচকে অন্যতম মূল্যবান দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতে আধুনিক শিক্ষার ম্যাগনা-কার্টা হিসেবে প্রায়শই উল্লিখিত এ একশত অনুচ্ছেদ সম্বলিত দলিলটিতে ইংরেজি ও স্বদেশী উভয় ভাষায় শিক্ষার উন্নয়ন এবং এর সুদূরপ্রসারী

---

১০৭. *Ibid,* p.193.
১০৮. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৪৬।
১০৯. আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৭।
১১০. হিন্দু স্কুলের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ খরচ লাগত।
১১১. A. R. Mallick, *op cit.*, p. 253-55.
১১২. ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮০।

বিস্তার ভারত সরকারের জন্য পবিত্র কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষনীতিতে Filtration তত্ত্বের উপর নির্ভর না করে সরকারকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় নীতি গ্রহণ করতে বলা হয়। এছাড়াও প্রস্তাবে শিক্ষা প্রশাসনের জন্য একটি আলাদা বিভাগ গঠন; তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের (ঢাকা, মোম্বাই ও মাদ্রাজ) জন্য পৃথক তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; সকল প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট গঠন; পূর্বস্থাপিত সরকারি কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান এবং যখন প্রয়োজন তখনই নতুন স্কুল-কলেজ নির্মাণ; নতুন মিডল স্কুল প্রতিষ্ঠা, দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়, স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্যদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি প্রদান; এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অনুদান প্রদানের একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি প্রস্তাব করা হয়। এতে বলা হয় যে, উচ্চ পর্যায়ে ইংরেজি হবে শিক্ষার মাধ্যম, আর নিম্ন পর্যায়ে হবে দেশিয় ভাষা। অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা হবে ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শের উপর ভিত্তি করে।[১১৩] এছাড়াও এতে সরকারিভাবে প্রথমবারের মত নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১১৪]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়। উল্লেখ্য যে বাংলার উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নানা কারণে মুসলমানরা পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা এবং ভাবধারার সাথে আপোষ করতে না পারায় তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিনতাবাদী মানসিকতার জন্ম নিয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়র্ধে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। বলা হয় যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং এর মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসানের পর বাংলার মুসলমানদের মনোজগতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ রাজ সরকারও মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষী মনোভাব পরিবর্তন করতে শুরু করেন। ফলে মুসলমান সমাজে নবযাত্রা সূচিত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে মুসলিম সমাজ সেই পথে এগুতে শুরু করে। সংখ্যায় অল্প হলেও বাঙালি মুসলমান সমাজে পাশ্চত্য শিক্ষার প্রতিনিধিকারী কয়েকজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী অনুভব করেন যে, বিদ্যমান বাস্তবতায় ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ গ্রহণ না করতে পারলে জাতি হিসেবে মুসলমানরা আরো পশ্চাদগামী হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রতি মুসলমানসমাজে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁরা উদ্যোগী হন। তাদের প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করে। ফলে তাদের চিন্তা-চেতনায় নতুন রূপান্তরের সুচনা হয়।

---

১১৩. http://bn.banglapedia.org/index.php
১১৪. *Bengal Education Proceedings*, October, 1908.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের মনোজগতে রূপান্তরের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-৯৩) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[১১৫] তাঁর জীবনের কর্মপদ্ধতি প্রধানত তিনটি ধারায় বিকশিত হয়েছে। (১) মুসলিম সমাজে ইংরেজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, (২) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্যের সম্পর্ক তৈরি ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, এবং (৩) বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে মুসলিম সমাজের বাস্তব প্রতিবন্ধকতা সমূহের অপসারণ।[১১৬]

মুসলিম নেতাদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফই প্রথম বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন।[১১৭] সমকালীন মুসলিম সমাজের সমস্যা ও পরিস্থিতি তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার জন্য মুসলমানদের স্বাভাবিক অহমিকাবোধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে দায়ী করা হলে আবদুল লতিফ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মুসলিম সমাজের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার প্রকৃত কারণ হলো– এদেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এবং তদুপরি মুসলিমদের সাংস্কৃতি ঐতিহ্য ও তাঁদের আদর্শ চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ রেখে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সে অনুযায়ী ঢেলে না সাজানো।[১১৮] তাঁর মতে, মুসলিম সমাজে (১) আলেম সমাজ এবং (২) বৈষয়িক শ্রেণি– এ দুটি শ্রেণি আছে। আলেম সমাজ দরিদ্র হলেও তাঁরা সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী আরবি ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণে পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে, বৈষয়িক শ্রেণি আরবি অপেক্ষা ফারসি ভাষা শিক্ষাতে বেশি আগ্রহী; প্রয়োজনবোধে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণেও তাদের কোনো আপত্তি নেই।[১১৯] তবে শেষোক্ত শ্রেণি আর্থিক সংকটের কারণে যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, তা আবদুল লতিফের নজর এড়ায়নি।[১২০]

---

১১৫. নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.) ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজি ফকির মোহাম্মদ কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের একজন আইনজীবী ছিলেন। আবদুল লতিফ কলকাতা মাদ্রাসা থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে একই প্রতিষ্ঠানের এ্যাংলো-আ্যারাবিক বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়ে ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭০ ও ১৮৭৩ সালেও ঐ সভার সদস্য হন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সহযোগিতা করা, সরকারি চাকরিতে নিষ্ঠা ও দক্ষতা প্রদর্শন করা, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং শাসক শ্রেণির প্রতি পুরোমাত্রায় আনুগত্য স্বীকার করার জন্য আবদুল লতিফ ১৮৭৭ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নবাব', ১৮৮৩ সালে 'সিআইই' এবং ১৮৮৭ সালে ব্রিটিশ মহারানীর জুবেলি উপলক্ষ্যে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

১১৬. এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২৩।

১১৭. সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯।

১১৮. Enamul Haque (ed.), *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings & Related Documents*, Dacca, 1968, p. 190-191.

১১৯. *Ibid*, p. 24.

১২০. *Ibid*, p. 193.

তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নে আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তাঁর ধারণা, "ভারতে যদি কোনো ভাষা শিক্ষার্থীকে প্রকৃত সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে তাহলে সেই ভাষা হচ্ছে ইংরেজি।"[১২১] ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের মধ্যে শাসক এবং মুসলিম প্রজাকূল উভয়ের জন্যই মঙ্গল নিহিত বলে তিনি মনে করতেন। কারণ তাঁর মতে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে মুসলিম সমাজ সরকারের সদিচ্ছা ও নীতিসমূহ বুঝতে পারবে। ব্রিটিশদের শক্তি ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এতে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে। তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে না এবং কেউ তাদের ভ্রান্ত পথে নিতে পারবে না।[১২২] সর্বোপরি তারা চাকুরিসহ সরকারের দেওয়া সুযোগগুলো গ্রহণ ও কাজে লাগিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজে আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যে তিনি ১৮৫৩ সালে "How far would be the inculcation of European Sciences through the medium of English Language benefit Mohammedan students in the present circumstance of India and what are the most practicable means for imparting such instruction?" শিরোনামে ফারসি ভাষায় লিখিতব্য একটি সর্বভারতীয় রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন।[১২৩] এতে প্রবন্ধ রচনার জন্য ১০০ টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়। বোম্বাইর স্যার জামশেদজী জিজিবাই পারসি বেনেভোলেন্ট স্কুলের আরবি ও ফারসি ভাষার শিক্ষক মৌলবী সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ ওরফে আশরাফ আলী প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ লেখক ইংরেজি শিক্ষার যৌক্তিকতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১২৪]

মুসলমানদের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাটিতে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে নবাব আবদুল লতিফ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর দাবির প্রেক্ষিতে ১৮৫৪ সালে সরকার কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি-ফারসি বিভাগ প্রবর্তন করে এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।[১২৫] তিনি মুসলমানদের জন্য সরকারের নিকট উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ প্রদানেরও দাবি করেন। হিন্দু কলেজ ছিল উচ্চস্তরের ইংরেজি শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তবে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটিতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না। নবাব আবদুল লতিফ দাবি করেন যে, সরকারি অর্থে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকা সমিচীন নয়। তাঁর

---

১২১. Enamul Haque, *op. cit.*, p. 22.
১২২. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.
১২৩. Enamul Haque (ed.), p.193.
১২৪. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪।
১২৫. Enamul Haque, *op. cit.*, p. 192-193.

জোরালো এবং যৌক্তিক দাবির মুখে ১৮৫৪ সালে সরকার হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করে। ফলে এ কলেজে সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণির ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়।[১২৬]

১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের সংশ্লিষ্টতা ছিল অভিযোগ এনে বাংলার ছোটলাট স্যার এফ. হেলিডে বড়লাটের কাছে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আবদুল লতিফ বড়লাটকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, এরূপ অভিযোগ ভিত্তিহীন। ফলে তিনি ছোটলাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ১৮৬৭ সালেও কলকাতা মাদ্রাসাটি বন্ধ করতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে নবাব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় সে যাত্রায়ও তা সফল হয়নি। অধিকন্তু মাদ্রাসাটি সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য ১৮৭১ সালে বিচারপতি জে. পি. নরম্যানকে[১২৭] সভাপতি এবং আবদুল লতিফকে কর্মসচিব করে কলকাতা মাদ্রাসায় কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়।

হাজী মোহাম্মদ মহসিন[১২৮] (১৭৩২-১৮০৮) এর ওয়াকফকৃত ফান্ডের টাকায় হুগলি কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয় এবং এগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হয়।[১২৯] ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হুগলি কলেজ প্রথম থেকে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ছাত্রদের বেশি আকৃষ্ট করে। এ অবস্থা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে নবাব আবদুল লতিফ বলেন, "In justice to the endower, who was a Mohamedan ... his money should be laid out chiefly to the advantage of his co-religionists ..."[১৩০] আবদুল লতিফ বুঝতে পারেন যে, যদি মহসিন ফান্ডের টাকা শুধু মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় তাহলে তাদের উন্নতি হবে। এ ব্যাপারে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে ছোটলাট জে. পি. গ্রান্টের নির্দেশে আবদুল লতিফ হুগলি মাদ্রাসার শিক্ষার ব্যাপারে তদন্ত করে ১৮৬১ সালের ডিসেম্বরে রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ফারসি বিভাগ খোলা এবং মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেন।[১৩১] মহসিন ফান্ড সম্পর্কে তিনি সুপারিশ করেন যে, এটি দাতার ইচ্ছা অনুযায়ী মুসলিম ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা উচিত। এ সময় হুগলি কলেজে মহসিন ফান্ড থেকে প্রায় ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করা হত। অথচ সে সময় হুগলি মাদ্রাসার পরিচালনা ব্যবস্থায় অর্থাভাবে চরম সংকট বিরাজ করছিল। আবদুল লতিফ হুগলি কলেজ থেকে মহসিন ফান্ডের

---

১২৬. নওয়াব আব্দুল লতিফ (অনু : আবু জাফর শামসুদ্দীন), *মুসলিম বাঙ্গালা : আমার যুগে*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৫৩-৫৪।

১২৭. ১৮৭১ সালেই বিচারপতি জে. পি. নরম্যান ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান।

১২৮. হাজী মোহাম্মদ মহসীন (১৭৩২-১৮০৮) ১৮০৬ সালে বৃত্তিদানের জন্য বিরাট তহবিল মুসলমানদের শিক্ষার জন্য রেখে গেছেন। সেই অর্থ ব্যবহার করে সরকার ১৮৩৬ সালে হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৫০ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এখানে ৪০৯ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলিম ছাত্র মাত্র পাঁচ জন। সুফিয়া আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭।

১২৯. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫।

১৩০. উদ্ধৃত, সুফিয়া আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭।

১৩১. নওয়াব আব্দুল লতিফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০।

অর্থ প্রত্যাহার করে তা মুসলিম শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে সরকারকে অনুরোধ করেন।[১৩২] আবদুল লতিফ মহসিন ফান্ডের অর্থ বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই সরকারি এক রেজুলেশনের মাধ্যমে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৮৭৪ সালে তা কার্যকর করে। এতে কলকাতা মাদ্রাসার পরিচালনার মান উন্নত হয়। হুগলি, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে একটি করে মাদ্রাসা এবং ছাত্রদের থাকার জন্য ছাত্রাবাস নির্মিত হয় এবং মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। হুগলি কলেজকে সরকারি কলেজে উন্নীত করা হয়। নবাব আবদুল লতিফের বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে সুপারিশের কারণে সরকার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রদের বেতন দুই তৃতীয়াংশ মুক্ত করে এবং নয়টি জেলা স্কুলে ফারসি শিক্ষক নিয়োগ করে।[১৩৩] আবদুল লতিফ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়নে (১৮৭৩) এবং কেন্দ্রীয় টেক্সট বুক কমিটির সদস্য হিসেবে গ্রন্থ নির্বাচনে (১৮৮২) মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৩৪]

১৮৮২ সালে নবাব আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনের কাছে অভিজাত ও মধ্যবিত্তের জন্য উর্দু ও সাধারণের জন্য বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শে ১৮৮৩ সালে লর্ড রিপন কলকাতা মাদ্রাসার বার্ষিক পারিতোষিক সভায় এলে তাঁর স্মৃতিরক্ষা স্বরূপ চাঁদা দাতার নামের সাথে বৃত্তি ও পুরস্কারগুলোর নাম যথাক্রমে 'রিপন বৃত্তি' ও 'রিপন পুরস্কার' করা হয়।[১৩৫] এছাড়া, 'এ মিনিট অন হুগলি মাদ্রাসা' (১৮৬১), 'এ পেপার অন মহামেডান এডুকেশন' (১৮৬৮), 'এ পেপার অন প্রেজেন্ট কনডিশন অব দি ইন্ডিয়ান মহামেডানস এন্ড দি বেস্ট মীনস ফর ইটস ইম্প্রুভমেন্ট' (১৮৮৩), 'হান্টার কমিশনকে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর' (১৮৮২) প্রভৃতি রচনায় আবদুল লতিফের সমকালীন শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা ও চেতনার ছাপ পাওয়া যায়।[১৩৬]

বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও মুসলিম স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ সালে গঠিত 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামী' নামক সমিতি ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান। আবদুল লতিফ এ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তবে এ সমিতিটি বেশি দিন সচল থাকেনি।[১৩৭] এ অবস্থায় আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল কলকাতায় 'Mohammedan Litarary Society' বা 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা, তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের অনুগত করা ও মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ

---

১৩২. Enamul Haque, *op. cit.*, p. 192-195, এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬।
১৩৩. Enamul Haque, *op. cit.*, p. 216; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮১।
১৩৪. *Ibid*, p. 218; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮২।
১৩৫. *Ibid*, p. 224; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮২।
১৩৬. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮২।
১৩৭. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।

শাসকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য।[১৩৮] সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আবদুল লতিফ বলেন,

> ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করতে এবং শিক্ষা ও সামাজিকতায় তাদেরকে শিক্ষিত ইংরেজ ও হিন্দুদের সমকক্ষ করে তুলতে আমি ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতি বক্তৃতা ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করে মুসলমানদের শিক্ষা ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে এবং ইহা মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের উপদেষ্টা সংস্থার কাজ করেছে।[১৩৯]

১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল সমিতির প্রথম সভা আবদুল লতিফের ১৬ নং তালতলা লেনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ সমিতি মাসিক ও বার্ষিক আলোচনা সভা ও মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করে। ১৮৬৩ সালের ৩ অক্টোবর সমিতির ষষ্ঠ মাসিক সভায় উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ স্বদেশ প্রেম ও ভারতে জ্ঞানের উন্নতির আবশ্যকতা সম্পর্কে ফারসি ভাষায় বক্তৃতা করেন।[১৪০] সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলিম সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপনের পথ সুগম হয়।[১৪১]

সোসাইটির সদস্য সংখ্যা ও কার্যাবলি উল্লেখ করে ১৯৮৫ সালে এক বক্তৃতায় আবদুল লতিফ বলেন, "বাইশ বৎসর হল এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ের ভিতর ইহা ভারতের সর্বত্র মুসলমানদের উন্নতির ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা, আইন প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানদের অভাব অভিযোগ ও দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইহা মুসলিম সমাজে কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেছে। ...ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাঁচশতেরও বেশি মুসলমান এই সমিতির সভ্যভুক্ত হয়েছে।[১৪২]

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী মনোভাব এবং এর ফলে তাদের উপর এর প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিসন্দর্ভের অন্যত্র আরো সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। নবাব আবদুল লতিফ অনুভব করেছিলেন যে, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের উন্নতির জন্য এর পরিবর্তন জরুরি। তবে এ কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। কেননা এর সাথে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অনুভূতির প্রশ্ন জড়িত ছিল। এই অবস্থায় তিনি বিষয়টিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাধানের উদ্যোগ নেন। ১৮৭০ সালের ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত

---

১৩৮. এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৯৪৭)*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২৮।
১৩৯. নওয়াব আব্দুল লতিফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।
১৪০. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮-১২৯।
১৪১. Enamul Haque, *op. cit.*, p.144-148; মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ভূমিকা ২১-২২।
১৪২. নওয়াব বাহাদুর মৌলবি লতীফ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭-২১।

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির সভায় জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী বক্তৃতা দেন। তিনি মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ জিহাদি মনোভাব পরিহার করার পরামর্শ দেন। তিনি ব্রিটিশ ভারত 'দারুল হরব' নয়– এমন মত দিয়ে মুসলিম সমাজকে সরকারের প্রতি যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পরিবর্তে সহযোগিতা ও আনুগত্যের নীতি অবলম্বনের কথা বলেন। প্রসঙ্গত তিনি মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ইউরোপীয় ভাষা শেখারও আহ্বান জানান। মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর এই পরামর্শ মুসলিম সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বিষয়ে নবাব আবদুল লতিফ বড়লাট লর্ড মেয়োর (১৮২২-১৮৮২) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ফলে সরকার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট এক প্রস্তাব পাশ করেন।[১৪৩] এ প্রস্তাবে পাশ করা হয় যে, (১) সব সরকারি স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের প্রাচীন ও প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, (২) মুসলমানদের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সরকার সাহায্য করবে, (৩) মুসলমানদের প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচনার কাজে উৎসাহিত করা হবে, (৪) মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজির জন্য উপযুক্ত মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এ সকল ব্যবস্থা কার্যকর করতে প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এটাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রথম পদক্ষেপ এবং নবাব আবদুল লতিফ সরকারের এ পদক্ষেপ গ্রহণে বিশেষভাবে অবদান রেখেছিলেন।

১৮৭২ সালের ১৭ আগস্ট ভারত সরকারের কাছে বাংলা সরকার যে প্রতিবেদন পেশ করে তা এ প্রদেশের মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি বিবেচনার ফল। এ প্রতিবেদনে মুসলমানদের দু'টি প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করা হয়। এ প্রস্তাবে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর পথ সন্ধান করাসহ তাদের বৈষয়িক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়; যা দ্বারা তারা বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতার যোগ্য হবে। বাংলা সরকারের এ নীতির মূলকথা ছিলো:

> The Lieutenant-Governor's view is therefore not to attempt in Bengal to give the Mahomedans Western knowledge through the means of foreign Oriental Languages (Arabic and Persian) but only to teach them those languages in their own way so much as to satisfy the requirement of their religion, their idea of a liberal education and the genuine demand for oriental learning for its own sake, not as a means of gaining profit and employment. Among so great a Mohamedan population the demand for religious teachers and religious lawyers must be enough

১৪৩. নওয়াব বাহাদুর মৌলবি আবদুল লতীফ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩; Resolution of the Govt. of India, 7 August, 1871, para-2, India Education Proceedings, August, 1871.

to justify the teaching of Arabic in native fashion, but for the rest, His Honour would entirely adopt and encourage the system which best succeeds in the Calcutta Ma'drassa, and is known as the Anglo-Persian.[১৪৪]

বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা এবং এক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলো প্রস্তাব পেশ করে; ভারত সরকার ১৮৭৩ সালের ১৩ জুন তার মূল্যায়ন করে। এতে বাংলা সরকারের শিক্ষানীতিও সাধারণভাবে ভারত সরকার অনুমোদন করে।[১৪৫] এ অনুমোদনের পর জর্জ ক্যাম্পবেল মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। সৈয়দ আমীর হোসেন (তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এ বিবৃতিকে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে 'ম্যাগ্না-কার্টা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[১৪৬] এ ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এবং প্রসার। এতে কলকাতা মাদ্রাসায় একজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষ নিয়োগের কথা বলা হয় এবং এ অধ্যক্ষ বাংলার সকল মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্টও হবেন। মুসলমান প্রধান অঞ্চল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে নতুন মাদ্রাসা খোলা হবে। এ সকল মাদ্রাসার যে সকল ছাত্র পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি, হুগলি বা ঢাকা কলেজ অথবা কলেজিয়েট স্কুলসমূহে কিংবা রাজশাহী বা চট্টগ্রামর কোনো স্কুলে বা আইন শিক্ষায় যাবে, তাদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ বাংলার সরকার বহন করবে। লেফটেন্যান্ট গর্ভনর জর্জ ক্যাম্পবেল বিবৃতিতে আরও প্রস্তাব করেন যে, সংস্কৃতি ও হিন্দু কলেজ ব্যতীত কলকাতার অন্য যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবে এবং বাংলার যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের জন্য বিশেষ ক্লাসের অনুমোদনের সদিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। সরকারি স্কুলসমূহে ইংরেজি মাধ্যমে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, মাদ্রাসার আগ্রহী ছাত্রদের জন্যও ব্যবস্থা হয়। কলকাতার মত ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগের প্রস্তাব করে এ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।[১৪৭] এভাবে ১৮৭৩ সাল থেকে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য একটি নতুন প্রকল্প ও নীতির সূচনা ঘটে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজের শিক্ষার ব্যাপারে এ সরকারি নীতি গ্রহণে আবদুল লতিফসহ মুসলিম সমাজের নব্য নেতৃত্বের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করতে W. W. Hunter-কে সভাপতি করে 'Indian Education Commission' গঠিত হয়। এ কমিশন বিগত দশকে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকারি প্রচেষ্টার ফলাফলের মূল্যায়ন করে। এ কমিশন গঠন মুসলমানদের মধ্যে কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করে।

---

১৪৪. উদ্ধৃত, সুফিয়া আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭-৮; ভারত সরকারের কাছে বাংলা সরকারের পত্র, ১৭ আগষ্ট, ১৮৭২, অনুচ্ছেদ ৭। *Bengal Education Proceedings*, August 1872.

১৪৫. ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১৩ জুন ১৮৭৩, অনুচ্ছেদ ৭; *Gazette of India*, 14 June 1873.

১৪৬. A. S. Hossain, *A Pamplet on Mahomedan Education in Bengali*, 1880, I. O. L. Tracts 978 p. 5-6.

১৪৭. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮-৯।

মুসলমানরা ইতোমধ্যেই উপলব্ধি করেছিল যে, শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছিল। ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনকে জানান যে, মুসলমানরা এখন ইংরেজি শিখতে আগ্রহী, কিন্তু তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়। এছাড়া ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠ্য তালিকা মুসলমানদের শিক্ষানুকূলে নয়। তিনি মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি করেন।[১৪৮] এ কমিশন বাংলা ও বিহারের মুসলমান সমাজের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে আবদুল লতিফের কাছে জানতে চাইলে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, জাতিতত্ত্বের বিচারে নিম্নশ্রেণির অধিকাংশ (মুসলমান) অধিবাসী হিন্দুদের সাথে সম্পর্কিত, তাই তাদের প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত। অবশ্য এ ভাষাকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের সংস্কৃত বহুলতা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবি ও ফরসি শব্দের যোগও ভাষায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আইন আদালতে বাংলা ভাষাকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানরা মূলত আরব, পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে এসে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং বাংলায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন; তাই উর্দুকে তাঁদের মাতৃভাষা হিসেবে বিবেচনা করা দরকার।[১৪৯] এ সময় আবদুল লতিফ রিপনের কাছেও এক স্মারকলিপি দেয়ার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমান বিশেষভাবে বাংলার মুসলমানদের অসন্তোষ ও প্রয়োজনসমূহের কথা প্রথম সাধারণভাবে তুলে ধরেন।[১৫০] মুসলমানদের অনুভূতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে এ স্মারকলিপির ভূমিকা ছিল ব্যাপক এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারসমূহের কাছে এর প্রচারণার ফলে এ দৃষ্টি আকর্ষণ নিশ্চিত হয়। এ স্মারকলিপি সম্পর্কে জনস্টোন মন্তব্য করেনঃ "... assumed a kind of national significance and deeply pathetic as coming from the former conquerors and rulers of India."[১৫১]

হান্টার কমিশনের কাছে নবাব আবদুল লতিফের সমসাময়িক মুসলিম নেতা সৈয়দ আমির আলী প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনেরও প্রস্তাব ছিল। অ্যাসোসিয়েশন প্রস্তাব করে যে, শিক্ষার জন্য মুসলমানদের প্রদত্ত বৃত্তিসমূহ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।

---

১৪৮. নওয়াব বাহাদুর মৌলবি আবদুল লতীফ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১; সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯; মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পটভূমি ২৩।

১৪৯. Abdool Lateef, 'A Short Account of my Humble Efforts to Promote Education, Speially Among the Mahomedans', Calcutta, 1885, pp. 49, 51.

১৫০. *Indian Education Proceedings*, 6 March, 1882.

১৫১. J. Johnston, *Abstract and Analysis of the Report of the Education Commission*, p. 88; উদ্ধৃতি, সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।

এর ফলে বাংলা সরকার এ প্রদেশে মুসলমান শিক্ষা বৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে একটি কমিটি গঠন করে। ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে।[১৫২] উল্লেখ্য যে, ২০ সদস্যের হান্টার কমিশনে হাজী গোলাম হাসন এবং স্যার সৈয়দ আহমদ ও পরে তৎপরিবর্তে তাঁর পুত্র সৈয়দ মাহমুদকে নেয়া হলেও কোন বাঙালি মুসলমানকে সদস্য করা হয়নি। বিষয়টি কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপিতে উত্থাপন করা হয়। এতে অভিযোগ করা হয় যে, 'Muhammadan element is most inadequately represented on the Education Commission just appointed!'[১৫৩]

মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ কৃত বিষয়গুলো বাংলা সরকারও তার সবটাকে সর্বাত্মক সমর্থন দেয়নি, যদিও এর কিছু কিছু ইতোমধ্যেই প্রদেশে কার্যকর হয়েছিল। তবে মুসলমানদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর উদার ছিল। শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন প্রদানের পর ভারত সরকার ১৮৮৪ সালের অক্টোবরে এর উপর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে বলা হয় যে, 'Desirable to give them in respects exceptional assistance.' আরও ঘোষণা করা হয় যে, মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টি দেয়া হবে। শিক্ষা কমিশনের বৈঠক এবং ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি পেশের পরবর্তী বছরগুলোতে মুসলিম শিক্ষার প্রতি সরকারের নজর ছিল পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অধিক। দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তাবকৃত প্রতিবিধানগুলো এ সময়ে প্রয়োগের জন্য গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করা হয়।[১৫৪]

শুধু নবাব আবদুল লতিফ নয়, এ সময় বাংলার নব্য শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ অনুভব করলেন যে, ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে উন্নতির পথে আনতে হবে। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে ক'জন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এলেন সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮), সৈয়দ আমির হোসন (জ. ১৮৪৩) প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এদের মধ্যে আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার শরীফ মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।[১৫৫]

---

১৫২. *The Moslem Chronicle*, 13 January 1900.
১৫৩. উদ্ধৃত, সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১।
১৫৪. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৪।
১৫৫. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫; মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পটভূমি ১৮-১৯।

আবদুল লতিফের সমসাময়িক সৈয়দ আমির আলীও[১৫৬] বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ এবং রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনেকেই মনে করেন মুসলিম পুনর্জাগরণে তাঁর খ্যাতি সমসাময়িক মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং নবাব অবদুল লতিফকে অতিক্রম করেছিল। উল্লেখ্য যে, সমকালীন মুসলমান নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান নেতাদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তিনি ১৮৭৭ সালের ১২ মে 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫৭] বিহারের জমিদার নবাব আমীর আলী খান বাহাদুর (১৮১০-১৮৭৯) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও বিহারের সৈয়দ আমির হোসেন সহ-সভাপতি এবং সৈয়দ আমির আলী ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ১৮৮৩ সালে বঙ্গ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা সম্প্রসারিত হওয়ার পর কলকাতার প্রধান শাখাটির নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'।[১৫৮] এটি কেবল একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনই ছিল না, বরং এটি একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনও ছিল। সংগঠনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৈয়দ আমির আলী মন্তব্য করেন,

> আইনগতভাবে ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহা মুসলমানদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য হতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল মতবাদ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিবে। ইহা ভারতীয় মুসলমানদের নৈতিক জীবন সুসংহত করিয়া তাহাদের পুনর্জাগরণের পথ সুগম করিবে। ইহা ভারতের বিশেষ করিয়া মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।[১৫৯]

আমির আলী তাঁর ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুসলমানদের শিক্ষা, চাকরি এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বড়লাট লর্ড রিপনের নিকট ২৮ পরিচ্ছদের একটি স্মারকলিপি

---

১৫৬. সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ছিলেন একজন মুসলিম আইনজীবী, ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী একজন সংস্কারক এবং ইসলামের ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ক লেখক। শিয়া মতাবলম্বী সৈয়দ সা'দাত আলীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। তিনি প্রথমে হুগলি মাদ্রাসায় এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৭ সালে স্নাতক ও ১৮৬৮ সালে ইতিহাসে সম্মানসহ এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৬৯ সালে এলএল.বি. ডিগ্রি নেওয়ার পর তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রিও লাভ করেন। তিনি চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৭৯) থেকে কলকাতা হাইকোর্টের জজ (১৮৯০-১৯০৪) পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তদুপরি একজন শিক্ষক এবং মুসলমানদের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত আইন বিষয়ের লেখক হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে তিনি ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯০৪ সালে বিচারকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯২৮ সালের ৩ আগস্ট তিনি সেখানেই মারা যান।

১৫৭. Rules and Objects of the Central National Muhammadan Association and its Branch Association with the Quinquennial and Annual Report and List of Members, Calcutta, 1885, p. I.

১৫৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১।

১৫৯. এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪।

প্রদান করেন।[১৬০] এ স্মারকলিপিতে সৈয়দ আমির আলী মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষায় পশ্চাদপদতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি তথ্যপূর্ণ পটভূমি তুলে ধরে এসব অবসানে সরকারের পদক্ষেপ কামনা করেন। এছাড়াও তিনি মুসলিম সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র দাবি তুলে ধরেন। তিনি মূলত শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুযোগ-সুবিধা চেয়েছিলেন। আমির আলী ছিল ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার জোরালো সমর্থক। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা দ্বারাই মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণ সম্ভব। তিনি স্মারকলিপিতে তুলে ধরেন, অত্যধিক দারিদ্র্য মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার অন্তরায়! তিনি বাংলায় মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে উপযোগী স্কুল প্রতিষ্ঠা, মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং মহসিন ফান্ড ও অন্যান্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির টাকা কেবল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের জন্য ব্যয় করার জোর দাবি জানান। তিনি ইংরেজি শিক্ষায় দুর্বল মুসলমানদের জন্য শিক্ষা, বিচার, প্রশাসন ও পররাষ্ট্র বিভাগসহ সর্বত্র চাকুরিতে নিয়োগের স্বতন্ত্র ব্যবস্থারও দাবি করেন। উপর্যুক্ত স্মারকলিপির উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেন যে, মুসলমানদের দুরাবস্থা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও স্বার্থের পরিপন্থী।[১৬১]

হান্টার কমিশনের নিকট সৈয়দ আমির আলী যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাতেও তিনি ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

> A dead weight, however, seems still to press down the Moslem community. The mistake which was committed in 1882 was not to make English compulsory for all students who sought middle class and high education. The consequence is that the only kind of education which is necessary to enable them to retrieve the ground they had lost within the last 50 (fifty) years is in a most unsatisfactory condition. I think it has been satisfactorily proved that the scheme devised by George Campbell in 1872 to Promote Purely oriental education among the Moslems has proved a Practical failure.[১৬২]

কেন্দ্রীয় সরকার আমির আলীর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দেয়া পূর্বোক্ত স্মারকলিপির অনুলিপি হান্টার কমিশন প্রাদেশিক সরকার, উচ্চবিদ্যালয়, শিক্ষা বিভাগ ও বিভিন্ন সমিতিগুলোতে প্রেরণ করে তাদের অভিমত

---

১৬০. *Report of the Indian Education Commission*, 1883, p. 499-500; এম. এ. রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৬।

১৬১. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth century*, Camboration in the later nineteenth century, Cambridge, 1968, p. 321; মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পটভূমি, পৃ. ২৫।

১৬২. *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal* (1861-1977), vol 3; Dr. M. Sekander Ali Ibrahimy (ed.), *Dhaka,* Islamic Foundation, 1985, p. 141.

জানতে চায়। সার্বিক বিচার বিবেচনা শেষে সরকার মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এবং আমির আলীর নিজস্ব একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহের কয়েকটি বিবেচনা করে।[১৬৩] ১৯৮৫ সালের 'ডাফরিন প্রস্তাবে' তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৮১ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার মাধ্যমে মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'A Pamphlet on Mahomedan Education in Bengal' নামক পুস্তিকায় মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে নানা অভিমত ব্যক্ত করা হয়।[১৬৪] জীবিকার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ হিসেবে মুসলিম সমাজের সীমিত ইংরেজি চর্চার কথা এতে বলা হয়।। এতে মহসিন ফান্ডের টাকায় পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো মুসলমান সমাজকে যুগপোযোগী করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। কাজেই এই টাকায় কলকাতা মাদ্রাসা এলাকায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্য থাকবে এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রাবাস চালুর প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাবটি নিয়ে খোদ মুসলিম সমাজেই বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সৈয়দ আমির হোসেনও এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নবাব আবদুল লতিফ মাদ্রাসা বন্ধের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। *হিন্দু পেট্রিয়ট*, *ইন্ডিয়ান মিরর* ও *বেঙ্গলি* প্রভৃতি সংবাদপত্র মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। প্রস্তাবটি আধুনিক ও প্রগতিশীল হলেও শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তা গৃহীত হয়নি।

সৈয়দ আমির আলী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম সমাজকে উৎসাহী এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াও তাদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম সমাজ নিজেদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যুগোপযুগী জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের মাধ্যমে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। আর এজন্যই তিনি কলম হাতে তুলে নেন এবং ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আইন ও অন্যান্য বিষয়ে বেশ কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে *এ শর্ট হিস্টরি অব সেরাসিনস্* এবং *স্পিরিট অব ইসলাম* ছিল অন্যতম।[১৬৫]

পুনশ্চ স্মরণীয় যে, আবদুল লতিফ, আমীর আলীর স্মারকলিপি ও অন্যান্য শিক্ষানুরাগী মুসলমানদের আবেদন-নিবেদন এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ বিচার বিবেচনা করে বড়লাট লর্ড ডাফরিন (১৮২৬-১৯০২)

---

১৬৩. নওয়াব বাহাদুর মৌলবি আবদুল লতীফ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮।
১৬৪. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা ভাবনা,' *সুন্দরম*, ফাল্গুন ১৩৯৭- বৈশাখ ৯৮, পৃ. ৪০।
১৬৫. সৈয়দ আমির আলী রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা দ্রষ্টব্য এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪২

১৮৮৫ সালে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করেন। প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশনের যথাক্রমে ৮, ১১, ১৪, ১৬ সংখ্যক সুপারিশ গৃহীত হয়। তবে মুসলিম শিক্ষিত যুবকদের সরকারি চাকুরিতে আলাদা সুবিধা দানের বিষয়টি পক্ষপাতিত্বের কারণে পাশ হয় নি। আমির আলী লর্ড ডাফরিনের গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে মুসলিম অধিকারের 'Magna Carta' বলে অভিনন্দিত করেন।[১৬৬] উল্লেখ্য যে, ১৮৮৫ সালের প্রস্তাবে বলা হয় যে- জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা থাকবে; যা হতে ভারত সরকার মুসলিম শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। তাদের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সরকারকে জানাতে মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এছাড়াও এ সময়ে সরকার মুসলিম শিক্ষার অনুকূলে বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৬৭] ১৮৮৫ সালের প্রস্তাবে বলা হয়, "... a special section of the annual eduation reports should be dewted to Muslim education so that the Government might be keptfully informed of the state and progress of the Muhammadan Community."[১৬৮]

নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ যেমন লেখনি ও সভা-সমিতির মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন তেমনি মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ সুবক্তা বক্তৃতার মাধ্যমে স্বসমাজের মানুষের কাছে ধর্মীয় ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতে থাকেন। তাঁরা জনগণের প্রকৃত অসুবিধা উপলব্ধি করেন এবং তা নিরসনের পথ ও পদ্ধতির কথা বলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষা এবং শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁরা মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভাবধারার পরিবর্তনও কামনা করেছিলেন।[১৬৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাবেরও ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকে। তারা ধারণা করেন যে, ব্রিটিশদের হাতে মুসলমানদের রাজ্য হারানোর ক্ষোভই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল। এর ফলে মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টি কঠোর হলেও মুসলমানদের দাবি দাওয়া ও সমস্যাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। শিক্ষার অভাবই মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ, সেই বিষয়ে সরকার নিশ্চিত হয় এবং তাদের শিক্ষার উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকার মনোনিবেশ করে। এ প্রেক্ষিতেই W. W.

---

১৬৬. অমলেন্দু দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৫; মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পটভূমি, পৃ. ২৮।
১৬৭. *General Report on Public Instruction in Bengal*, 1890-91, p. 93.
১৬৮. P. Hardy, *The Muslims of British India*, Cambridge at the University Press, 1972, p. 122.
১৬৯. ওয়ালিক আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৫।

Hunter মুসলমানদের সমস্যাগুলো নিয়ে '*The Indian Musalmans'* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে সার্বিক বিষয়ে তুলে ধরা না হলেও বিশেষভাবে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থাটি তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার এর পর থেকে মুসলিম শিক্ষার প্রতি পূর্বের তুলনায় বেশি মনোনিবেশ করেন। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকার সে সময়ের আলোকপ্রাপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ, কর্মপটু ও উদ্যমী পুরুষ হিসেবে বাংলা থেকে আবদুল লতিফ ও উত্তর প্রদেশ থেকে সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮) কে নির্বাচন করে।[১৭০] এসব কর্মকর্তার কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই বাংলায় আধুনিক শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তা চেতনার উদয় হয়। পুরাতন শিক্ষা প্রণালী বিদায় নেয়, আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর আবির্ভাব ঘটে। এর প্রভাবে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন সূচনা হয়। সনাতন পোষাক পরিচ্ছেদের স্থলে নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য পোষাক পরিধান শুরু করে। তাদের খাদ্যাভ্যাস এবং আচার অনুষ্ঠানেও আধুনিক উপকরণ যুক্ত হয়।

মুসলিম সমাজের সমস্যা সে যুগের সাহিত্যিকদের চিন্তাকেও আলোড়িত করেছিল। পঞ্চভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন,

> বঙ্গীয় মুসলমানদিগের শিক্ষার পথে দারুণ অন্তরায়। হিন্দুদিগের যে স্থানে ২টা বা ৩টা ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তথায় ৫টি ভাষা আয়ত্ত না করিয়া উপায় নাই। প্রথমত, বাঙ্গালা ইহাদের মাতৃভাষা হইলেও বিশুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। উহা আরবী মিশ্রিত এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গালা। সুতরাং মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষা দস্তুর মত শিক্ষা করা চাই। তারপর আরবী বেশি না হউক কুরআন শরীফ বিশুদ্ধ ভাবে পাঠ করিবার উপযোগী হওয়া চাই। জাতীয় আচার ব্যবহার উন্নত করণের জন্য, 'আদব-কায়দা' শিক্ষার জন্য, ভাল জাতীয় কাব্য ও ইতিহাসের রসাস্বাদন জন্য, অতি সুমধুর ও স্মৃতিসুখকর পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। তৎপর উর্দু ভাষা, ইহা ভারতীয় মুসলিমদিগের জাতীয় ভাষা বলিয়া পরিবর্তিত হইতে পারে। প্রয়োজনীয় ধর্মগ্রন্থাদি সমস্তই প্রায় এই ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে বা হইতেছে। এই ভাষা শিক্ষা না করিলে নাগরিক সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত বাক্যালাপ করাও অসম্ভব হইয়া পরে। সুতরাং উর্দু ভালরূপে শিক্ষা করা দরকার। অবশেষে রাজভাষা ইংরেজী, ... এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলে, বঙ্গীয় মুসলমান প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়ে পরিগণিত হইতে পারেন।[১৭১]

রেয়াজুদ্দীনের উক্তিতে অংশত আবদুল লতিফের চিন্তার প্রতিফলন আছে। ইংরেজি বিরোধী লোকদের চিহ্নিত করে মোহম্মদ কে চাঁদ লিখেছেন,

> মৌলবিগণ প্রায় বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান দর্শন 'কুফরে কালাম' ও ইংরেজী শিক্ষা 'এলমে বেদিন'। ইহা অল্প শিক্ষিত আলেম, ফাজেল, মৌলবি, ওয়ায়েজ প্রভৃতি উজ্জ্বল উপাধিধারী কাটমোল্লাগণের স্বরচিত বচন মাত্র। ইহার ভিত্তি ইসলাম ধর্মে, কোরানে বা হাদীসে কোন স্থানেই নাই। তাহারা জীবিকা নির্বাহের জন্য

---

১৭০. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পটভূমি ১৯।
১৭১. *ইসলাম-প্রাচারক*, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৮।

> মুসলমানদিগকে বিবিধ অলীক ভিত্তিশূণ্য গল্পকে হাদীস বলিয়া শুনাইয়া তাহাদিগকে মোহিত করে এবং এইরূপে তাহাদিগকে জ্ঞানান্ধ করিয়া রাখিয়াছে।[১৭২]

সমাজের এ অন্ধত্বের ও অনীহার ভাব শেষ পর্যন্ত টিকেনি, মুসলমানদের মনে ক্রমশ পরিবর্তন আসতে থাকে। অবশ্য প্রথম দিকে যে দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করে মোহাম্মদ আফতাবউদ্দীন আহমদ লিখেছেন,

> ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকে এখন একটু একটু বুঝিতেছেন, কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস, ইহা চাকুরীর সহায় মাত্র, কিন্তু ধর্মের প্রবল শত্রু। তাই ধন লাভের আশায় কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট। আমার বিশ্বাস, ইংরেজী শিক্ষার সহিত আরব্য-পারস্য ভাষায় যতই মুসলমানরা শিক্ষিত হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা হৃদয়রস সংগ্রহ করিয়া জাতীয় ভাবে সুদৃঢ় হইতে পারিবেন।[১৭৩]

দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে উঠে মুসলিম সমাজকে কাজী ইমদাদুল হক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন,

> শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক। আজকাল ইংরাজী শিক্ষা না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যাঁহারা কাফেরী ভাষা বলিয়া ইংরাজী শিক্ষার এবং এলমে বেদীন বলিয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, তাঁহারা মুর্খ, তাঁহারা দয়ার পাত্র। আমরা ইংরাজী শিক্ষা করিব যে শুধু চাকুরী করিবার জন্য তাহা নহে, জ্ঞান প্রচারে জন্য, বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য। যাঁহারা বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আরবী ভাষা দ্বারা জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আরব দেশে গমন করিতে অনুরোধ করি। ইসলাম কখনো একমাত্র আরবী ভাষার মধ্যে আবদ্ধ হলে, বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিলে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি ছাড়া কখনো খর্ব হইবে না।[১৭৪]

ইমদাদুল হক গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং আমির আলীর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি প্রেমিকদের দেশ ছাড়তে বলেছেন; যা বলা সে যুগে সহজ ছিল না। সমকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিক শেখ ফজলল করিমও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "এ যুগ বেশীর ভাগ ইংরাজীর। ইংরাজী না শিখলে আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।"[১৭৫] ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগীরা এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের মোহ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। যেহেতু, তাঁদের চিন্তা-চেতনা ছিল যুক্তিশীল, কর্মপন্থা ছিল বাস্তব প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত সেহেতু তাঁরা সে মোহ ও সংস্কারের আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মনোভাব ফিরতে শুরু করে এবং নব যুগের পদধ্বনি শোনা যায়।[১৭৬]

---

১৭২. মোহাম্মদ কে চাঁদ, মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষায় অবনতির কারণ, *ইসলাম প্রচারক*, ফাল্গুন, ১৩১৩।
১৭৩. এম. আফতাবউদ্দীন আহমদ, 'বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা', *ইসলাম প্রচারক*, অগ্রহায়ণ, ১৩১১।
১৭৪. কাজী ইমদাদুল হক, 'ধর্ম এবং শিক্ষা', *নবনূর*, ফাল্গুন, ১৩১১।
১৭৫. শেখ ফজলল করিম, 'ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার', *কোহিনুর*, আষাঢ়, ১৩২১।
১৭৬. ওয়াকিল আহম্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৮।

উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও ওবায়দুল্লাহ্ আল-ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৬), দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩), সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২), হেমায়েত উদ্দিন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১), আব্দুল আজিজ বি. এ. (১৮৬৩-১৯২৬), স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৩৯-১৯১৭), আবদুল করিম বি. এ., সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪), হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বি. এল. প্রমুখ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা পুস্তক প্রবন্ধ রচনা করে, সভা সমিতি গঠন করে এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। কলকাতাও মুসলিম শিক্ষা সভা-সমিতি গঠন করে এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। 'কলকাতা মুসলিম শিক্ষা সভা' (১৯০০), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩), 'চট্টগ্রাম মোসলেম শিক্ষা সভা' (১৮৯৯), 'আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম' (বরিশাল, ১৮৯১), 'কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩), 'বঙ্গীয় প্রদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩) প্রভৃতি সভা-সমিতি শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির উদ্যোগ ও কার্যক্রম ব্যাপক ছিল। বিভিন্ন সমিতি বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করে উদ্যোক্তাগণ জনগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওবায়দুল্লাহ্ আল ওবায়দী ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। আবদুল আজিজ ও হেমায়েত উদ্দীন তাঁর ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ্ বেঙ্গল ম্যাগাজিনে (ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩), 'মোহামেডানে এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন।[১৭৭]

দেলোয়ার হোসেন আহমদ বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা বিষয়ে যুগান্তকারী চিন্তাভাবনার অধিকারী ছিলেন। যুগোপযুগী শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থতাকে তিনি মুসলিম সমাজের অধপতনের জন্য দায়ী বলে মনে করতেন। তিনি তৎকালীন মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উপর জোর দেন এবং এ ক্ষেত্রে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় ইহজাগতিক ধারা সংযুক্তির উপর গুরুত্ব দেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষা লাভে মুসলমানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে তিনি সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ ও গোঁড়ামি পরিহারের তাগিদ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক হলেও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহারের উপর জোর দেন। তিনি বাংলা ভাষাকে আশরাফ ও আতরাফ সকল বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার বাহন করার পক্ষে মত রেখেছেন। এখানেই নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। তিনি শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মুসলিম সমাজে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে পরিচিত একদল মানুষের কথা চিন্তা করেছিলেন, যারা তারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল ভাব আত্মস্থ

১৭৭. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৩; মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পটভূমি, পৃ. ২৮-২৯।

করবেন এবং তা মাতৃভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তার ঘটাবেন। দেলোয়ার হোসেন মুসলমানদের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য পেশাগত শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, জীবিকা নির্বাহের উপযোগী শিক্ষা হলো প্রকৃত শিক্ষা। এরূপ শিক্ষা গ্রহণে তিনি স্বসমাজের লোকদের উদ্বুদ্ধ করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম মানসে যে রূপান্তর ঘটে এবং তাদের মধ্যে যে নবতর সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাগ্রত হয় এর প্রভাব পরে মুসলিম নারী শিক্ষার উপর। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে রক্ষণশীলদের প্রভাবই প্রাধান্য পেয়ে আসছিল। এমনকি মুসলিম সমাজের নবজাগরণের অগ্রদূত নবাব আবদুল লতিফও মুসলিম নারী শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হননি। এক্ষেত্রে সৈয়দ আমির আলীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাগ্রসর। তিনি নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন, তবে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখেননি। এ অবস্থায় উনিশ শতকের সত্তরের দশক অবধি বলতে গেলে মুসলিম নারী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। ফলে মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ধীরগতিতে শুরু হয়। এক্ষেত্রে কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩) নারীশিক্ষার প্রয়াসে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় স্থাপিত হয় 'মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়'। বাংলা তথা ভারতবর্ষে মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষার জন্য এটিই প্রথম স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) কর্তৃক ১৯১১ সালে কলকাতায় 'সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপিত হওয়ায় মুসলিম নারীদের উচ্চতর পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম হয়।[১৭৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন শুরু হয়।[১৭৯] এক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিরাই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[১৮০] এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (১৮১৬)। এ সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার গৌরীবেড়েতে ১৮১৯ সালে 'জুভেনাইল স্কুল' নামে একটি আধুনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২২ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডিজ সোসাইটি (১৮২৪), সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল (১৮২৬) ও লেডিজ এ্যাসোসিয়েশনের (১৮২৭) অধীনে কলকাতা ও

---

১৭৮. লোকমান হাকিম, 'বাংলার মুসলিম নারী সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (১৮৭৩-১৯১১)', *বাংলদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ; ১-৩ সংখ্যা; ১৪১১ বাংলা, ২০০৪-২০০৫, পৃ. ২২।

১৭৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ৩।

১৮০. M. A. Larid, *Missionaries and Education in Bengal, 1793-1837,* Clarendon Press, Oxford 1972, p. 11.

আশপাশের অঞ্চলে ১৪৯টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৫০০ জন।[১৮১] উনিশ শতকের প্রথম দিকে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনই সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এ মিশন শ্রীরামপুরে ১৩টি, বীরভূমে ৭টি, ঢাকায় ৫টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে।[১৮২] ধারণা করা হয় মুসলিম প্রধান এলাকায় এ সকল বিদ্যালয়ে মুসলমান বালিকারাও লেখাপড়া করত। তবে এদেশে নারীশিক্ষার জন্য জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ব্যক্তিগতভাবে সর্ববৃহৎ এবং কার্যকর উদ্যোগ নেন এবং ১৮৪৯ সালের ৭ মে 'Calcutta Female School' প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে 'বেথুন স্কুল' নামে খ্যাতি লাভ করে।[১৮৩] তবে উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম বালিকারা লেখাপড়া করতে আসত বলে অ্যাডামের উক্তিতে বোঝা যায়। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন, "১৯ ডিসেম্বর (১৮২৩) শুক্রবার দিবা দশ ঘটিকার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক সাহেব ও বিবি লোক ছিলেন। এই পরীক্ষাতে হিন্দু ও মুসলমানদের বালিকা সর্বশুদ্ধ প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়েছিল"।[১৮৪]

মুসলিম শাসনামল (১২০৪-১৭৫৭) থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পুরো সময়কালে এ দেশের মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়টি মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, গৃহাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত *বামাবোধিনী* পত্রিকা থেকে জানা যায়, এ সময় মুসলমানগণ তাঁদের কন্যাদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহ বোধ করতেন না।[১৮৫] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় উনিশ শতকের আশির দশকে। প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন কুমিল্লার পশ্চিমগাঁও গ্রামের অধিবাসী জমিদর, সমাজকর্মী নবাব জয়তুন্নেছা(?) চৌধুরাণী। তিনি ১৮৭৩ সালে মুসলিম মেয়েদের জন্য কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে যে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এটি ছিল বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম নারীশিক্ষার জন্য প্রথম স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। তাই নবাব ফয়জুন্নেছা ছিলেন বাংলার মুসলমান মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথিকৃৎ বলা যায়। ১৮৮৯ সালে স্কুলটি জুনিয়র হাই স্কুল এবং ১৯৩১ সালে ইংরেজি মাধ্যম হিসেবে হাই স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে স্কুলটি 'নবাব ফয়জুন্নেছা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়' হিসেবে কুমিল্লার বুকে বিদ্যমান রয়েছে।[১৮৬] সুতরাং বলা যায়, উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বাংলার মুসলিম নারী সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের অগ্রযাত্রায় বিদ্যালয়টির অবদান অপরিসীম।

---

১৮১. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪১।

১৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯।

১৮৩. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটারের ভূমিকা, *বাংলাদেশ ইতহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা পৌষ- চৈত্র, ঢাকা, ১৩৯৪, পৃ. ২৬-৩৮।

১৮৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১।

১৮৫. Rev. J. Long Adam's Reports on vernocular Education in Bengal and Bihar, calcutta, 1868, p. 104-15; আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০, ১৩ নং তথ্য নির্দেশ।

১৮৬. লোকমান হাকিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলার মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে প্রধান পুরুষ নবাব আবুদল লতিফের চিন্তায় নারীশিক্ষা স্থান পায়নি। আবদুল লতিফ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষার জন্য যা কিছু করেছেন তার সবই ছিল ছেলেদের জন্য। এর পরের পঁচিশ বছরেও নারীশিক্ষার কথা তাঁর মনে রেখাপাত করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।[১৮৭] মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল। তিনি যুগধর্ম ও যুগমানসিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। নারীর মর্যাদা উন্নতিকরণ ও নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে বাংলার আরেকজন অন্যতম চিন্তক সৈয়দ আমির আলীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিশীল ও উদার। ১৮৭৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে মুসলিম নারীসমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রগতিপন্থি চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ‘মহাডেমান এডুকেশনাল কনফারেন্সে’ সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, “মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালভাবে চলা উচিত। তাতেই সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, পুরুষ ও নারী একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না।[১৮৮] তবে নানা রকমের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, আর্থিক অসচ্ছলতা, সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে উনিশ শতকের অষ্টম দশক পর্যন্ত মুসলিম নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। ১৮৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

সারণি-১[১৮৯]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী সংখ্যা	মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা	হার
উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	-	-
মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.৭৬
দেশীয় মাধমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১৪
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭,৪৫২	১,৫৭০	৮.৯৯
শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪১	-	-

তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে নারীশিক্ষা প্রশ্নে মুসলিম সমাজের মানসিকতার ক্রম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এসময় থেকে সরকারও নারীশিক্ষার উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থা, বই এবং সিলেবাসে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব রাখে। ছাত্রীদের থাকার সুবিধা এবং অধিক সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়

১৮৭. Enamul Haque (ed.), *Nawab Bahadur Abdul Latif: His writings and Related Documents*, Dacca, 1968, p. 76.
১৮৮. *মালঞ্চ*, আশ্বিন, ১৩২৪।
১৮৯. M. Azizul Haque, *History and Problems of Muslims Education in Bengal*, 1917, p. 20.

বিবেচনা করা হয়। অন্দরমহলের পর্দানশীল মেয়েদের জন্য যোগ্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে গণিত, ভূগোল, সেলাই, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে স্কুল পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত করে।[১৯০] কাজেই বলা যায়, গৃহে এবং গৃহের বাইরে সরকার মুসলিম নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে উনিশ শতকের আশির দশকে এগিয়ে আসে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী'। ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কলেজের কিছু সংখ্যক ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এ সংগঠনটি। এ সমিতির কার্যাবলি প্রথমত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ ছিল। চার বছরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা থেকে স্ত্রী-পুরুষ উভয় শিক্ষাক্ষত্রে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।[১৯১] প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করে তদনুসারে ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, কলকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সংগঠনের পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে মেয়েদের পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হতো। উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট, পদক ও পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষায় পরীক্ষা নেয়া হতো। ১৮৮৯ সালে সম্মিলনীর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় কলকাতা হাইকোর্টের উকিল মৌলবি সিরাজু ইসলাম খান বাহাদুর শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য ১০ টাকা মূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেন।[১৯২] উনিশ শতকের শেষের দিক হতে গৃহে এবং গৃহের বাইরে পদ্ধতিগত উপায়ে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। বাংলার মুসলিম নারী সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে সুহৃদ সম্মিলনীর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এর কার্যক্রম বর্তমানকালের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংগঠনটি ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল; ১৯০৫ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার ও জনগণের প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষা কর্মসূচির সাফল্য অর্জিত হয়। আদর্শগতভাবে মুসলিম নারীরা শিক্ষা অর্জনকে অর্থবহ করে তোলার যোগ্যতা অর্জন করে ও তারা ধীরগতিতে গড়ে ওঠে পেশাগত চাকরি নির্ভর কাজের জন্য। এভাবে বাংলার মুসলিম নারী সমাজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। অতএব, উনিশ শতকের শেষ পাদে নারীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলমান সমাজের নিশ্চলতার অবস্থা থেকে সচলতার অবস্থায় উত্তরণ ঘটেছে। সমাজের গতি যে পরিবর্তনের দিকে ছিল, এতে তাই প্রমাণিত হয়।

---

১৯০. সোনিয়া নিশাত আমিন (অনু : পারভীন নাহার), *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ১৮৭৬-১৯৩৯*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২৮।

১৯১. ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার বিদ্বৎসভা : ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, জুন, ১৯৭৮, পৃ. ২৪-৩০।

১৯২. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০০।

মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও পণ্ডিতগণের শিক্ষা আন্দোলন, সরকারে সক্রিয় সহযোগিতা, নারী সমাজের জাগরণ, এবং মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসহ আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজ মানসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তা ক্রমান্বয়ে অপসারিত হয়। প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষার হার বৃদ্ধি না পেলেও তুলনামূলক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৮৭১ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ১২,১৪৮ (১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ সালে ২,৬১,১০৮ (২৩%) জনে দাঁড়ায়।[১৯৩] এ সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় মুসলিম ছাত্ররা উত্তীর্ণ হতে থাকে। ১৮৯০ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও সিলেট জেলায় মোট ২৬ জন মুসলিম ছাত্র উত্তীর্ণ হয়।[১৯৪] ১৮৯০-১৮৯১ সালের একটি তালিকা থেকে তা বোঝা যায়।

সারণি -২[১৯৫]

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র সংখ্যার অগ্রগতি : ১৮৯০-৯১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	**মোট ছাত্র সংখ্যা**	**মুসলিম ছাত্র সংখ্যা**	**হার (%)**
আর্টস কলেজ	৫২৩২	২৯৩	৫.৬৭
উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়	৮৭২৭	৮২৭০	১০.৫
মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়	৬১০০০	৮৮৮৪	১৪.৫
মধ্য বাংলা বিদ্যালয়	৬৭৭৪১	১০৩২৯	১৫.২
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮৯৫০	২৬৮৮৮	১৯.৩
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭৭৬৩২	২৭১০১৭	২৭.৭
পেশাগত কলেজ	১৪৯৩	৫২	৩.৫
টেকনিক্যাল স্কুল	২৪২২	৪২৭	১৭.৬
ট্রেনিং স্কুল	১৯৮৩	২২০	১১.১
মাদ্রাসা	২৪২৬	২২৭৯	৯৭.৯
সর্বমোট	**১৩৩৭৬০৬**	**৩২৮৬৪৯**	**২৪.৫**

বাংলার মুসলমানরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে রাজ্য ক্ষমতা হারিয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পরে এবং এর ধারা উনিশ শতকের মধ্যভাগের পরও অব্যাহত থাকে। তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে পিছিয়ে পরে সমাজের নিচু শ্রেণিতে পড়ে যায়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও

১৯৩. M. Azizul Haque, *op. cit.*, 1917, p. 20.
১৯৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ জৈষ্ঠ, ১২৯৭।
১৯৫. Abdul Karim, *Muhammadan Education in Bengal*, Calcutta, 1900, Appendix.

মনীষীদের কর্মতৎপরতা ও সরকারের প্রচেষ্টা, ১৮৫৪ সালের ডেসপাচ, ১৮৭১ সালের প্রস্তাব, ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং পাট চাষ ও পাটজাত দ্রব্য তথা অর্থকরী ফসল রপ্তানির মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। উনিশ শতকের শেষ পাদে তার সাথে যোগ হয় নারীশিক্ষার অগ্রগতি। ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার শুরু হয় এবং তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। তাঁদের মধ্য থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয় এবং তারাই উনিশ শতকে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে এক নব্য সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটায়। এই সংস্কৃতির প্রভাব দৃশ্যমান হয় বাঙালি মুসলমান সমাজের পোষাক-পরিচ্ছেদ, আচার-অনুষ্ঠান এবং খ্যাদ্যাভ্যাসে। বাঙালি মুসলিম সমাজ রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ছিন্ন করে প্রগতির পথে হাঁটতে শুরু করে। এরূপ একটি অনুকূল পরিবেশে দেলোয়ার হোসেন আহমদের মত বাঙালি মুসলিম প্রগতিশীল ব্যক্তিরা মুসলমান সমাজের নানাবিধ আচার সংস্কার, বিধি-বিধান, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধনে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলায় একটি আধুনিক মুসলিম সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তারা কাজ শুরু করেন। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক বিধি-বিধান অনুশাসন ইত্যাদি দূরীকরণে সোচ্চার হন। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিকের ব্যাপক সংস্কার সাধনে সোচ্চার হন। এ সব প্রয়াস ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবজনিত নবতর চিন্তা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের ফল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট মুসলিম সমাজ গঠন ও তাঁদের চিন্তার রূপান্তর

যুগে যুগে মানব সমাজের গড়ন বদলায়। মানব সমাজের বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণি থাকে এবং প্রত্যেক স্তর ও শ্রেণির সঙ্গে পারস্পরিক এক সম্পর্কও তৈরি হয়। সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের ওপর সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social Stratification) ও শ্রেণিগত সম্পর্ক নির্ভর করে। দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণিবদ্ধতা প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যে এক শ্রেণিগত মনোভাবও গড়ে ওঠে। এ মনোভাবের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে এক স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদাবোধের বিকাশ ঘটে। এরপর অর্থ সামর্থ্যের সঙ্গে মর্যাদাও (Status) শ্রেণি বিচারের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হয়ে ওঠে। সামাজিক শ্রেণির সঙ্গে অর্থসঙ্গতি, ক্ষমতা, মর্যাদা প্রভৃতি অনেক কিছু ওতপ্রোতোভাবে জড়িত, একথা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। একমাত্র অর্থই (Money) সামাজিক শ্রেণি বিচারের মানদণ্ড নয়, এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা প্রায় একমত। এমনকি মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও এ ধারণা জন্ম নিয়েছে।[১] অবশ্য অর্থের গুরুত্ব এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের পূর্বে মধ্যযুগের সামাজিক ভরকেন্দ্র ছিল ভূ-সম্পত্তি (Landed Property)। তাই এসময় মানব জীবন ছিল মূলত গ্রামকেন্দ্রিক; জীবনের কর্তব্যকর্ম ছিল প্রকৃতি-নির্দিষ্ট, অর্থাৎ দেবতা নিয়ন্ত্রিত। বংশ ও ভূসম্পত্তি –এ ছিল সামাজিক শ্রেণি বিচারের প্রধান দুটি মানদণ্ড। স্থিতিশীল দুটি মানদণ্ডের মধ্যে ভূ-সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ও হস্তান্তর হলেও বংশের পরিবর্তন হত না। এ কারণে মধ্যযুগের সমাজের গঠন ছিল অনেকটা পিরামিডের মতো স্তরবিন্যস্ত। আর এ স্থিতিশীল সমাজে বসবাসের ফলে এ যুগের মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ সবই ছিল অত্যন্ত দৃঢ়বিন্যস্ত। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Alfred Von Martin মন্তব্য করেন :

> The Middle Ages in their social structure as well as in their thought has a rigidly graduated system. There was a Pyramid of Estates as well as a Pyramid of values. Now these Pyramids are about to be destroyed, and 'free competition' is proclaimed as

১. Arnold W. Green, *An Analysis of Life in Modern Society*, New York, 1964, Introduction, p. 5; বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৩৯।

the law of nature. God and blood, the traditional powers, are deposed, and though maintain some of their importance their dominance is shattered.[২]

দেবতা ও বংশ উভয়েরই মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যখন খণ্ডিত হল, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধাবন্ধনহীন প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে, মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা পায়, তখন সমাজের স্তরগুলোতে ফাটল ধরতে থাকে, বদলাতে থাকে সমাজের স্তরবিন্যাস।

ব্রিটিশ পুঁজিবাদী উদ্যোগের সাথে দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলার সমাজকাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। ইউরোপের মত ভারতেও সামন্তবাদী ব্যবস্থার অধীনে সম্পদের প্রধান ধরণ ছিল ভূ-সম্পত্তি। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রথমবারের মতো সম্পদের নতুন নতুন রূপ তথা মুদ্রা-অর্থনীতি ও ব্যাংক-বীমা প্রবর্তন করে। ব্রিটিশ পুঁজিবাদী উদ্যোগ তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সম্পদের নতুন রূপকে সামন্তবাদী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তথা জন্মকৌলীন্য, ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও মর্যাদাভিত্তিক ঐতিহ্যগত পার্থক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে। ফলে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে জন্মগত অবস্থানের ভূমিকা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। এ বিচারে ব্রিটিশ শাসন বাংলায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। যা বাংলার নিশ্চল সমাজ কাঠামোকে গতিশীল করে তোলে। এভাবে বাংলায় ব্যাপক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কাজটি করে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মত বৈদেশিক শাসকরা।[৩] ১৯০ বছরে শাসনকালে তাঁরা বিশেষত সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। সামাজিক শ্রেণির রূপান্তর ঘটিয়ে জন্ম দেয় এক নতুন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিছুটা এবং ১৮৫৮ সালের পর ব্রিটিশ সরকার পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন, ১৮১৩ সালে শিক্ষায় এক লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭), হুগলি কলেজ ও হুগলি মাদ্রাসা স্থাপন, ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলন (১৮৩৭) উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অধস্তন কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং এর প্রধান কারণ ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্রিভূতকরণ ।[৪] এ কারণে প্রাদেশিক বিষয়, যেমন– আইন, রাজস্ব, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দপ্তরের পদগুলো ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এ পদে যোগদানের বা সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল ইংরেজি শিক্ষা।[৫] ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এতদঞ্চলে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করেছিল বললে অত্যুক্তি হবেনা। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, যেখানে হিন্দু সম্প্রদায় শুরু থেকেই

---

২. Alfred Von Martin, *Sociology of the Renaissance*, London, 1945, Introduction, p. 2.

৩. এ. কে. নাজমুল করিম, অনুবাদ : রংগলাল সেন, জিনাত হুদা অহিদ ও শিশির ঘোষ, *পরিবর্তনশীল সমাজ*, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. xxvii-xxix.

৪. A. R. Desai, *Social Background of Idnain Nationalism*, Bomby, 1976, p. 308.

৫. Barun De, (ed.), *Essays in Honour of Prof. S. C. Sarkar*, New Delhi, 1976, p. xxi.

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি লাভ করে। অন্যদিকে, মুসলমান সমাজ শুরু থেকেই এ সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা হতে বাধ্য হয়েছিলো; যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে পরিবর্তন আসে, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হওয়ায় বৃটিশ সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতির সুফল ভোগ করতে শুরু করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরেই উনিশ শতকেই বাংলার সামাজিক কাঠামোয় তথা হিন্দু ও মুসলমান সমাজে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি'র উদ্ভব ঘটে। বিনয় ঘোষ মনে করেন, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।[৬] তবে বাংলায় 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি' কথাটি প্রথম ব্যবহার করে 'বঙ্গদূত' সাময়িক পত্র। ১৮২৯ সালের ১৩ জুন পত্রিকাটি লিখে :

> যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিনে দিনে দীনের হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশ্যের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল, তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত হইতে জনসমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশিত থাকিত। অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশ্যে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উনিশ শতকের সাতের দশকে বাংলার মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে একটি মুসলিম 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির' বিকাশ ঘটে। এ সময় বাংলার সামাজিক কাঠামোয় মুসলমানরা তাদের হারানো আত্মমর্যাদা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং অধিকার আদায় সম্পর্কে সচেতন হয়। সমাজের নেতৃত্বও সমাজ-বিচ্ছিন্ন অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে এ নব জন্মা মধ্যবিত্ত শ্রেণির হস্তগত হতে থাকে। তবে তখনকার পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষের সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে নিজস্ব কোন বক্তব্য ছিল না। ফলে মুসলমান সমাজের এক ক্রান্তিলগ্নে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসতে হয়। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজের এ গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া ও ওয়াকিল আহমদ বিস্তৃত গবেষণা করলেও বাংলায় মুসলিম চিন্তার রূপান্তরে তাঁদের অবদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা খুব বেশি চোখে পড়েনি। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট মুসলিম সমাজ গঠন ও তাঁদের চিন্তার রূপান্তর সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াসমাত্র।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে সমকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া প্রয়োজন। সামাজিক শ্রেণি ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে ইসলামের বিকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের তথা বাংলার সামাজিক ব্যবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াসে মুসলমানরা তার

---

৬. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪।
৭. *বঙ্গদূত*, ১৩ই জুন ১৮২৯।

সামাজিক শ্রেণি সমূহকে প্রায় হিন্দু চতুর্বর্ণ বিভাজনের অনুকরণে ‘কাল্পনিকভাবে’ সৈয়দ, মোগল, শেখ, পাঠান ইত্যাদি ৪টি ভাগে বিভক্ত করেছে, যা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জে. ডি. কানিংহাম মন্তব্য করেন, “ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের অনুকরণে কাল্পনিকভাবে নিজেদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে, যেমন : সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, এরা সকলই সম্ভ্রান্ত, কিন্তু প্রথম দুটো হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং হযরত আলীর(মহানবীর জামাতা) প্রত্যক্ষ বংশধর,তাই এঁরা সকলেই বিশিষ্ট। অনুরূপভাবে এটা সত্য যে, অন্তত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু ধর্ম থেকে কোন ক্ষত্রিয় কিংবা শিখ ধর্ম থেকে যে কেউ ধর্মান্তরিত হলে তাঁরা শেখ হিসেবে গণ্য হতেন। আর হিন্দু সামজের নিচু বর্ণ থেকে কেউ ধর্মান্তরিত হলে তাকে মোগল ও পাঠানদের শ্রেণিভুক্ত করা হত। নিঃসন্দেহে, একজন ব্রাহ্মণ মুসলমান হলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ সৈয়দদের সমপর্যায়ের শ্রেণিভুক্ত করা হত বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।”[৮] তবে জাফর শরীফ রচিত *Islam in India*নামক গ্রন্থ পর্যালোচনা করে উইলিয়াম ক্রুক বলেন, “গোড়ায় ইসলাম তার অনুসারীদের বিভিন্ন জাতিবর্ণে পৃথকীকরণ অনুমোদন করে না।”[৯] একথা সত্য যে, জে. ডি. কানিংহাম পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিতে এটাকে কাল্পনিক বলেছেন। তবে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তাদের চার স্তরে বিভক্ত করার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল; এরূপ ব্যাপক শ্রেণি বিভাজনের বহু অর্থ রয়েছে। বাংলায় বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলমানরা, বিশেষ করে, উচ্চ শ্রেণির সদস্যরা মুসলমান সমাজকে দুটি বড় গ্রুপে বিভক্ত করেন: (১) শরীফ কিংবা আশরাফ (যাঁদের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম) এবং (২) আতরাফ কিংবা আজলাম (নিম্ন মর্যাদার পরিবারে যাদের জন্ম)। অনেকে মনে করেন যে, মুসলমান সমাজের এ বিভাজন প্রাচীন আরব সমাজের অনুকরণ মাত্র। এখনও আরবে মহানবীর বংশধররা এবং কোরাইশ উপজাতির সদস্যরা শরীফ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।[১০] এ প্রসঙ্গে লেভি’র মন্তব্য হলো:

> আরব ভূখণ্ডের বাইরে ইসলাম অনুরূপ পরিবর্তন আনে, যার মাধ্যমে সম্মানের দাবি নির্ধারিত হয়, যাতে মহানবীর সাথে সম্পর্ক তা যতই দূরবর্তী হোক না কেন, এবং সম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সব কিছুরই মূল্যায়ন করা হয়। আধুনিক মিশরে যারা প্রথম খলিফা আবু বকর এবং ওমরের বংশধর বলে নিজেদের গণ্য করেন, তারা সকলই আশরাফ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।[১১]

অনুরূপভাবে আরব, পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, মাঝে মাঝে উত্তর ভারত থেকে আগত বিদেশি বংশের দাবিদার বাংলায় শরীফ বলে গণ্য। তাঁরা ধর্মান্তরিতদের নিম্ন শ্রেণির বলে ঘৃণা করতেন এবং আতরাফ, আজলাফ কিংবা আরজল সম্বোধন করতেন। এরূপ সম্বোধন ছিল এসব মানুষের প্রতি তাঁদের চরম ঘৃণা এবং অবজ্ঞাপূর্ণ অভিব্যক্তিরই প্রকাশ।

---

৮. Ruben Lavy, *An Introduction to the Sociology of Islam*, Part I, London, 1933. pp. 96-97.
৯. এ. কে. নাজমুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৬।
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১-৮৫।
১১. Ruben Lavy, *op.cit.* pp. 96-97.

উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলার শরীফ শ্রেণির মুসলমানরা তাঁদের জাতিবর্ণগত গৌরব বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের আনুভূমিক প্রভাব তাদের জাতিবর্ণগত গৌরবের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। ব্রিটিশরা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে এবং সমাজের সকল অংশ থেকে কর্মচারী নিয়োগ করে।[১২] অতএব ব্রিটিশ শাসনের ফলে বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাস কতকটা সমতাধর্মী রূপ ধারণ করে। বিশ শতকের শুরুতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজে নিম্নোক্ত ব্যাপক শ্রেণি বিভাজন দেখতে পাই; যার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

১. **আশরাফ :** আশরাফ সকলের চেয়ে সম্ভ্রান্ত, তাঁরা সকল ধরনের দৈহিক কাজ করাকে ঘৃণা করত এবং নিজেদের প্রকৃত কিংবা কাল্পনিক বিদেশিদের বংশধর বলে দাবি করতেন। তাঁরা আরও দাবি করতেন যে, তাঁদের অতীতে কিংবা বর্তমানে সামন্ততান্ত্রিক পদমর্যাদা ও ভূমি নিয়ন্ত্রণের সাথে কোন না কোন ধরনের যোগসূত্র ছিল। উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি – যারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিক্ষার বদৌলতে আশরাফ শ্রেণির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।
২. **আতরাফ :** আশরাফ শ্রেণির দৃষ্টিতে স্ব-শ্রেণির সদস্যরা ছাড়া অন্য সকলেই আতরাফ।
৩. **আরজল :** ১৯০১ সালের ভারতীয় আদমশুমারি রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশের ৫৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কোন কোন এলাকায় আরজল নামে তৃতীয় একটি শ্রেণি ছিল, যারা সবার নিচে।"[১৩]

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, মুসলিম শাসনামলে সমাজ কাঠামোয় শাসক শ্রেণি ও অধস্তন শ্রেণির বৈষম্যমূলক বিভাজন স্পষ্টত। এ কারণে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান দেখা যায় না। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ব্রিটিশ শাসন কাঠামো থেকেই মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি উৎসারিত হয়েছে। তবে C. Smith বলেনঃ

> সকল দক্ষ পর্যবেক্ষকই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ভারত সরকার উনিশ শতকের প্রথম দশক, এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও যথেচ্ছ দমন করার অভিপ্রায়ে এককভাবে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বেছে নেয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ব্রিটিশ সরকার মুসলমান উচ্চ শ্রেণি এবং সমাজের এরূপ অংশকে দমন করে, যেখান থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগমন ঘটতে পারত।[১৪]

ব্রিটিশ পুঁজিবাদী উদ্যোগ প্রসার লাভে ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ শাসন-সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি চাহিদার তুলনায় অধিক অগ্রগামী হয়। ফলে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা শুরু করে এবং ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংগ্রামপ্রবণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। তখন থেকেই ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকে এবং সে অনুযায়ী কাজও করতে থাকে। এ সময় ব্রিটিশ আবেদনে সাড়া দেন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ

---

১২. এ. কে. নাজমুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৬।
১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৮।
১৪. W. C. Smith, *Modern Islam in India*, Victor Golange, London, 1946, pp. 164-165.

আহমদ, বাংলায় নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব আবদুল গণি, ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এবং জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী প্রমুখের মতো ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের সাথে একরকম আপোস করে ব্রিটিশ প্রশাসনের পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হন। ব্রিটিশরাও মুসলমানদেরকে আপেক্ষিকভাবে হিন্দুদের চেয়ে চাকুরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে একটি শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করতে ব্রত হন।[১৫] ব্রিটিশ সৃষ্ট বাংলাদেশে এ নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্যরা তথাকথিত 'শরীফ জাত'-এর সাথে বৈবাহিকভাবে সম্পর্কিত কিনা, তার তাৎপর্য এখন তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দুদের মধ্যেই এ শ্রেণির জন্ম হয়েছে সর্বাগ্রে। তাই মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি আলোচনার পূর্বে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Middle Class'। শিক্ষা বাণিজ্যে মাঝারি আকরের বিনিয়োগকারী, বস্তুত সহজ উৎপাদক তথা কারিগর ও চাষি, ক্ষুদ্র দোকানদার ও ব্যবসায়ী, জমিদার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত।[১৬] ফরাসি ভাষায় 'Middle Class'-এর প্রতিশব্দ 'Bourgeoise'; যার অর্থ 'নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী বা দোকানদার'। সাধারণ কথাবার্তায় বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমর্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ অর্থে বোঝায় একটা সমাজ, যা কালচারে ধনী সম্প্রদায়ের এবং যারা শিল্প বা ব্যবসায়ে প্রভুত্ব করে ও যাদের আয় হচ্ছে ব্যবসায় ও শিল্পকর্ম থেকে লব্ধ, অথচ যারা কায়িক পরিশ্রমে এসব কাজ করে না। আরও বিশেষ অর্থে বোঝায় ইউরোপে 'রেনেসাঁ ও রিফর্মেশনের' সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবশালী কালচার; অন্যদিকে, এ উপমহাদেশে বোঝায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঞ্জাত পাশ্চাত্য কালচার অভিসারী নব্য সমাজ।[১৭] সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে শিল্পপতি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও কেরাণীকূলকে বুঝায়।[১৮] তবে সাধারণ অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হলো উচ্চবিত্ত ও মজুর শ্রেণির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী শ্রেণি।[১৯] বিকাশের প্রাক্কালে ইংল্যাণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে একটি ঐতিহ্যবাহী সমাজকে বোঝাত, আর্থিক বিন্যাসে যার অবস্থান ছিল পুঁজিপতি ও মজুর শ্রেণির তুলনায় মধ্যস্তরের।[২০] মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন বলেন, "জমিদার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী স্তরের লোকদের সাধারণভাবে মধ্যশ্রেণির অন্তর্গত বলে ধরে নিতে পারি। মধ্যশ্রেণির এক বিরাট অংশ ছিলেন চাকুরিজীবী। এছাড়া স্বাধীন পেশা, যেমন– আইনজীবী, ডাক্তার বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং ব্যবসায়ী প্রভৃতিও ছিলেন মধ্যশ্রেণির অন্তর্গত। মধ্যশ্রেণিকে কখনও 'ভদ্রলোক'

---

১৫. এ. কে. নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮।

১৬. *Encyclopedia of the Social Sciences*, vol, ix, 15th print, New York, p. 12; Henry pratt Fairchild (ed.), *Dictionary of Sociology*, 4th print, U.S.A. 1979, p. 193.

১৭. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫৭।

১৮. P. B. Horton and R. L. Horton (ed.), *Introductory Sociology*, Illinois, 1977, p. 61.

১৯. Julious Gould and William L. Kolb (ed.), *A Dictionary of the Social Sciences*, New York, 1964, p. 426.

২০. ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯১।

হিসেবেও অভিহিত করা হত। তবু শুধু বিত্তের জোরেই 'ভদ্রলোক' হওয়া যেত না; এর সঙ্গে যোগ থাকতে হত শিক্ষার।"[২১] মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ওয়াকিল আহমদ চিহ্নিত করেছেন একটু ভিন্নভাবে: ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিরা বিত্তের মালিক, তাঁরা সমাজের উঁচুস্তরের লোক; সমাজের নীচের তলায় আছে শ্রমজীবী জনসাধারণ। এই দুই শ্রেণির মধ্যস্তরে 'প্যারাসাইট' বা পরান্নজীবী(পরজীবী) সংখ্যালঘু মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিরাজ করে।[২২]

বিনয় ঘোষ মধ্যবিত্তের ভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন:

> বাংলাদেশে নতুন শ্রেণি রূপায়ণের ফলে সমাজে যে শ্রেণির বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ... মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্তমান আকার যেমন বিশাল হয়েছে, তার রূপও হয়েছে তেমনি জটিল। ... তার মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নগরবাসী না থাকলে আধুনিক যুগের অভ্যুদয় হত না এবং মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের কোন পার্থক্যও কিছু বোঝা যেত না।[২৩]

গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা একটি জটিল বিষয়। তবে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারণা দিয়েছেন এভাবে:

> অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের অবিভক্ত বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলো প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে। এইগুলোর মধ্যে ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলন করা, ভূমি সংস্কার, রেলপথ স্থাপন এবং শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। এই নতুন পদক্ষেপগুলো এদেশের সমাজে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এদেশের সমাজে নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। ... 'উৎকৃষ্ট' (উচ্চবিত্ত) ও 'নিকৃষ্ট' (নিম্নবিত্ত)-র মধ্যবর্তী ছিল এই নতুন শ্রেণি।[২৪]

তবে আমরা যে বুর্জোয়া শব্দটি ব্যবহার করি, বর্তমানে বুর্জোয়া বলতে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বোঝায়, যাদের আয়ের পরিমাণ মোটা; তার নীচে মধ্যশ্রেণি যাদের আয় মাঝামাঝি পরিমাণের এবং তাদের নীচের শ্রেণিকে বলা হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত।[২৫]

আদিতে ইংল্যাণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী সমাজকে বোঝাত। বি. বি. মিশ্র মধ্যবিত্ত গঠনের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

১. আর্থিক বিন্যাসে তারা ছিল মধ্যবর্তী স্তরের– পুঁজিপতি এবং মজুর শ্রেণির তুলনায় তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকত। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান ও আচার-ব্যবহার হতো একই প্যাটার্নের।
২. তারা কতগুলো উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুসারী ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে তাদের এ মূল্যবোধ প্রকাশ পেতো। আদর্শ হিসেবে এ শ্রেণি বুদ্ধির মুক্তি, সামাজিক প্রগতি, ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি উদার দৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয়

---

২১. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯৮।
২২. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৯।
২৩. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪২-১৪৩।
২৪. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩।
২৫. W. C. Smith, *Modern Islam in India, ...,* p. 308-09.

গণতান্ত্রিকতার উপাসক ছিল। এভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সুসংবদ্ধ সমাজে পরিণত হয়ে ওঠে এবং এসব নয়া মূল্যবোধে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে থাকে।[২৬]

বি. বি. মিশ্র মন্তব্য করেন, বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পর জমিদারগণ কর্তৃক সৃষ্ট জোতদার, তালুকদার, গাতিদার, পত্তনিদার প্রভৃতি ভূমি ব্যবস্থার সাথে জড়িত উপস্বত্বভোগীদের নিয়ে ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত ছিল।[২৭] এছাড়াও পাশাপাশি ইংরেজদের সহযোগী বানিয়া, গোমস্তা, দালাল, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি পেশার লোকজনও সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[২৮] এ প্রসঙ্গে মুজাফফর আহ্‌মদ বলেন:

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু যে জমিদার নামীয় একটি পরগাছা সৃষ্টি করিল তাহা নয়, জমিদারেরাও তাহাদের মালিকানা স্বত্বের জোরে অনেকগুলি পরগাছা সৃষ্টি করিয়া বসিল। পওনীদার ও তালুকদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীরাই হইতেছে জমিদারের সৃষ্ট পরগাছা। এই মধ্যস্বত্বভোগীরাও আবার আরো অনেকগুলি নিম্নবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে যে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিস্তার হইল উহার ফলে শুধু যে ব্রিটিশ বণিকেরা লাভবান হইল তাহা নয়; পরন্তু আমাদের দেশীয় বণিকগণের নিকটেও অনেক অর্থ সঞ্চিত হইল।[২৯]

তারাচাঁদ জমিদারদেরও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩০] তবে ভারতীয় শহরগুলোতে প্রধানত সরকারি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে।[৩১] বি. বি. মিশ্র এবং আবদুল মওদুদ উভয়ই ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশ্লেষণ করে নিম্নের কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করেছেন; সেগুলো হলো :

১. কারবার (হৌস) সমূহের ব্যবসায়ী, গোমস্ত, এজেন্ট ও অংশীদারগণ, ডিরেক্টরগণ, উচ্চস্তরের পাইকারি ব্যবসায়ী, উৎপাদকারী ও অর্থদানকারী কারবারসমূহ বাদে।
২. বেতনভোগী ম্যানেজার, ইনস্পেক্টর, সুপারভাইজার, বিশেষজ্ঞ (প্রযুক্তিবিদ), যাঁরা কারবারে, ব্যাংকে, উৎপাদনকেন্দ্রে নিয়োজিত থাকেন।
৩. বণিক সভাসমূহের কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মী ও অফিস কর্মচারী; জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারী।[৩২]
৪. ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারী মালিকবৃন্দ (টেনিওর হোল্ডার); খাজনাভোগী ইজারাদারগণ; জল কর, বন কর প্রভৃতির উপস্বত্বভোগীরা; ভাগ চাষের জমির উপস্বত্ব ভোগীরা।[৩৩]

---

২৬. B. B. Misra, *The Indian Middle Classes in Modern Times*, Oxford University Press, London, p. 7.
২৭. B. B. Misra, op.cit. p. 7.
২৮. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৭০-৭১।
২৯. মুজাফফর আহমদ, *প্রবন্ধ সংকলন*, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২৩৬-৩৭।
৩০. Torachand, *History of the Freedom Movement in India*, vol. ii, 1983, p. 152.
৩১. ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।
৩২. প্রাথমিক যুগে ইংরেজ বণিকের এজেন্ট, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি বা দেওয়ানরূপে এসব শ্রেণির ব্যক্তিরা ইংরেজ রাজশক্তির একান্ত বংশবদ সার্থক ভৃত্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এদের জীবিকা তথা বৈষয়িক জীবনের উন্নতি ছিল সর্বতভাবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের করুণানির্ভর। সম্পূর্ণ অভিনব অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বলে দেশীয় জনগণ ও সমাজ জীবনের সাথে তারা আত্মিক মিল অনুভব করেনি দেশের হয়েও তারা দেশজ নয়। আবদুল মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯; বিস্তারিত দেখুন, অরবিন্দ পোদ্দার, *উনিশ শতাব্দীর পথিক*।
৩৩. ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এসব শ্রেণির লোকদের ভূমির মালিক বানিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের রাজ্যশাসনের ইমারত গড়েছিল– এদের সম্বন্ধে ভর করে ব্রিটিশদের ভারতশাসন হয়েছিল নিরাপদ, নির্ভর ও অত্যাচারে নিঃশঙ্ক। এরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল। আবদুল মওদুদ; *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০।

৫. সরকারি ও অন্যান্য আধা-সরকারি কিংবা স্থানীয় সংস্থাগুলোর কর্মচারী-কর্মকর্তা; জনসংস্থা, শিক্ষা, কৃষি, যানবাহন (রেলসহ) প্রভৃতি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী।
৬. সকল প্রতিষ্ঠানের কেরানি ও অন্যান্য শ্রেণির চাকুরে।
৭. বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকশ্রেণি; লোকাল, মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান সমূহের চাকুরে।[৩৪]
৮. অর্থকরী পেশায় নিযুক্ত আইন ব্যবসায়ী এবং তাদের সহকারি মুহুরি-মোক্তার, কলেজের অধ্যাপক, কবি-সাহিত্যিক-লেখক শ্রেণি, সাংবাদিক শ্রেণি, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী, ধর্ম প্রচারক শ্রেণি ও ধর্মীয় পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা, প্রকাশক ও মুদ্রাকার শ্রেণি।
৯. চা-বাগান প্রভৃতি ক্ষেত্রের ম্যানেজার ও বেতনভুক্ত কর্মচারী।
১০. কৃষি খামারের মালিক জোতদার ও কর্মচারী।
১১. দোকান, হোটেল ইত্যাদির মালিক এবং সেগুলোতে নিযুক্ত ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি কর্মচারী।
১২. বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে, গবেষণাগারে নিযুক্ত শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ।[৩৫]

আলোচ্য তালিকা পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ কীভাবে হয়েছে এবং ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে তা দেখানোর চেষ্টা মাত্র। তবে আবদুল মওদুদ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে প্রধানত ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, শিল্পানুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণি– এ ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

১. **ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি :** আঠারো দশকের মধ্যভাগে পলাশীর পর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয়, যাদের পূর্ব পুরুষরা ছিল ইংরেজ হৌসে ও ব্যাংকিং কর্মে নিযুক্ত দালাল পর্যায়ের। গোমস্ত, মুনিব, বৈশ্য, বেনিয়ান নামে তারা পরিচিত ছিল। মাদ্রাজে তাদের বলা হত দোবাষ। তবে ব্রিটিশরা তাদের বেনিয়ান বলেই উল্লেখ করতো। ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত সমৃদ্ধি লাভের কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়ের অংশীদারি লাভ, ভূমি ও জমিদারিতে অর্থ বিনিয়োগ, আন্তঃশুল্ক বিলোপ, ইউরোপীয় কলোনাইজেশনের বাধা-নিষেধ, ইংরেজ এজেন্সি হৌসের প্রতিষ্ঠা, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদি।[৩৬]
২. **শিল্পানুসারী মধ্যবিত্ত শ্রেণি :** শিল্পক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হয়েছিল ক্ষীণ গতিতে। কারণ শিল্প সৃষ্টিতে যে পরিমাণ অর্থ ও সাধনা-নৈপুণ্যের প্রয়োজন ছিল, তা সমকালীন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির কারও আয়ত্তে ছিল না। এছাড়া কোম্পানির শিক্ষাক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণের চেয়েও বেশি রাক্ষসীসুলভ নীতিই ছিল প্রবল ও অনমনীয়, ফলে ইংল্যাণ্ডের সদ্য শিল্পবিপ্লব সাধকরা ভারতীয় শিল্পের অস্তিত্বও স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। এদেশের বস্ত্রশিল্প ছিল প্রাচীনপন্থায় চরকায় সুতা কাটা ও হাতের তাঁতে বোনায় নির্ভরশীল। এসব কাজ একটি পরিবারই সম্পন্ন করত। এজন্য এদেশের বস্ত্রশিল্প ছিল প্রধানত গৃহ বা কুটিরশিল্প। একথা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৩৭]
৩. **ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণি :** ১৭৫৭ সালে পলাশীর পর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৪ সালে মীর কাশিমকে পরাজিত করে। পরের বছর ১২ আগস্ট ১৭৬৫ সালে বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে এলাহাবাদের চুক্তি করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভ করে। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫, নওয়াব নজমুদ্দৌলার সঙ্গে একটি চুক্তি করে কোম্পানি উক্ত অঞ্চলগুলোর রাজস্ব সংক্রান্ত সকল ভার গ্রহণ করে। এরপর ২৮ বছর ধরে চলে ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন ও পরিবর্তন, অর্থনৈতিক কাঠামোতে আসে আলোড়ন ও বিপ্লব, জমিদার সৃষ্টি, পাঁচশালা-একশালা-দশশালা বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্ব বিষয়ে অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিশেষে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজরা ভূমিতে স্বত্ব চেতনা আনায়ন করে। ফলে ভূমি পরিণত হয় বেঁচা-কেনার পণ্যে। এমতাবস্থায় ধ্বংস-প্রায় শিল্পসমূহের উপায়হীন কর্মীরা, মৃত-প্রায় বস্ত্রশিল্পের তাঁতীরা ভূমির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। এভাবে ইংরেজ রাজ্য সংগঠনের স্তম্ভ হিসেবে একটা বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করে ব্রিটিশরা। এ শ্রেণিটিই

---

৩৪. এঁরাই ব্রিটিশ সরকারের আমলের বাবুর দল। কলমপেশায় শারীরিক পরিশ্রম হলেও তাঁরা শিক্ষিত এবং সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের চেয়ে সংস্কৃতিমনা।
৩৫. B. B. Misra, *op.cit.*, p. 12-13; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩; আবদুল মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০।
৩৬. আবদুল মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৯।
৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

শাসক-শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ যেভাবে করেছে, তেমনি নিজেদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমির মালিকও হয়েছেন এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[৩৮] তাইতো কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছে এভাবে, "মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তাঁহারাই হন; অথচ জমি কর্ষক চাষীর জমিতে স্বত্ব রইলো অনির্দিষ্ট এবং সর্বদা উৎখাতযোগ্য– সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।"[৩৯] লর্ড ক্লাইভ এর একটা উক্তিতেও এ শ্রেণির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "দেওয়ানী লাভের পর আমরা পুরাতন আমলা ও ইজারাদারদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলেম, কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ সব তথ্য তাদের নিকট থেকে সংগৃহীত হতো এবং পারস্পরিক স্বার্থের সূত্রে আমরা ভাব ছিলেম। নীতিগতভাবে আমরা এদেশী লোকদের তুষ্ট করতে সব রকম চেষ্টা করেছিলেম।"[৪০]

এছাড়া ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যে ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত জনসমষ্টি তথাকার শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদেশের বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শিক্ষিত ও বেতনভোগী ব্যক্তিরাই পেশাধারী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রভাবশালী। উনিশ শতকের শেষের তিন দশকে বাংলার আইনজীবী, সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার, পণ্ডিত, লেখক, সাংবাদিক প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায় শিক্ষা, বিচার এবং প্রশাসনিক বিভাগে। এসব শ্রেণির পেশাধারী ব্যক্তিরাই ছিলেন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিরোমণি। এ শ্রেণির বিকাশ হয় ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপনের পর এবং তার অগ্রগতি বেগবান হয় ১৮৮০ সালের পর।[৪১] এ শ্রেণির বিকাশ ও প্রভাব অক্ষুণ্ন ও সর্বব্যাপী ছিল ১৯২০ সাল পর্যন্ত। তারপর বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, বাণিজ্য ও শিল্পসেবীরা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

বাংলায় পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, সরকার, মুনশি ব্রিটিশ সাহেবদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা সাহেব মুখ থেকে কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ যেমন–yes, no, very good, wellইত্যাদি শব্দ শুনে মনে রাখতেন এবং এ শব্দগুলোকে যথাসময়ে ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে নিতেন। তাঁদের শেখা শব্দের ভাণ্ডার শেষ হলে কোনরকম মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করে বক্তব্যের বিষয়টি সাহেবদের বুঝিয়ে দিতেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে,

> What they could not express by words was indicated by signs; and thus many a native contrived by supplementing the inadequacy of his expression with the gesticulations of his body, to make himself intelligible to his Europen master with no ampler philological resources than the scanty stock of four words 'yes', 'no', 'very well.[৪২]

১৭৭৪ সালে কলকাতায় 'সুপ্রিম কোর্ট' স্থাপিত হবার পর এ অঞ্চলের মানুষের ইংরেজি শেখার কিছুটা আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু তখনো ইংরেজি শেখা যায় এমন স্কুল বলতে কিছু ছিল না। উৎসাহী বাঙালিরা নিজে কিছু ইংরেজি শিখে অন্যকে শিখাতেন। দু-চার জন ফিরিঙ্গি নিজ বাড়িতে ছাত্র নিয়ে অথবা বড়লোক বাবুদের

---

৩৮. আবদুল মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪।
৩৯. ফরিয়াদ, *নজরুল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।
৪০. *Clive to Court,* 29 September, 1765.
৪১. আবদুল মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
৪২. Ramcomul Sen, *English-Bengali Dictionary,* Calcutta, 1834, Introduction.

বাড়িতে নিজেরা গিয়ে ইংরেজি শিখাতেন।[৪৩] রামনারায়ণ মিশ্র, ভবানী দত্ত, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বোস সহ আরও দু-চারজন ইংরেজি শব্দ নোটবুকে লিখে অন্যদের শিক্ষা দিতেন এবং এ জন্য ৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা সম্মানি নিতেন।[৪৪] ফিরিঙ্গিদের মধ্যে শেরবোর্ন জোড়াসাঁকোয় একটি ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ স্কুলে দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষালাভ করেছিলেন। Martin Bowl-এর বিদ্যালয় ছিল আমড়াতলায়, শীল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এখানে শিক্ষা নেন। Aratoon Petroos এর বিদ্যালয়ে ৫০/৬০ জন বাঙালি ছাত্র ইংরেজি শিখত বলে জানা যায়।[৪৫]

ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে নবযুগের একটি নতুন সামাজিক লক্ষণ দৃশ্যমান হয়েছিল। বিত্ত ও বিদ্যা কুলবৃত্তিগত বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী Alfred Von Martin বলেন,

> Commerce and knowledge had emancipated themselves: no longer should there by any superior authority, human or otherwise, to keep them in leading strings. Men felt that they had at last attained their majority in matters economic, political and intellectual.[৪৬]

বহুকাল পরে মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। তাই সুপ্রিমকোর্টের ইংরেজ অ্যাটর্নিদের কেরানি যাঁরা বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি শিক্ষক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কনৌজ ব্রাহ্মণ থেকে কায়স্থ, বণিক, নাপিত সকল শ্রেণির মানুষকে দেখা যায়। বাংলাদেশে ইংরেজি বিদ্যা যে কুলবৃত্তিগত বন্ধন শিথিল করে সামাজিক মর্যাদা লাভের নতুন পথ খুলে দেবে, ইংরেজি শিক্ষার প্রথম অবস্থায়ই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।[৪৭]

বাংলায় পাশ্চাত্য বিদ্যার সাথে প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয় ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার পর। এ কলেজই ছিল নবযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির প্রথম সূতিকাগার। উনিশ শতকের বাংলায় ষাট-সত্তর দশক পর্যন্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণে এই বুদ্ধিজীবীরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এ কলেজের তরুণ ছাত্রদের মন-মানসিকতা, বুদ্ধি ও চিন্তার জগতকে প্রসারিত করেছিল। লালবিহারী দে বলেন,

> The young men brought up in the Hindu College began to study the works of Bacon, Locke, Berkely, Hume, Reid, and ofDugald Stewart. A thorough revolution took place in their ideas ...they began to reason, to question, to doubt. [৪৮]

৪৩Rev. Lal Behari Day, *Recollections of Alexander Duff*, London, 1879, p. 22.
৪৪. Ramcomul Sen, *op.cit.*, Introduction.
৪৫. George Smith, *The Life of Alexander Duff*, vol. i, London, 1879, p. 96.
৪৬. Alfred Von Martin, *Sociology of the renaissance*, (London, 1945), p. 39.
৪৭. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬১।
৪৮. Lal Behari Day, *op.cit.*, p. 28.

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট প্রমুখ মনীষী ও চিন্তানায়কদের লেখা পাঠ করে যে নতুন এক জ্ঞানরাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, এর প্রভাবে তাঁদের চিন্তাজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। ফলে তাঁরা বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করতে শিখেন। ১৮৩০ সালে বিখ্যাত মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ ভারতে আসেন, তখন হিন্দু কলেজে ৪৩৫ জন ছাত্র ছিল এবং ধারণা করা হয় যে১৮১৭-১৮৩০ সালের মধ্যে ১৩ বছরে অন্তত ১০০০/১২০০ ছাত্র এই কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৪৯] ডাফ হিন্দু কলেজকে বলেছেন, "The very beau-ideal of a system of education without religion."[৫০] কেননা কলেজটিতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার সহজ হবে তিনি তা ভাবতেন।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেন্টিঙ্ক-মেকলের উদ্যোগে ১৮৩৫ সালে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেবার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পূর্বেই বাংলায় আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাথমিক বিকাশ হয়েছিল। তাঁদের সংখ্যা ১৮ বছরে ২০০ করে হলে ৩৬০০ এবং অন্যান্য ইংরেজি স্কুল ধরলে সব মিলিয়ে ৪০০০-৫০০০ এ উন্নতি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির একটি স্তরেরও বিকাশ লাভ করে এবং সামাজিক পরিবর্তনে তাঁরা অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁরা এক পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত হন এবং ক্রমান্বয়ে নেতৃস্থানীয় অবস্থায় উন্নীত হন।[৫১] উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে জাতীয়তাবাদের জাগরণেএই বুদ্ধিজীবী শ্রেণিই নেতৃত্ব দেন।হেনরি কটনের বক্তব্যে তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, " The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawar to Chittagong."[৫২] বাংলার সমাজের জাতিবর্ণভেদ সমাজ সংস্কারেও ইংরেজি শিক্ষিত এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি অগ্রণী হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮১৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। বাংলার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যা মূলত টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা নির্ভর তা কোম্পানি সরকারের দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিল। উইলিয়াম অ্যাডামের ১৮৩৫-১৮৩৮ পর্যন্ত ৩টি রিপোর্ট তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিক্ষার জন্য বাৎসরিক সর্বপ্রথম ১৮১৩ সালে এক লক্ষ এবং ১৮৩৩ সালের অ্যাক্টে বাড়িয়ে দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু উক্ত টাকা প্রাচ্য না পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে, সে বিষয়ে সরকার কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষার বিষয় নিয়ে দেশি-বিদেশি বিদ্যোৎসাহীদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়। আর এ বিতর্কের নিষ্পত্তি হয় ১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক-মেকলের ইংরেজি শিক্ষার আদর্শ সরকারি নীতি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার পর।[৫৩] বেন্টিঙ্ক-মেকলের সাথে বাংলার শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যোগ দেন উইলিয়াম অ্যাডাম।[৫৪] মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষার প্রতি অ্যাডামের অনুরাগ প্রশংসার যোগ্য। বাংলার শিক্ষিত শ্রেণির আধুনিক কালোপযোগী জ্ঞানার্জন

---

৪৯. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১।

৫০. Rev. Alexander Duff, *India and India Missions*, Edin, 1840, p. 632.

৫১. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৩।

৫২. H. J. S. Cotton, *India in Transition*, London, 1885, p. 15.

৫৩. H. Sharp, *Selections from Educational Records*, part I, 1781-1839, Calcutta, 1920.

৫৪. উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্ট দাখিল করেন ১ জুলাই ১৮৩৫, ২য় রিপোর্ট ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৫ এবং ৩য় রিপোর্ট ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

স্পৃহার উপর ধারণা করে তিনি জাতীয় শিক্ষার যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তা অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থনে প্রিন্সেস উইলসনের মতো অ্যাডামের যুক্তিও প্রায় একই রকম। অ্যাডাম বলেন,

> There is no class of persons that exercises a greater degree of influence in giving native society the tone, the form and the character which it actually possesses than the body of the learned not merely as the professors of learning, but as the priests of religion; and it is essential to the success of any means employed to aid the moral and intellectual advancement of the people that they should not only co-operate but also participate in the progress.[৫৫]

অ্যাডাম মেকলের 'filtiration theory' এর সমর্থক ছিলেন। জ্ঞানবিদ্যা সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে আরোহণ করে না, উচ্চ থেকে নিম্নস্তরের দিকে প্রবাহিত হয়, অনেকটা পানির ধারার মতো, এটাই ছিল বাংলার ইংরেজি শিক্ষার প্রবক্তা মেকলের মতো জাতীয় শিক্ষার প্রবক্তা অ্যাডামেরও ধারণা।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং ১৮৩৫ সালের মধ্যে তা একটি পর্যায় অবস্থান নেয়। মেকলে তাঁর 'মিনিটে' যে ইংরেজি শিক্ষিত 'higher class of natives at the seats of Government' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তা প্রধানত কলকাতা শহরের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে করে। মেকলের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল এমন একটি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তোলা, যাঁরা গয়ের চামড়া, রং ও রক্তে পুরোপুরি ভারতীয় থাকলেও মনন, রুচিবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদির দিক থেকে তাঁরা হবেন খাঁটি ইংরেজ।ইউরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার প্রসারণে এবং ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণে উৎসাহী ও অগ্রণী হবেন স্বভাবতই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সহজে বীতশ্রদ্ধ হবেন না। ১২ অক্টোবর ১৮৩৬, মেকলে তাঁর পিতাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, " There would not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence..."[৫৬]

লক্ষণীয় যে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজি শিক্ষা স্বভাবতই উচ্চশ্রেণির বিত্তশালী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শোভাবাজরের দেব পরিবার, রামবাগান হাটখোলার দুই দত্ত পরিবার, জোরাসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার, মল্লিক-লাহা-শীল পরিবারের মধ্যে কেউ কেউ এবং এরকম আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবার উনিশ শতকে বেশ কিছুকাল প্রায় পুরুষানুক্রমে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার বিদ্বৎসমাজে প্রভুত্ব করেছিলেন। এ সকল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতাগণ ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে কোম্পানির ব্যবসায়িক এজেন্ট বা দালাল হিসেবে প্রচুর বিত্তের মালিক হয়েছিলেন এবং কলকাতার অভিজাতগোষ্ঠীতে নাম লিখিয়েছিলেন। এ সকল পরিবারের সন্তানরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল; যা

---

৫৫. William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1834)*, ed. by Anath Nath Basu, Calcutta University, 1941, p. 429.

৫৬. G. O. Trevelyan, *Life and letters of Lord Macaulay*, 1908 (ed.), p. 329-330, Eric stokes Gi MÖš' '*The English Utilitarians and India*', Oxford, 1959, থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৬।

পরবর্তীকালে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যার বদৌলতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, পুরাতন ঐতিহ্যপন্থি পরিবারের সন্তানও কীভাবে অর্জিত বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়েছিলেন, তা অনেকেরই জানা। বিদ্যাসাগরের মতো স্বল্পবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও বিদ্যার বিনিময়ে বিত্ত এবং উভয়ের সমন্বয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এরকম ব্যক্তির সংখ্যা উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত অনেক ছিল। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিতরাই বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন।[৫৭]

কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭) পর থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি শিক্ষিতদের কদর বাড়তে থাকে। এ সময় থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং সুযোগও ক্রমশ বাড়তে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি পড়ুয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাজারমূল্য চাকুরির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। *সংবাদ প্রভাকর* ১৮৬০ সালে প্রকাশ করে:

> প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসরকালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ২১০ জন ইংরেজি ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্যা ছাত্র বি. এ. উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রৈবাৎসরিক ফল দেখিয়া বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে দেশীয়দের সামাজিক কোনো উপকার দর্শিয়াছে কি না? ... কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রগণেরই মন ইংরেজি ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইংরেজি ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা।[৫৮]

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে ইংরেজি শিক্ষা একটি বড় সামাজিক মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি আসক্তি বাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করে *সোমপ্রকাশ* (১৮৮১-১৮৮২) প্রত্রিকায় লিখা হয়:

> আমাদিগের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়ে কৃতী হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, এ চেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের অন্তঃকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হন না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতা-মাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর যত সমাদর এমন কিছুরই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা তত শ্রবণ সুখকর ও নয়ন তৃপ্তির নহে। সাহেবের সহিত দুটা কথা কহিলে, সাহবে ভাল বলিলে চাকুরে ভাবে গদগদ হইয়া থাকেন। যিনি বড় চাকুরী করেন, যিনি মোটা বেতন পান অধুনা সমাজে তাহাদিগের মত সম্মান, স্বদেশের উপকার সাধন অথবা স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া তদপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জন করিতেছেন তাঁহার সমাদর নহে। যিনি বড় চাকুরী করেন, মোটা বেতন পান তাঁহার পিতা-মাতা, বড় চাকুরের পিতামাতা মনে করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন।"[৫৯]

---

৫৭. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৭০।
৫৮. *সংবাদ প্রভাকর*, ১৮৬০, পৃ. ১৭০।
৫৯. *সোম প্রকাশ ,১৮৮২।*

এভাবে শিক্ষিত চাকুরিজীবীর মর্যাদা ও তাঁদের পারিবারিক সম্মান বাড়ার কারণে কৃষক পর্যন্ত আদি ব্যবসা পরিত্যাগ করে চাকুরির প্রত্যাশা ও চেষ্টা করতে থাকেন।ফলে মাসিক দশ-পনের টাকা বেতনের একটি চাকুরির জন্য দশ হাজারের অধিক প্রার্থী জমায়েত হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।[৬০]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এর প্রধান লক্ষ হল চাকুরি। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে (১৮৫৪-৫৫), "যে সকল বাঙালির প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরি অথবা মুন্সেফি কিম্বা সদর আমীন ইত্যাদি যে যে কার্যে ভার অর্পিত হইয়াছে তত্তাবতই তাঁহারা সখ্যাতিভাজন হইয়াছেন।"[৬১] কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালি শিক্ষিত জনবল উচ্চপদে উন্নীতহতে পারতেন না। তাছাড়া বেতন কাঠামোতেও ব্যবধান ছিল বিস্তর। এমন অনেক চাকুরি আছে যেখানে বড়সাহেবের বেতন হয়তো ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা, সেখানে তাঁর পরবর্তী বাঙালি সহকারীর বেতন ২০০-২৫০ টাকা।

তারপরও বাঙালির পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৮৫৭-১৮৮১ সালের মধ্যে ২৫ বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং শিক্ষিতের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪৪,৯৩৫ জন এনট্রান্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ২০,৫০৩ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১৬,২৯২ জন উত্তীর্ণ হয়। যা বছরে গড়ে প্রায় ৬৫২ জন। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত (১৮৯৯-১৯০০) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙালির সংখ্যা হয় প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) জন।[৬২]

মধ্যবর্তী স্তরে 'ফার্স্ট আর্টস' (F. A.)পরীক্ষা প্রথম শুরু হয় ১৮৬১ সালে। ১৮৬১-১৮৮১ সালের মধ্যে F. A. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় ১১,৮৯৪ জন এবং উত্তীর্ণ হয় ৪৭২৪ জন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ও আসামের ৩৮৭৭ জন। এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ৩৭০০ জন। বি. এ. (B. A.) পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৫৮ সালে। ১৮৫৮-১৮৮১ সালের মধ্যে ৪১১৫ জন অংশ নিয়ে ১৭১২ জন উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ১৪৯৪ জন। এম. এ. (M. A.) পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৬১ সালে। ১৮৬১ সালে ১ জন এবং ১৮৬২ সালে ৩ জন এম. এ. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। প্রথম এম. এ. পাস করেন ৬ জন ১৮৬৩ সালে।

---

৬০. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*,পৃ,১৭০-৭১।
৬১. *সংবাদ প্রভাকর,১৮৫৫।*
৬২. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*,পৃ,১৭২-৭৩।

১৮৮১ সালের মধ্যে মোট ৬৭৮ জন অবতীর্ণ হন এবং ৪২৩ জন উত্তীর্ণ হন। তাঁদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ৩৪৪ জন।[৬৩]

ইংরেজি শিক্ষিত গ্রাজুয়েট মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল চাকুরি, যা এখনও আছে। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত ১৭০০ গ্রাজুয়েটের চাকুরিক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিল তা হলো–

সারণি-১[৬৪]

(গ্রাজুয়েট)	
সরকারি চাকুরি	৫২৮ জন
বেসরকারি চাকুরি	১৮৭ জন
বেকার	৬৩৫ জন
খবর জানা নেই	৩২০ জন
মৃত	৪২ জন

শিক্ষিত বাঙালির স্বাধীন পেশার মধ্যে ওকালতি, ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত সমাজের বৃহত্তর অংশই এসব পেশায় আসার তুমুল আগ্রহের কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল এ সময়ের একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে এসকল স্বাধীন পেশা ছেড়ে অনেকে শিক্ষকতাকে বেছে নেন। অন্যদিকে, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে বা কর্মসূত্রে আর্থ-সামাজিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা রাজনীতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত প্রসারের ফলে ক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে তাঁদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বেড়েছিল। উকিল, ডাক্তার, মোক্তার ও শিক্ষকরা দেশের রাজনৈতিক মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রভাবে এবং প্রসারে অভিজাত জমিদার শ্রেণি ও ধনিকরা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। Indian Councils Act, ১৮৯২ পাস হবার পর 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বাংলা গভর্নমেন্টের কাছে যে আবেদনপত্র পেশ করে তাতে অভিজাত জমিদার শ্রেণির ক্ষমতা হ্রাস এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ পায়।[৬৫] আবেদনপত্রে তাঁদের বক্তব্য ছিল যে,

> The committee submits that rules do not in any way provide for the adequate representation of important native interests in the council. Any scheme of representation which does not recognise the claims of wealth, property and social position is radically defective-emphasis added.[৬৬]

আবেদনটিতে মধ্যবিত্তের মধ্যে উকিল, মোক্তার ও স্কুল শিক্ষকদের সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষীয় সভা'র ভয় সর্বাধিক। উকিল, ব্যারিস্টারদের বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিতদের প্রতিপত্তির ব্যাপারে 'ভারতবর্ষীয় সভা' অভিযোগ করে

---

৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৭৬।

৬৪. Krishna Ch. Roy, High Education and the Present Position of the Graduates in Arts a Law of the Calcutta Univeristy. Reprinted with corrections form The Hindo Patriot of the 23rd ocrober 1882. A Convocation Addresses, Univeristy of Calcutta, vol. I, 1858-1879.

৬৫. B. Convocation Addresses, University of Calcutta, vol. II, 1880-1898; বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬-১৭৯।

৬৬. উদ্ধৃতি, বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০।

যে, তাঁরা অতিমাত্রায় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, অথচ দেশটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও জমিদার বা কৃষক কারও প্রতি কোন সহানুভূতি বা সহমর্মিতা নেই। তারা মনে করেন, এ দেশে জমিদার ও কৃষকদের যে-কোন প্রতিনিধি সভায় সর্বাগ্রে স্থান নির্দিষ্ট থাকা উচিত।[৬৭]

উনিশ শতকের অগ্রযাত্রায় মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৫-০৭ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বছল ১৯৩৫ জন গ্রাজুয়েট হয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে ওকালতি বৃত্তি গ্রহণ করেছে গড়ে প্রায় ৫৪০ জন যা শতকরা ২৫ জনেরও বেশি।[৬৮] এদের মধ্যে বাঙালি আইনজীবীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কারণ, আইন পেশাটি ছিল স্বাধীন, ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচরণের সুযোগ বেশি থাকায় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ সুযোগ গ্রহণে ছিল অগ্রণী।[৬৯]

মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশও সে সময়কার আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ফল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক পদমর্যাদা, রাজনৈতিক মতাদর্শ বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি মূলত হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই বাস্তব ফল।

ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি হয়েছিল প্রথম ১৮৭২ সালে এবং এরপর দ্বিতীয় আদমশুমারি হয়েছিল ১৮৮১ সালে। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা বেশি। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন[৭০] ব্যর্থ হলে মুসলমান সমাজে তা ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তবে ১৮৭১ সালের মধ্যে এ সকল ইসলামি সংস্কার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। শুরুতে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের মনোভাব নেতিবাচক থাকার কারণে বাংলায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কেননা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সুযোগ-সুবিধা মুসলমানরা গ্রহণ করতে পারেনি; এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনারও বিকাশও ঘটেনি। মুসলমানরা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রাদায়ের তুলনায় বিলম্বিত হয়। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মুসলমানদের অনগ্রসরতা দূরীকরণে বিশেষ কিছু সুপারিশ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে

---

৬৭. C. H. Philops (ed.), *Selected Documents of the History of India etc.*, vol. IV, London, 1962, p. 130-33.
৬৮. *Progress of Education in India*, 1902-7, vol. I, P. 34-35.
৬৯. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১।
৭০. বাংলায় এ ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং দুদু মিয়া, সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও তিতুমীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মঈন-উদ-দীন আহমদ খান, (অনু. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া), *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭; আবদুদ মওদুদ, *ওহাবী আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৫।

১৮৮৫ সালে মুসলমানদের শিক্ষা ও চাকুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব জাগ্রত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংরেজি ও পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসে এবং নিজেদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে। এরই ফলে মুসলমান সমাজে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। তাঁদের আকার ছোট হলেও মুসলমান সমাজের দাবি-দাওয়া, অনগ্রসরতা সম্পর্কে সোচ্চার হয় এবং মুসলমান সমাজের অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাংলার মুসলমানদের চাকুরি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযোগ্য স্থান প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ শ্রেণির বিকাশ ১৯২০ সালের মধ্যে চূড়ান্ত রূপ লাভ করলেও উনিশ শতকের শেষপাদে তারা বলিষ্ঠ হতে থাকে। তাঁদের ইতিবাচক ভূমিকার কারণেই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়।[৭১]

উদ্ভব ও প্রকৃতি নিয়ে পাশ্চাত্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য বা সম্পর্ক বিষয়ে ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। এ দুই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম প্রতিবেশী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের অনেক পরে। এর মূল কারণ ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে বাংলার মুসলমানদের অনীহা। এমনকি ব্রিটিশ প্রবর্তিত নীতিতেও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের আগ্রহী করে তুলতে তেমন কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি একথাও অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। *Census of East Pakistan*-এ বলা হয়েছে: "During earlier period of British rule the Muslims showed apathy towards English Education, and indifference to business"[৭২]অনেকেই মনে করেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিল বাংলার মুসলমান সমাজ। তাই উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি অফিস-আদালত ও রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন প্রতাপের সাথে বিচরণ করেছিলেন, তখন বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব চোখে পড়ার মত ছিল না। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের মন্তব্য হলো,

> ১৮৩৫ সালে যখন কলিকাতা শহরের আট হাজার মুসলমান মেকলের ইংরেজী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ১৮৫০ সালে তখন মাদ্রাসার ইংরেজ অধ্যক্ষকে মুসলমান ছাত্ররা ইট পাটকেল ও পঁচা ডিম ছুঁড়ে মেরেছিলেন, ... তখন ... হিন্দু সমাজে ক্রমবর্ধমান একটি শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী মধ্য শ্রেণির বিকাশ হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নূতন একটি বিদ্বৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মুসলমান সমাজে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ তো একেবারেই হয় নি, পুরাতন অভিজাত সমাজ ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে এবং দরিদ্র ও নিঃস্ব শ্রেণির সংখ্যা বেড়েছে। নূতন কোনো বিদ্বৎ সমাজেরও বিকাশ হয় নি।[৭৩]

---

৭১. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১-৩।
৭২. Census of East Pakistan, 1951, p. 102;মোঃ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১১।
৭৩. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২৪।

বিত্তশালীদের মধ্য থেকে হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উৎপত্তি হয়েছে বেশি। কিন্তু বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল দরিদ্র ও নিঃস্ব শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে বিত্তশালী মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য।[৭৪] সাংস্কৃতিকভাবে নেতৃত্বে ছিলেন শরিফ শ্রেণির মুসলমানরা; তাঁদের প্রতিপত্তি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করত।[৭৫] তবে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে তাঁরা দুর্দশায় পতিত হয়।[৭৬] তাঁরা সমাজের কল্যাণ সাধনে এবং নিজেদের উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নাজমুল করিম বলেন, "এঁরা ছিলেন চিন্তার দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ ও সামন্তবাদী মানসিকতাসম্পন্ন"।[৭৭] এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ১৮৫৭ সালের পর নানান ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে মুসলিম সমাজ বুঝতে পারে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে হবে। উল্লেখ্য, মুসলিম সমাজে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। তাই মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইংরেজি শিক্ষার ফলে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে একটি শিক্ষিত শ্রেণির জন্ম হতে থাকে। এ শ্রেণিটি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করে সমাজে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। ফলে মুসলমান সমাজের নেতৃত্বও ক্রমশ অভিজাত শ্রেণির কাছ থেকে এঁদের কাছে চলে আসে। এক পর্যায়ে এঁরাই বাংলার মুসলমান সমাজে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।[৭৮] অতএব এ শ্রেণি সৃষ্টির মূলে ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা।

বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এ বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়া প্রয়োজন।১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তনের পরবর্তী সময়ে মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠেছিল মূলত বহিরাগত ও এদেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিয়ে। শাসক, তাঁদের পরিবার, প্রশাসনিক কর্মচারী, সৈন্য, আমীর-ওমরাহ, ওলেমা, সুফি-দরবেশ, ব্যবসায়ী, দাস-দাসী, ভাগ্যান্বেষী দল প্রভৃতি ছিল বহিরাগত মুসলমান।[৭৯] নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের থেকে ধর্মান্তরিতরাই ছিলেন এদেশীয় মুসলমানদের অধিকাংশ। বহিরাগত ভাগ্যান্বেষীদের আগমন এবং ধর্মান্তকরণের ফলে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৮০] কিন্তু সাড়ে চারশত বছরের অধিক সময় মুসলমান শাসন সত্ত্বেও উনিশ শতকের শুরুতে[৮১] মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার করুণ পরিণতি লক্ষণীয়। বাংলার শিক্ষা বিষয়ে উইলিয়াম অ্যাডামের তিনটি জরিপে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম সমাজ সম্পৃক্ত তাঁর মতামত ছিল:

---

৭৪. Census of Bengal, Report, 1872, p. 131.
৭৫. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bangal, 1903-1908,* Delhi, 1973, p. 410.
৭৬. W. W. Hunter, *The Indian Mussalmans*, Calcutta, 1945, p. 161.
৭৭. A. K. Nazmul Karim, *The Changing Society of India and Pakistan,* Dacca, 1961, p. 166.
৭৮. ইমরান হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪।
৭৯. Abdul Karim, *A Social Hisotry of the Muslims of Bengal,* Chittagong, 1985, p. 189.
৮০. K. K. Aziz (ed.), *Ameer Ali: His life end work,* Lahore, 1968, p. 274.
৮১. তখনও ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব পুরোপুরি পড়েনি।

> The Hindus, with exceptions, of course, are the principal zamindars, talookdars, public officers, men of learning, money landers ... ... while the Musalmans, with exceptions also, form a very large majority of cultivators of the ground and of day laborers, and others engage in the very humblest form of mechanical skill and ... ... in few instances attracting the attention of those who do not mix much with the humbler classes of the people or make special inquiry into their occupations and circumstances.[৮২]

তৎকালীন বাংলার হিন্দু-মুসলমানের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এবং মুসলমানদের সমাজের বৃহত্তর অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় যে পশ্চাদপদ ছিল তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বাংলায় প্রথম আদমশুমারির পূর্ব পর্যন্ত এদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা অজানা ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলার হিন্দুদেরকে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হত। প্রথম আদমশুমারি থেকে প্রমাণ হয় বাংলার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু-মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় সমান। তবে ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বেশি। এ সময় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৭৮,৬৩,৪১১ ও ১,৭২,৫৪,১২০ জন।[৮৩] তবে লক্ষণীয় যে, বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত এবং শহরে বসবাসরত মুসলমানের সংখ্যা ৩.৫% বেশি ছিল না। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ২৫% পর্যন্ত শহুরে ছিল।[৮৪] ১৯০১ সালে বাংলার ৪টি বিভাগে শহরবাসী লোকসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান নিম্নের সারণী ২ থেকে জানা যায়।

সারণী-২[৮৫]

প্রতি দশ হাজার শহরবাসীর মধ্যে				
অঞ্চল	হিন্দু	মুসলমান	খ্রিস্টান	অন্যান্য
পশ্চিমবঙ্গ	৮১৫৮	১৭৪৭	৮৫	০৩
মধ্যবঙ্গ	৬৭১৭	২৯১৫	৩০১	৬৬
উত্তরবঙ্গ	৫৩৭০	৪২১০	১১৫	৩০১
পূর্ববঙ্গ	৫২৮৫	৪৫৬১	৬৮	৮৫
গড়	৬৩.৮২%	৩৩.৫৮%	১.৪২%	১.১৩%

বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁদের সামাজ ও রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এ সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য জানার ফলে তাঁদের মধ্যে আত্ম-সচেতনতাবোধ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের স্বাধিকার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রেরণা যোগায়। অন্যদিকে মুসলমানদের এ সংখ্যাবৃদ্ধি তথ্য হিন্দু সমাজের একটি রক্ষণশীল অংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তারা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।[৮৬] ১৮৭২ সালের আদমশুমারির পর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল এভাবে:

> নিজ বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান সমান। মুসলমান অপেক্ষা পাঁচলক্ষ অধিক মাত্র হিন্দু আছে। তবে হিন্দুগণের প্রাধান্য এই যে, মুসলমানরা প্রায় কৃষক এবং সামান্য শ্রেণির লোক। ভদ্রলোক অধিকাংশই হিন্দু,

---

৮২. Adam's Reports on Vernacular Educaiton in Bengal and Bihar, Section I, Cal. 1968, p. 92.
৮৩. Census of Bengal, 1872, General Statement, IB p. xxxii-xxxiii.
৮৪. Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism, London, 1968, p. 303-4.
৮৫. *Census of India*, 1901, vol. VI, part-1, p. 205.
৮৬. কংগ্রেসের গোঁড়াপন্থি হিন্দু মহল, হিন্দু মহাসভা, কয়েকটি হিন্দু ধর্ম-রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন– মাতৃসনদ, হিন্দু মিলন ইত্যাদি। অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৮৮।

কিন্তু তাই বলিয়া এই বঙ্গদেশকে কেবল হিন্দুদের দেশ বলা যায় না। যেমন ইহা হিন্দুর দেশ, সেইরূপ ইহা মুসলমানদের দেশ।”[৮৭]

সরকারি বিভিন্ন তথ্য বিবরণী থেকে দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথমার্ধেও বাংলার কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান এবং জমিদার শ্রেণি প্রায় সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। এ সব জমিদারদের অত্যাচারে কৃষকরা ছিল জর্জরিত। মুসলিম আমলেও জমিদারদের অত্যাচার ছিল। তবে সে সময় কৃষি ও শিল্পের অবস্থা উন্নত ছিল। কোম্পানি ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, তাঁত প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের উপর অত্যাচারের ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্প প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কারণ বাংলার সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি কৃষি, তাঁত ও যৌথ পেশার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ প্রসঙ্গে *Census of India*-তে বলা হয়েছেঃ

> Muhammadans almost double the numbers of Hindus almost the ordinary cultivators but among the landlords and middlemen Hindus are nearly thrice as many as Muhammandans and now a days all the great zamindars are Hindus.[৮৮]

কার্ল মার্কসের ভাষ্য মতে,

> জমির উপর সাধারণ অধিকার কৃষক ও হস্তশিল্প সংমিশ্রণ এবং এমন একটা অপরিবর্তনীয় শ্রম বিভাগ যাহা কোন নূতন গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র একটা ছক কাটা নিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহাই ছিল গ্রাম সমাজের বৃত্তি। সর্বাপেক্ষা সরল রূপের গ্রাম-সমাজে সকলে একত্রে মিলিয়া জমি চাষ করিত এবং সমাজের সকল সভ্যের মধ্যে ফসল ভাগ করা হইত। তার সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারের সাহায্যকারী শিল্প হিসাবে সুতা কাটা ও কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক আকাশের ঝড়-ঝঞ্ঝা সমাজের স্পর্শই করত না।[৮৯]

বাংলায় ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থা এ অপরিবর্তনীয় সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে প্রায় চুরমার করে দেয়।[৯০] এর উপর বিষ ফোঁড়ার মত ছিল মহাজনের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচার। জনৈক কৃষকের জবানিতে জানা যায়, “আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা ও মৃত্যু ঋণের মধ্যেই। আমি আমার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ঋণের বোঝা লাভ করেছি এবং আমার মৃত্যুর পর তা আমার ছেলের ঘাড়ে চাপবে।”[৯১] নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ কৃষকদের দুর্দশার আরেকটি উপসর্গ। *সংবাদ প্রভাকর* সম্পাদকীয়তে লিখেছে– “জিলা মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতেই নীলকরের অত্যাচার প্রবল রহিয়াছে। ঐ সমুদয় সাহেবের কুটির অধীনস্থ ও নিকটস্থ প্রজাপুঞ্জের দুঃখ বর্ণনা করিতে হইল হৃদয় অমনি বিদীর্ণ হইয়া যায়।”[৯২]

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়াকোম্পানি শুরু থেকেই বাংলায় নির্মম শাসন চালু করে। অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও কোম্পানি কৃষকদের খাজনা শিথিল বা রেয়াত করেনি। বাংলার নায়েব রেজা খান অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও ভয়াবহ

---

৮৭. *বঙ্গদর্শন*, চৈত্র, ১২৭৯ বাংলা, পৃ. ৪৯৯।

৮৮. Census of India, 1921, vol. V, part I, p. 414.

৮৯. Karl Marx, *Capital*, vol. I, London, 1967, p. 391; উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৪-৫।

৯০. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, *উপনিবেশকতা প্রসঙ্গে*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ৩৮।

৯১. উদ্ধৃতি, Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal*, New Delhi, 1976, p. 19.

৯২. বিনয় ঘোষ, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৯।

দুঃসময়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন বেশি পরিমাণ খাজনা আদায়ের চেষ্টা করেছেন।[৯৩] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জনগণ গ্রামান্তর হয় এবং গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে পড়ে। তবে খাজনা আদায়ের পরিমাণ তেমন কমেনি। ১৭৬৮-৬৯ সালে বাংলায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১,৫৮,৭৩,৪৫৩ টাকা এবং ১৭৭১-৭২ সালে মন্বন্তরে পর প্রায় সম পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হয় (১,৫০,২৩,২৬০ টাকা)।[৯৪]

অনেকেই বলেন যে, প্রাক ব্রিটিশ আমলে মুসলমানরা শাসক ছিলেন বিধায় বাংলার সমাজে তাদের সমৃদ্ধি ও প্রভাব ছিল। তবে এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজ উচ্চ (আশরাফ) নীচ (আতরাফ) এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্রথমোক্ত শ্রেণির পারিবারিক ভাষা ছিল ফার্সি ও আরবি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম ছিল ফারসি। তাঁদের আকার ছোট হলেও তাঁরাই ছিলেন সমাজের অঘোষিত নিয়ন্ত্রক। আতরাফ শ্রেণির সাথে তাঁদের যোগাযোগ, সখ্যতা, সামাজিক মেলামেশা এমনকি বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তন হলে তাঁরা দেশান্তর হন।[৯৫] অন্যদিকে আতরাফ শ্রেণি ছিল দরিদ্র, তাদের মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ। তাদের অধিকাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত। ধর্মান্তরের পরও তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি। বাংলায় মুসলমানরা শাসকগোষ্ঠী হলেও সমাজে তাঁদের অবস্থান ছিল হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাদপদ। অথচ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন রকম। বিশেষ করে উত্তর ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও সমাজে তাঁরাই ছিলেন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দুদের তুলনায় ছিলেন অগ্রগামী।[৯৬] উত্তর ভারতে তুলনামূলকভাবে অধিকাংশ মুসলমান শহরে থাকতেন এবং গ্রামীণ মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সচ্ছল ভূ-স্বামী।

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে মুসলমানদের সংযোগ খুব ভালো ছিল না। প্রদীপ সিনহা বলেন, "বাংলার মুসলিম জমিদার ও তালুকদারদের সংখ্যা বেশি ছিল না। নয়-দশমাংশ জমিদারি হিন্দুদের দখলে ছিল। কানুনগো বিভাগের সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক।"[৯৭] ১৭৬৩ ও ১৭৭৮ সালে প্রাপ্ত তথ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৭৭-৭৮ সালে বাংলায় এক লক্ষ টাকার উপরে যে সকল জমিদার রাজস্ব দিতেন জন অ্যানিসএর একটি তালকা দিয়েছেন। এ তালিকায় ২১ জন জমিদারের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান।[৯৮] বাংলায় প্রাপ্ত খাজনার ৫৩% যে সকল বৃহৎ জমিদারগণ দিতেন তাদের ১২টি জমিদারির বর্ণনা দিয়েছেন

৯৩. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার (অনু : ওসমান গণি), *পল্লী বাংলার ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৫২।
৯৪. Pradip Sinha, *Nineteenth Century Bengal*, Calcutta, 1965, p. 54.
৯৫. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. IX, Delhi, 1974, p. 60.
৯৬. Anil Seal, *op. cit.*, p. 303.
৯৭. Firminger (ed.), *Grants Analyais in Fifth Report*, 1812, Calcutta, 1917, vol. II, p. 248-49.
৯৮. *Report from the select committee*, উদ্ধৃতি, A. K. Nazmul Karim, *op. cit.*, p. 46.

ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম। যেখানে মাত্র ১টি জমিদারি মুসলমানদের অধিকারে ছিল।[৯৯] রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষ্য মতে:

> মুর্শিদকুলীর অধীনে ষোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬৯৫টি পরগণার খাজনা তাহারাই আদায় করিতেন। ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদারের হস্তে আরও প্রায় ১৬০০টি পরগণার খাজনা আদায়ের ভার ছিল। ছোট বড় জমিদারের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। আজকাল হিন্দুদের মধ্যে দস্তিদার, সরকার, বক্সী, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, হালদার প্রভৃতি উপাধিধারীদের পূর্ব পুরুষগণ মুর্শিদকুলীর আমলে বা তাঁহার পরবর্তীকালে ঐ সকল রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।[১০০]

তবে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের অবস্থান তুলনামুলক বিচারে ভালো ছিল। এখানে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকলেও মুসলমানদের অবস্থান খুব বেশি খারাপ ছিল একথা বলা যাবে না। নিম্নে ৩ নং সারণীতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সারণী-৩[১০১]

ঢাকা নিযামত-১৭৬৩

জমিদার	সংখ্যা	হার
মুসলমান	৪৬	৪০%
হিন্দু	৬৮	৬০%

সারণী-৪[১০২]

১৭৭৪ সালে চট্টগ্রামের ২৫ জন জমিদার (ধর্মভিত্তিক)

সম্প্রদায়	জমিদারির সংখ্যা
হিন্দু	১৭
মুসলমান	০৭
ইউরোপীয়	০১

হিন্দু জমিদারদের উদ্ভব ও বিকাশে মুর্শিদকুলী খানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বেশির ভাগ নতুন জমিদার ও ইজারাদারদের তিনি নিযুক্ত করতেন হিন্দুদের মধ্য থেকে। প্রশাসনিক উচ্চপদেও তিনি হিন্দুদের নিয়োগ দিতেন। কয়েকটি উচ্চপদ ছাড়া রাজস্ব বিভাগের প্রায় সকল পদ হিন্দুদের দখলে ছিল।[১০৩] উচ্চপদগুলোতে মুর্শিদকুলী খানের আত্মীয়স্বজনরা নিযুক্ত থাকলেও রাজস্ব বিভাগে লাহোরীমল, মৃত্যুঞ্জয়, রঘুনাথ প্রমুখ উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় রাজস্ব বিভাগের কানুনগোরা সবাই ছিলেন হিন্দু।[১০৪]সার্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে একথা

---

৯৯. Sirajul Islam, *The Permananent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation, 1790-1819,* (Dacca, 1979), p. 3.

১০০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৯৩।

১০১. A. K. Nazmul Karim, *op. cit.*, p. 50.

১০২. H. J. S. Chatt, Revenu History of Chittagong, 1880, p. 23; D×,,Z, A. K. Nazmul Karim, *Ibid*, p. 55.

১০৩. Jadu Nath Sarkar (ed.), *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1972, p. 409.

১০৪. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His times*, Dacca, 1963, p. 73.

স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে জমিদার ও রাজস্ব বিভাগের চাকুরিতে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। তবেবিচার বিভাগ, সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। ওয়াকিল আহমদ বলেন, "বিচার বিভাগের বরাবর মুসলমান কর্মচারীর প্রাধান্য ছিল। মুসলিম আইনের প্রাধান্যের কারণে এরূপটি হয়েছিল।"[১০৫] পলাশীর পর থেকেই সামরিক বিভাগে মুসলমানদের বিপর্যয় শুরু হয়। কেননা মীর জাফর যে ৮০০০ সৈন্য বরখাস্ত করেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।[১০৬]ব্রিটিশ কোম্পানি শাসনামলে এই ধারা অব্যাহত থাকে। ফলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮৭৬ সালে ৭৩৪ জন উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ৪৪ জন ছিলেন মুসলমান।[১০৭] আঠারো শতকে কর্নওয়ালিসের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত উকিলদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন মুসলমান। কিন্তু ১৭৯৩ সালের পর তা নেমে আসে ২৫ শতাংশে। ১৮৫৮ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিচার বিভাগে চাকুরিরত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা নিম্নের ৫নং সারণীতে দেখানো হলো–

সারণী-৫[১০৮]

পদের নাম	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
প্রিন্সিপাল সদর আমিন	১৩	১২	০৮
সদর আমিন	১৬	০৯	০২
মুনসেফ	১১২	৮২	০৭
মোট	**১৪০**	**১০৩**	**১৭**

১৮৮৭ সালে বিচার বিভাগের নিম্ন পদে মুসলমান ছিলেন ৩.১৮ শতাংশ। ১৮৬৩-৬৪ সালে জমিদারদের নায়েবদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ ছিলেন মুসলমান।[১০৯] তখনকার সময়ে বেসামরিক চাকুরির অধিকাংশ ছিল রাজস্ব ও বিচার বিভাগে এবং তাতে মুসলমানদের অবস্থা ছিল হতাশাজনক। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষা প্রবর্তন অনেকাংশে দায়ী ছিল। এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ মুসলমানদের সরকারি চাকুরি লাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের অবস্থা ভালো ছিল না। এ প্রসঙ্গে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার বলেন, "The gentilas (i.e. Hindus) ... Possess almost exclusively the trade and wealth of the country."[১১০] আঠারো শতকেও মুসলমানরা স্থল বাণিজ্য ও ব্যাংকিংয়ে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন না।[১১১] ১৭৮৭-৮৮ সালে বাংলার ব্যবসায়ীদের প্রায় সবাই হিন্দু ছিল। ব্যাংকিং ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ জগৎশেঠ পরিবারসহ কিছু হিন্দুর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। ইউরোপীয় বণিকদের দাদনী ব্যবসায়ী ও ব্রোকার হিসেবে যারা

---

১০৫. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৬।
১০৬. আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৫।
১০৭. 'Quarterly Civil List (Bengal)', 1881, p. 70.
১০৮. B. B. Bisra, *op. cit.*, p. 191.
১০৯. A. K. Nazmul Karm, *op. cit.*, p. 187.
১১০. F. Bermier (V.A. Smith ed.), *Travels in Mughal Empire, 1656-68*, London, 1894, p. 225.
১১১. Pradip Sinha, *op. cit.*, p. 229.

এদেশীয়দের থেকে নিয়োজিত ছিল তারাও প্রায় সকলেই হিন্দু।[১১২] আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয়ানরা নিয়োজিত ছিলেন। মুসলমান ছিলেন প্রায় সবাই অবাঙালি, আরব ও পারস্যের অধিবাসী।[১১৩] ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদের এরকম হতাশার কারণ হিসেবে জেমস লংয়ের মন্তব্য হলো, ব্যবসাকে মুসলমানরা ঘৃণা করতেন।[১১৪] গ্রান্টসের অভিমত হলো, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার মুসলমানরা হিন্দুদের উপর ন্যস্ত করতেন।[১১৫] ফলে মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ভালো না করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সুদের সম্পর্ক থাকায় মুসলমানরা সরকারি সামরিক-বেসামরিক চাকুরিকে বেশি লাভজনক ও সম্মানজনক মনে করতেন। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের মর্যাদা সেযুগের সমাজে তেমন উঁচুতে ছিল না।[১১৬]

ব্রিটিশদের ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নতুন চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর স্থায়ী রূপ লাভ করে। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় জমিদারি ক্ষতি হয়। তবে নতুন যাঁরা জমিদারি প্রাপ্ত হন তাঁরা অধিকাংশ হিন্দু হওয়াতে তাদের ক্ষতি তাঁরা পুষিয়ে নিতে পেরেছিলেন। পক্ষান্তরে, যে স্বল্পসংখ্যক জমিদারি মুসলমানদের ছিল তার মধ্যেও দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমানদের জমিদারিগুলো হিন্দুদের হস্তগত হয়।[১১৭] এছাড়াও জমিদারদের অযোগ্যতা, দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন, বিলাসিতা, নায়েবের কারসাজি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণও মুসলমান জমিদারদের পতনের জন্য দায়ী ছিল। এসময় মুসলমান ভূস্বামীদের মধ্যে ব্যাপক চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়।[১১৮] ১৮৮৮ সালে আবদোস সোবহান *হিন্দু-মোসলমান* গ্রন্থে মুসলিম জমিদার সম্পর্কে লেখেন:

> মোসলমান নবাব, জমিদার, মহোদয়গণ? এখনও সময় আছে। ... সতর্ক হউন। বিলাসিতা ত্যাগ করুন, কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হউন। কয়েকদিন পর মাথা মারিলেও এ সময় আর পাওয়া যাইবে না। ... স্বয়ং সিরিস্তায় বসুন, কাগজ হাতে লউন, মোরগ লড়ান, কবুতর উড়ান ইত্যাদি কুক্রীড়া সকল ত্যাগ করুন। ... যাহাতে ব্যয় কমে আয় বাড়ে তাহার চেষ্টা করুন। ... দুশ্চরিত্র চোর, বদমাইশ আমল দূর করুন। ... সমুদয় রাত্রিনেশা নিয়া, বেশ্যা নিয়া, সৎবঞ্চ নিয়া কাটাইয়া ... দিবাকে রাত্রি রাত্রিকে দিন করিলে জমিদারী কেমনে রক্ষা হইবে।[১১৯]

মুসলমানদের আর্থিক দুর্গতির জন্য অনেক ঐতিহাসিক লাখেরাজ সম্পত্তিকেও অনেকাংশে দায়ী করেছেন। মুসলিম শাসনামলে শাসকরা বিদ্যাশিক্ষা ও অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করতেন। হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও পূজা-আর্চনা ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের জন্য অনুরূপ নিষ্কর ভূমি

---

১১২. Abdul Karim, *op. cit.*, p. 235.
১১৩. *Ibid*, p. 232-234.
১১৪. James long, Calcutta in the olden times–Its Localities, *Calcutta Review*, vol. XVIII, 1852, p.316; উদ্ধৃতি, A. K. Nazmul Karim, *op. cit.*, p. 121.
১১৫. Grarant's objarvation, p. 30; উদ্ধৃত, আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।
১১৬. A. K. Nazmul Karim, *op. cit.*, p. 122.
১১৭. আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২।
১১৮. W. W. Hunter, *op. cit.*, p. 152-155.
১১৯. আবদোস সোবহান, *হিন্দু-মোসলেম*, কলকাতা, ১৮৮৮, পৃ. ৫-২০।

মঞ্জুর করতেন। সরকারি কর্মকর্তাদের সততা, দক্ষতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য বেতন ভাতা ছাড়াও জায়গির, মদদই মাশ প্রভৃতি দেয়া হত। দেওয়ান ফজলে রাব্বি মুসলিম আমলে ২১ প্রকারের নিষ্কর ভূমির বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে মুসলমানদের ১৪ প্রকার ও হিন্দুদের ৫ প্রকার এবং হিন্দু-মুসলামন উভয়ের জন্য ২ প্রকার নিষ্কর ভূমি ছিল।[১২০] বুকানন বিহারে মোট ২১ প্রকারের লাখেরাজ সম্পত্তির বিবরণ দিয়েছেন।[১২১] আমিনি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলায় ৪০,০০০.০০ বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল।[১২২] ১৮২৮ সালের পরবতী ১৮ বছর ধরে ব্রিটিশ সরকার লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ চালায়। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু কর্মচারীদের কারসাজির ফলেও মুসলমানরা জমিচ্যুত হয়। আমীর আলী বলেন, "Hundreds of princely families were thus completely beggared. In one district alone, out of a body of fifty-five lakirajdars, forty-nine were ousted from possession.[১২৩]

আর্থ-রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে। মুসলিম সমাজ নিমজ্জিত ছিল পির পূজা, কবর পূজা, ধর্মীয় কুসংস্কার ও নানা অনাচারে। ইসলামের অনুশাসন বিরোধী অনেক আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এসময় কিছু ধর্মীয় নেতা মনে করেছিলেন, ইসলামের প্রকৃত অনুশাসন থেকে সরে আসার ফলে মুসলিম সমাজের অবনতি ও দুর্দশা হয়েছে। এ সকল ধর্মীয় নেতারা এ অবস্থা থেকে মুসলিম সমাজের মুক্তির আশায় ধর্মের আশ্রয় খোঁজেন এবং তাঁরা সঠিক ইসলামে ফিরিয়ে নিতে মুসলমানদেরকে তৎপর হওয়ায় উৎসাহ দেন। বাংলায় উনিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজে যে সংস্কার আন্দোলন চলছিল সেগুলো 'ফরায়েজী', 'তরীকাহ্-ই-মুহাম্মাদীয়া' (ওহাবী), 'তাউনী' ও 'আহলে হাদীস' প্রভৃতি নামে সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আরম্ভ হলেও পরবর্তীতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করায় নানামুখী রূপ পরিগ্রহ করে এবং মুসলিম সমাজকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভালোমন্দ উভয়ই ছিল।[১২৪] এ সংস্কার আন্দোলনগুলোর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় :

১. এ আন্দোলনগুলো নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে জাগ্রত করেছিল।
২. মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনার প্রেক্ষাপট রচনা করে স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।
৩. সমাজে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও মৌল চিন্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল।
৪. সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও সচেতন করেছিল।
৫. সমাজে শ্রেণি বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার প্রতি আঘাত হেনেছিল।
৬. মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টি করেছিল।
৭. বিশ্ব-মুসলমানবাদ প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে 'Extra-territorial' চেতনার প্রসার ঘটিয়েছিল।
৮. দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত করেছিল।[১২৫]

এ আন্দোলনসমূহের নেতারা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া, রক্ষণশীল ও স্বল্পশিক্ষিত। কতিপয় ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে নেতাদের কড়াকড়ি করার কারণে গ্রামের মুসলমানদের অনেকে এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি।

---

১২০. Pradip Sinha, *op. cit.*, p. 269-270.
১২১. আজিজুর রহমান মল্লিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।
১২২. Pradip Sinha, *op. cit.*, p. 269-270.
১২৩. K. K. Aziz (ed.), *Ameer Ali: His life and work*, Lahore, 1968, p. 74.
১২৪. Muinuddin Ahmed Kahn (Rafiuddin Ahmed ed.), "Political and Social Implications of Islamic Reforms Movements in Bengali in Nineteenth Century", in Bangladesh, Society Religion and Politics, Chittagong University, 1985, p. 91.
১২৫. অমলেন্দু দে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫-১৩১; কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৬।

এছাড়া উচ্চবিত্তের মাঝেও এ আন্দোলন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে ধর্মীয় ও জাতিভেদের গণ্ডি অতিক্রম করে এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নিম্নস্তরের হতদরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে সক্ষম হন।[১২৬] এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষারও বিরোধী হয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মুসলমানদের মনে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা চলে আসে; যা মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি করে। আন্দোলকারীরা ইসলামের পুরাতন অবস্থায় ফিরে যাবার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ায় তাঁদের মধ্যে নতুন চিন্তনের কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় নি।[১২৭] তাদের এ অবক্ষয় শিক্ষার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হতাশা ও নৈরাশ্যজনক। নমুনা হিসেবে কয়েকটি জেলার তথ্য নিম্নের ৬নং সারণীতে তুলে ধরা হলো :

সারণী-৬[১২৮]

জেলা	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র
মুর্শিদাবাদ	৯৯৮	৮২
বীরভূম	৬১২৫	২৩২
বর্ধমান	১২৪০৮	৭৬৯
মোট	**১৯,৫৩১**	**১,০৮৩**

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফারসি স্কুলগুলোতেও মুসলমানদের অবস্থা ভালো ছিল না। এ সময় এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু ছাত্র যে বেশি ছিল তা নিম্নের ৭নং সারণী থেকে স্পষ্ট হয়।

সারণী-৭[১২৯]

জেলা	মুসলমান ছাত্র	হিন্দু ছাত্র
মুর্শিদাবাদ	৪১	৬১
বীরভূম	২৪০	২৪৫
বর্ধমান	৪৫১	৪৪৮
মোট	**৭৩২**	**৭৫৪**

বাংলা ও ফারসি উভয় শিক্ষাতে হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন।[১৩০] সংস্কৃতবহুল বাংলা ও হিন্দু ধর্মীয় বিষয় পড়ানো হত বলে মুসলমান ছাত্ররা টোল থেকে দূরে থাকত, শিক্ষা ছিল ধর্মাশ্রয়ী। মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আরম্ভ হত মক্তবে। যেখানে নামাজ ও কুরআন শরিফ পাঠ শেখানো হত। মক্তবের শিক্ষক ছিলেন আধুনিক জ্ঞান বিবর্জিত। মক্তবের শিক্ষকদের কুপমণ্ডুকতার দরুন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে তাঁরা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। তাঁদের কারণেই মুসলমান সমাজ মূলত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চিন্তা চেতনা বিমুখ

১২৬. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান : শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তা*, সুন্দরম, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ. ২৬।
১২৭. কাজী আবদুল ওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৬।
১২৮. Adam's 3rd Report, *op.cit.*, p. 161, 165, 169.
১২৯. *Ibid*, p. 200, 202, 204.
১৩০. Adam's Report, *op. cit.*, p. 18.

রয়েছে। অ্যাডাম এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অকিঞ্চিৎকর ও অযোগ্য বিদ্যালয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৩১] তবে সে যুগে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে কোন অভিন্ন শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল না। অভিজাত ধনী পরিবারের মধ্যে শিক্ষা চালু ছিল। সম্ভবত সাধারণ ঘরের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা অর্জন তখন রীতিবিরুদ্ধ ছিল।[১৩২] অ্যাডাম মন্তব্য করেছেন যে:

> ... throughout India that the vernacular language of that class (Muslims) is never employed in the schools as the medium or instrument of written instruction ... . But class for which both Arabic and Persian schools exist is the same, and that is the upper class of the society, whether Hindus or Mussalmans are the scholars, and whether Persian or Arabic is the language of schools are inaccessible to the body of the people.[১৩৩]

১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষায় মুসলমান সমাজের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। নিম্নের সারণীতে ১৮৪৫ সালের বাংলা ও আসামের মুসলিম শিক্ষার করুণ অবস্থা ৮নং সারণীতে তুলে ধরা হলো :

সারণী-৮[১৩৪]

মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	খ্রিস্টান ছাত্র
৩৬	৪১৮৬	৯০৭	১৫৪

১৮৭১ সালে আসাম ও বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা নিম্নের ৯নং সারণীতে দেখানো হলো :

সারণী-৯[১৩৫]

প্রতিষ্ঠান	মুসলমান ছাত্র	হিন্দু ছাত্র	অন্যান্য ছাত্র	মোট
স্কুল	২৮,০৯৬	১,৪৯,৭১৭	১৫,৪৮৯	১,৯৩,৩০২
কলেজ	৫২	১,১৯৯	৩৬	১,২৮৭
মোট	২৮,১৪৮	১,৫০,৯১৬	১৫,৫২৫	১,৯৪,৫৮৯

তখন আসাম ও বাংলার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩২.৩ শতাংশ ছিল। স্কুল পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রের হার ছিল ১৪.৪ শতাংশ এবং কলেজে ছিল ৪.০২ শতাংশ।[১৩৬] উপরের বিচার বিশ্লেষণ থেকে উনিশ শতকে মুসলমানদের শিক্ষার দূরাবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এ অবস্থা বাংলায় প্রায় উক্ত শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের একটা অংশ বুঝতে পারে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া মুসলমানদের উন্নতি প্রায় অসম্ভব। তাই এর পর থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি ও

---

১৩১. *Ibid*, p. 105.
১৩২. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২।
১৩৩. Adam's Report, *op. cit.*, p. 210, 212.
১৩৪. Written of theHouse of Commons, Relation to Education in India, p. 40 (20) of 1484-48.
১৩৫. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।
১৩৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হতে থাকে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি মুসলমানদের নবযাত্রা শুরু হয়। আধুনিক জীবনের প্রধান 'জীয়ন-কাঠি' ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের নবচেতনা জাগ্রত হয়। রামমোহন রায় ফার্সির সুপণ্ডিত ছিলেন, জন ডিগবীর অধীনে সেরেস্তাদারের চাকুরি করার সময় তিনি ইংরেজি শিখেন। ১৮১৫ সালে কলকাতায় আসেন এবং 'আত্মীয় সভা' গঠন করে তিনি কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনে নতুন পথের সন্ধান জাগ্রত করেন। অন্যদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ ১৮৫৯ সালে আলীপুরে বদলি হন এবং ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে বাংলার উচ্চ শ্রেণির মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন পথের সন্ধান দেন।[১৩৭]

এ সময় আবদুল লতিফ ছাড়াও নবাব আমীর আলী খান বাহাদুর (১৮১৭-৭৯) এবং সৈয়দ আমীরআলীর প্রচেষ্টার ফলে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার চাপে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে রেনেসাঁ শুরু হয়। আবদুর রউফ, আবদুল লতিফ ও মাহাম্মদ মাজ্হার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামি' (১৮৫৫), নবাব আমীর আলীর 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৫৬), সৈয়দ আমীর আলীর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৮), মুসলিম সমাজে শিক্ষার উন্নয়নে ব্রতী হয়।[১৩৮] সরকারও নানা কারণে বাংলার মুসলিম সমাজের ইংরেজি শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[১৩৯] এ সময় পাট চাষ লাভজনক হওয়ায় মুসলমান কৃষকদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা সন্তান-সন্ততিদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেন।[১৪০]

১৮৫৭ সালের পর আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজে উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি মুসলিম শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে *'Mohamedan Education in Bengal' and 'A Minute on the Hoogly Madrassah'* পুস্তক রচনা করেন। তাছাড়া মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির উপর সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সর্বোপরি তাঁর সোসাইটি মুসলমান সমাজ এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কারণ সম্পর্কে আবদুল লতিফ বলেন:

> Being fully aware of the Prejudice and exclusiveness of the Mahomedan community and anxious to imbue it with a desire to interest themselves in western learning and progress and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual

১৩৭. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫।
১৩৮. অমলেন্দু দে, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী*, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৭-৮।
১৩৯. District Gazetteer, Pabna, 1923, p. 111-114.
১৪০. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal, 1884-1912*, Dacca, 1974, p. 118-120.

intercourse with the best representatives of English and Hindus society I founded the Mohamedan literary society in April 1863.[১৪১]

এ সোসাইটি মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আব্দুল লতিফ রক্ষণশীল ছিলেন বিধায় তিনি ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি আরবি-ফার্সি শিক্ষার প্রচলনের জোর প্রবক্তা ছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজকে 'learned class and worldly class'এ দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় উর্দু-ফার্সিভাষী এবং উচ্চবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষালাভের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে মুসলমান উচ্চবিত্তের যোগাযোগের পথ সৃষ্টি হয়।[১৪২] এদের মধ্য থেকে একটি শ্রেণির উদ্ভব হয় যারা পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নামে পরিচিতি লাভ করে।

আব্দুল লতিফের পরে মুসলমান সমাজের শিক্ষায় ও সংস্কৃতি চিন্তনে যিনি এগিয়ে আসেন তিনি হলেন ব্যারিস্টার সৈয়দ আমীর আলী, ইংরেজি শিক্ষার পুরোপুরি সমর্থক আমীর আলী আব্দুল লতিফের মত আরবি-ফার্সির শিক্ষার সমর্থক ছিলেন না, তিনি শুধু ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছিলেন, তিনি ১৮৭৮ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন; যা রাজনৈতিক সংগঠন হলেও এর কর্মসূচিতে সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল।

যদিও মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতিই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নে এর প্রচেষ্টাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের জন্য "রিপন বৃত্তি" প্রবর্তন করা এবং কলিকাতা মাদ্রাসাকে কলেজ স্তরে উন্নীত করার প্রচেষ্টা এসোসিয়েশনের প্রথম থেকেই ছিল। যার ফলে ১৮৮৪ সালে মাদ্রাসায় কলেজ মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সংগঠনের বিভিন্ন শাখা মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন– খুলনা জেলা মুসলিম ছাত্রদের বোর্ডিং স্থাপনের জন্য চাঁদা তোলার জন্য সভা আহ্বান; মেদিনীপুর শাখার নেতৃবৃন্দ ছোটলাট এলিয়ট এর কাছে মাদ্রাসা এবং স্কুল বোর্ডিং এর উন্নতির জন্য অর্থ মঞ্জুরির কথা বলেন। এছাড়া বাংলার অন্যান্য শহরে স্থাপিত উক্ত এসোসিয়েশনের শাখাগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে শিক্ষার ব্যাপারেও ভূমিকা রেখেছিল। এদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে মুসলমানরা শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়।

আমীর আলী যে সময়ে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টারত সে সময়ে দিল্লির সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮) ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সারা উত্তর ভারতে এক প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৭৫ সালে 'আলিগড় মোহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল স্কুল' স্থাপন করার মাধ্যমে তাঁর আন্দোলনকে বাস্তব রূপ ও ভিত্তি দান করেন। সৈয়দ আহমদ খান ও আব্দুল লতিফ সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, কারণ তারা কোনভাবে চাননি তমসাচ্ছন্ন মুসলিম জাতি ইংরেজদের বিরাগভাজন হোক, কারণ তারা বিশ্বাস করতেন ইংরেজদের তোষণ করে

১৪১. Enamul Hoque, (ed.), *Nawab Bahadul Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, Dacca, 1968, p. 167-168.

১৪২. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

মুসলমানদের উন্নয়ন করতে হবে, তাই তারা বিদেশি শাসকের পক্ষাবলম্বন করে। তারা স্বজাতির পক্ষ হয়ে ইংরেজ শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ছিলেন।

মুসলমান সমাজে গোঁড়া ও রক্ষণশীল একটি অংশ ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ এদেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে জেহাদি আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশে তরিকায়ে মোহাম্মদীয়াপন্থি ও গোঁড়া মোল্লা শ্রেণি ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এতে গ্রামে প্রভাব পরলেও শহরের অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কোন সংশয় ছিল না।[১৪৩] তবে তাঁদের সংস্কৃতির ভাষা ফারসির প্রতি মোহ এবং সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে গর্ব ছিল। প্রথম দিকে ইংরেজি না শিখে ফারসি শিখলেও অফিস-আদালতে চাকুরি পাওয়া যেত। জেমস লঙের মতে, "খুব সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা আরবি ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করে। এই দুটো ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাঁদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাঁদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল।"[১৪৪]

১৮৮০ সালে সাঈদ (দেলওয়ার হোসেন আহমদের ছদ্মনাম) মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার পিছনে যুক্তি দিয়েছেন, "This aversion to English education is traceable to Pride of race not felt by the Hindus, to their possession of a rich literature of their own, to their greater religious bigotry and partly to their poverty."[১৪৫] মুসলমানদের জন্য ধর্মভিত্তিক শিক্ষানীতি গ্রহণের পেছনে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮৫ সালের প্রস্তাবে বলা হয়ঃ ... a special section of the annual education reports should be devoted to Muslim education so that the Government might be kept fully informed of the state and progress of the Muhammadan community.[১৪৬]

বস্তুত ইংরেজি ভাষার প্রতি তাঁদের অনাগ্রহ থাকলেও বিরোধিতা ছিল না। প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষা শহুরে ভদ্রলোকদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহরে পাঠিয়ে তাঁদের সন্তানদের ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার মত অর্থনৈতিক অবস্থা তাঁদের ছিল না। জীবন জীবিকার জন্য ইংরেজি শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠলে এক শ্রেণির মুসলমান নেতৃবৃন্দও গড়ে উঠে এবং শরীফ পরিবারে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা দেয়। তাঁরা ইংরেজি চর্চা শুরু করেন।

সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ জাতির সেই সুপ্ত চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয়; ইংরেজি চর্চাও আরম্ভ হয়। এ্যাডামের রিপোর্ট

---

১৪৩. A. R. Mallick, *op. cit.*, p. 189-90.

১৪৪. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬।

১৪৫. The Calcutta Review, vol. IXXII, NO CXLIV, 1881, P. V.

১৪৬. Review of Educatin in India 1886, Chapter III, p. 320; and P. Hardy, *The Muslims of Brith India*, Cambridge at the University Press, 1972, p. 122.

থেকে জানা যায়, মুসলমান সমাজে প্রবাহমান শিক্ষা ছিল মূলত মোল্লা তৈরির শিক্ষা।[১৪৭]যে শরীফ মুসলমান শ্রেণির মধ্যে গৃহকর্ম ও ধর্মকর্মের জন্য শিক্ষাচর্চা অব্যাহত ছিল, সে শ্রেণিকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল। আর সৈয়দ আহমদ, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী যখন ইংরেজি শিক্ষার ডাক দিলেন, তখন সমাজের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। গোঁড়া শ্রেণির সামান্য বাধা তাঁরা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁদের প্রধানত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

১৮৫০ সালে প্রথম পাটকল স্থাপিত হলে বাংলায় পাট চাষের পরিমাণ বাড়ে এবং পাটের দামও বাড়ে। কৃষকের হাতে নতুন টাকা আসে। অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের সন্তানরা স্কুলে যেতে শুরু করে। ১৮৭৪ সালে মহসীন ফাণ্ডের টাকায়, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা খোলা হয়। মহসীন ফাণ্ডের টাকা থেকে ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। ৯টি জেলা স্কুলে ফারসি শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। স্কুল ও কলেজের মুসলমান ছাত্রদের বেতনের $\frac{২}{৩}$ অংশ মহসীন ফাণ্ড থেকে প্রদান করা হয়।[১৪৮]

মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন এবং মুসলিম সমাজের পূর্বোক্ত নেতাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রতি আরও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৯০ সালের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রামণ বহন করে।[১৪৯]১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বাংলার মুসলমান সমাজে ইংরেজি জানা লোকদের সংখ্যা নিম্নোক্তভাবে দেখানো হয়েছে। এতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনামূলক চিত্রও রয়েছে।

সারণি ১০[১৫০]

	মুসলিম			**হিন্দু**		
	শিক্ষিত ও অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন	**ইংরেজি জানা**	**মোট শিক্ষিত সংখ্যার মধ্যে ইংরেজি জানার হার**	**শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন**	**ইংরেজি জানা**	**মোট শিক্ষিত সংখ্যার মধ্যে ইংরেজি জানার হার**
উত্তরবঙ্গ	১,৭২,৮৬৮	১,২০৯	০.৬৯	১,৩৬,৭৪৭	৪,৬৫০	৩.৪০
পূর্ববঙ্গ	৩,৫৯,৬৭৫	৩,৩১৩	০.৯২	৫,৬৫,৫০৬	১৭,৪৩৪	৩.০৮
পশ্চিমবঙ্গ	১,৪৬,৬৯৮	৫,৬৮৯	৩.৮৯	৮,৮৫,৭১১	৪৭,৯১২	৫.৪০
মোট	**৬,৭৮,৬৯৮**	**১০,২১১**	**১.৫০**	**১৫,৮৭,৯৬৪**	**৬৯,৯৯৬**	**৪.৪০**

---

১৪৭. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাঙালা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৫২৯।
১৪৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮-৫০; Enamul Hoque, *op. cit.*, p. 216.
১৪৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭।
১৫০. *Census of India*, 1891, vol. III, p. 229.

এভাবে ধীরে ধীরে মুসলমান নেতৃবৃন্দের শিক্ষা আন্দোলনে, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায়, আধুনিক শিক্ষার প্রতি সমাজে মানুষের মধ্যে অর্থাৎ মুসলমান সমাজে পূর্বে যে অচলাবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা ক্রমশ অপসারিত হতে থাকে এবং শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়এবং উচ্চশিক্ষার হারও বাড়তে থাকে। ১৮৮৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার অবস্থা কী রকম ছিল তা নিম্নের ১১নং সারণি থেকে নির্ণয় করা যায়।

সারণি ১১[১৫১]

বৎসর	এমএ	বিএ (অনার্স)	বিএ (পাশ)	বিএল	এফএ/আইইএ	এন্ট্রাস
১৮৮৫	১	১	৯	৩	১২	৪৪
১৮৮৬	২	১৩	২৬	৯	-	-
১৮৮৭	৩	১১	২১	৪	৩১	৫১
১৮৮৮	২	৫	১৬	৬	১৯	১১৩
১৮৮৯	৩	৭	২৩	৩	-	৫৪
১৮৯০	২	৬	২২	৮	৫৭	১২৫
১৮৯১	২	৬	১২	১২	১৬	১১০
১৮৯২	৪	৭	১৫	৮	৪৭	৮৫
১৮৯৩	-	৬	২৪	৩	৩৫	১৭২
১৮৯৪	৪	৮	২৭	৩	৩১	১৩৪
১৮৯৫	৪	৫	২৩	২	৫৯	১৫৩
১৮৯৬	২	৫	২১	১৫	৫৩	১৪১
১৮৯৭	৩	৪	১২	১২	৫২	২৪১
১৮৯৮	৩	৮	২২	৬	৬৬	১৭৮
১৮৯৯	৩	৮	২৮	৭	৩৮	২০৩
১৯০০	৫	৯	৩১	৬	৫৯	২৫৩

১৮৬৮ সালে হুগলী কলেজ থেকে প্রথম ইতিহাসে এমএ পাশ করেন সৈয়দ আমীর আলী, ১৮৭১ সালে আগ্রা কলেজ থেকে আরবিতে আলী রেজা খান, ১৮৭৭ সালে আমজাদ আলী (আরবি), আশরাফ আলী (আরবি), রাজা হোসেন (ফারসি) যথাক্রমে বেনারস ও মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। ১৮৮২ সালে হাসমতুল্লাহ (আরবি) মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। ১৮৮৫ সালের আগে আর কোন মুসলমান এমএ পাশ করেননি, প্রথম বিএ পাশ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আহমদ (যিনি পরে দেলওয়ার হোসেন আহমদ নাম গ্রহণ করেন)। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয় মুসলমান গ্রাজুয়েট হন শ্রীহট্টের মোহাম্মদ দায়েম। এভাবে ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৬৯ সালে প্রথম বিএল গ্রাজুয়েট হন আমীর আলী ও ওবায়দুর রহমান। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত ল গ্রাজুয়েট হন ১৬ জন। ১৮৭৮ সালে সৈয়দ হোসেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবি পাশ করেন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আর কেউ ঐ ডিগ্রি

১৫১. এমএ, বিএ, (অনার্স ও পাশ) এবং বি এল-এর সংখ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ সালে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডার (২য় খণ্ড) থেকে সংকলিত হয়েছে। এফএ, আইএ এবং এন্ট্রান্সের সংখ্যা আজিজুল হকের পূর্বোক্ত গ্রন্থ (পরিশিষ্ট-জ) থেকে গৃহীত হয়েছে।

পাননি। ১৮৭১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত এম এল এস ডিগ্রি পান ১৭ জন।[১৫২] এটা ছিল উনিশ শতকে বাংলার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি যারা এ সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পর্যায়ে পড়েন।

এন্ট্রাস পাশ থেকে শুরু করে ব্যারিস্টার–এই নব্য শিক্ষিতদের সমন্বয়েই আধুনিক মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন ও বিকাশ হয়। এসব শিক্ষিত ব্যক্তি সরকারি সওদাগর অফিসে চাকুরি করেছেন, কোর্ট-কাচারিতে আইন ব্যবসায় করেছেন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন, বই পুস্তক লিখেছেন, পত্র পত্রিকা প্রকাশ করাসহ সভা সমিতি গঠন, রাজনীতি, ধর্ম শিক্ষা ও অন্যান্য আন্দোলন করেছেন। এভাবেই তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

উনিশ শতকের চতুর্থ ভাগে সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৮২ সালে কলকাতায় সরকারি চাকুরিতে মুসলমানগণের অবস্থান সম্পর্কে নিম্নে ১২নং সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি ১২[১৫৩]

ক্রমিক নং	পদের নাম	মুসলমান	হিন্দু	খ্রিস্টান	মোট
১.	পররাষ্ট্র বিভাগ	০১	১৪	৩৯	৫৪
২.	স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ	০১	২৩	৩৯	৬৩
৩.	আইন, রাজনীতি ও চাকুরি নিয়োগকারী বিভাগ	০২	৬৪	১৬	৮২
৪.	রেভিনিউ বোর্ড	০১	৮৮	২৪	১১৩
৫.	কম্পট্রোলার জেনারেল অফিস	০৫	২২৬	৩৪	২৬৫
৬.	পোস্ট মাস্টার জেনালে অফিস	৩৭	২৩৪	৬৫	৩৩৬
৭.	ডাক বিভাগ (বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জন্য)	২২	৭৬৩	০৭	৭৯২
৮.	ডাক বিভাগ (বাংলার পূর্বাঞ্চলের জন্য)	০৯	১৫১	০৩	১৬৩
৯.	ডাক বিভাগ (বিহার ও উড়িষ্যার জন্য)	৩৭	৩৫৩	১৯	৪০৯
১০.	জেনারেল রেজিস্ট্রেশন	০১	০৬	০৩	১০
১১.	শিক্ষা বিভাগ	৩৮	৪২১	১১৪	৫৭৩
১২.	হাইকোর্ট	৯২	১৩১	২০	২৪৩
১৩.	লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার অফিস	০১	১১	০১	১৩
১৪.	ছোট আদালত	০১	১৮	০৮	২৭
১৫.	সার্ভেয়ার জেনারেল অফিস	১০	১৮	৫৫	৮৩
১৬.	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	২২	১৫৩	৪১	২১৬
১৭.	ছোট আদালতের জজ ও সাবঅর্ডিনেট জজ	০৩	৪৪	০৯	৫৬
১৮.	মুন্সেফ	১৪	২৪৭	০০	২৬১
১৯.	পুলিশ বিভাগ	০৯	৩৮	১১৮	১৬৫
২০.	জনকল্যাণ বিভাগ	১৭	২১৭	১৬৭	৪০১
২১.	চিকিৎসা বিভাগ	০৩	২৪	৯৮	১২৫
২২.	জনশিক্ষা বিভাগ	০৬	৯৮	৫৩	১৫৭
২৩.	রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	০৩	১৮	০৪	২৫

১৫২. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪।
১৫৩. K. K. Aziz, *Ameer Ali: His life and works*, Karachi, 1963, p. 29-30.

উপরের তালিকায় কলকাতায় সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। এখন মফস্বল শহরগুলোতে ১৮৮২ সালে মুসলমানদের অবস্থান নিম্নের ১৩নং সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি ১৩[১৫৪](বিবিধ পদ)

ক্রমিক নং	অঞ্চল	মুসলমান	হিন্দু	মোট
১.	বগুড়া	৩৩	৯১	১২৪
২.	বর্ধমান	১৪	১১৭	১৩১
৩.	ফরিদপুর	৩০	৩৩৬	৩৬৬
৪.	হাওড়া	০৮	২০৬	২১৪
৫.	মুর্শিদাবাদ	৩৯	৩৪৩	৩৮২
৬.	ময়মনসিংহ	২০	৩২৪	৩৪৪
৭.	মেদিনীপুর	৩৯	৪৬০	৪৯৯
৮.	পাবনা	২৬	১৭৯	২০৫
৯.	রাজশাহী	৫৭	২৮৭	৩৪৪
১০.	বরিশাল	৩৪	৩৮৯	৪২৩

১২ ও ১৩ নং দুটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগে অন্যান্য বিভাগের চেয়ে মুসলমান সরকারি চাকুরিজীবীর সংখ্যা বেশি এবং শহর অপেক্ষা মফস্বলে মুসলমান চাকুরিজীবীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। মুসলমান শিক্ষিতগণ দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মস্থলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিলেন, তারা শহরে কেন্দ্রীভূত হতে পারেন নি। আধুনিক প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোর মূল শক্তিকেন্দ্র শহরে শ্রেণি-সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ দানা বাঁধবার সুযোগ পায়নি। উনিশ শতকের আশির দশকে শিক্ষার মাধ্যমে বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনে ব্রিটিশ সকারেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সরকার উর্দু ও ফারসি শিক্ষার উৎসাহ প্রদান এবং গ্রান্টস্ ইন এইড-এর ব্যবস্থা করে। তবে গ্রান্টস্ ইন এইড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় শুধু স্থানীয় ভাষা শিক্ষাদানকারী মক্তবগুলোকে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনশিক্ষা পরিচালক ক্রফটের আন্তরিকতা ছিল উল্লেখযোগ্য। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হলে চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বন্যাজনিত কারণে চট্টগ্রাম ১১% শিক্ষার্থী কমে যায়।[১৫৫] সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে রংপুর শাখার সম্পাদক আবদুল মজিদ চৌধুরী ক্রফটের পরবর্তী জনশিক্ষা পরিচালক স্যার পেডলার এর কাছে ১৮৯৯ সালে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এ স্মারকলিপিতে ক্রফটের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। পেডলার উক্ত বিষয়ে অবহিত হন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করে সুপারিশ করেন; যা বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক বিবেচিত হয়। বাংলার সরকার পেডলারকে মুসলিম সমাজের নেতা ও মুসলমানদের বিভিন্ন সমিতির সাথে আলোচনা করার আদেশ দেন। পেডলার সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। এ বিষয়ে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রসের সভাপতিত্বে ১৯০৪

---

১৫৪. *Ibid*, p.31; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।
১৫৫. দ্রষ্টব্য, Quinquennial Review of Education in India, 1831-93 to 1896-97, p. 188.

সালে বিশেষজ্ঞদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মুসলমান সদস্যরা হলেন সিরাজুল ইসলাম, আবদুল করিম, আবদুল লতিফ, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান এবং মৌলবি ইসহাক।[১৫৬] এ সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার দেশের মক্তবগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে।[১৫৭] এভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে মুসলমানদের সরকার জাগ্রত করার চেষ্টা করে এবং মুসলমান সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকের বাংলায় ভূমির সাথে সম্পৃক্ত ছোট জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, গাঁতিদার, জোতদার, ইজারাদার, নায়েব-গোমস্তা-তহশিলদার-কেরানি প্রভৃতি আমলারা ভূমধ্যবিত্ত নামে পরিচিত। ঢাকার খাজা পরিবার, বগুড়ার নবাব পরিবার, ধনবাড়ীর চৌধুরী পরিবার, শ্রীহটের মজুমদার পরিবার, শায়েস্তাবাদের মীর পরিবার প্রভৃতি বাংলার নামমাত্র বড় জমিদার ছিলেন। অধিকাংশ জমিদার ছিলেন ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিক। শহরে ধনী ব্যক্তিরা অথবা সরকারি পদস্থ কর্মচারীরা জমি ক্রয় করে তালুকদার, ইজারাদার নিয়োগ করতেন। তাঁরাই ভূমির সাথে যোগাযোগ রাখতেন, নব্য ভূস্বামীরা শহরে বসবাস করতেন। এভাবে ভূমিজ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির পত্তন হয়।[১৫৮] লর্ড হেস্টিংসের সময় বড় জমিদারির সংখ্যা ছিল ১০০; একশ বছর পরে ছোট-বড় জমিদারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৪২০০।[১৫৯] ১৮৭১-৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জমমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী ও কর্মচারীদের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬০] ছোট জমিদার, জোতদার এবং ধনী কৃষকদের ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত বলা যায়।[১৬১] নিচের ১৪নং সারণিতে তা দেখানো হলো :

সারণি ১৪[১৬২]

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা
১.	জমিদার	৩২৬১৮ জন
২.	ইতমামদার	৫৮৬ জন
৩.	ঠিকাদার	৩০৩ জন
৪.	ইজারাদার	৩৩৫৪ জন
৫.	লাখেরাজদার	২৩০৭০ জন
৬.	জায়গীরদার	৩৬৫ জন
৭.	ঘাটোয়াল	৬৬৮ জন
৮.	আয়মাদার	২০০৪ জন
৯.	মকরারীদার	৯৯৩৩ জন
১০.	তালুকাদার	৯৬০৫০ জন

১৫৬. Sufia Ahmed, *op. cit.*, p. 39.
১৫৭. GRPI in Bengal, 1903-1904, p. 42.
১৫৮. B. B. Misra, *op. cit.*, p. 123, 133-34.
১৫৯. Bengal Administration Report 1872-73, p. 73.
১৬০. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।
১৬১. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫।
১৬২. বনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ২৬।

১১.	পত্তনিদার	৩৩০২ জন
১২.	খোদকস্ত প্রজা	৭৫৫২ জন
১৩.	মহলদার	১১২৮ জন
১৪.	জোতদার	১৯৫৬৪ জন
১৫.	গাঁতিদার	৩৮২৪ জন
১৬.	হাওলাদার	৯৩৪৩ জন
১৭.	গোমস্তা	১৮৪০২ জন
১৮.	তহশিলদার	১০৫৪৬ জন
১৯.	পাটোয়ারী	১৩৭৬ জন
২০.	পাইক	১৪৭৯৭ জন
২১.	জমিদারের ভৃত্য	১১০৩০ জন
২২.	দফাদার	২০২ জন
২৩.	দেওয়ান	১০৪ জন
২৪.	মণ্ডল	১৬২০ জন
২৫.	নায়েব	৫৮১ জন
২৬.	এস্টেট ম্যানেজার	২১ জন

স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষক ও বর্গদার কৃষক শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্ত বলা যায়। ১৪নং সারণিতে উল্লেখিত এ সকল মধ্যস্বত্ব-উপস্বত্বভোগীদের মধ্যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা কম হলেও গ্রামীণ জীবনে তাঁরাই সমাজের কর্ণধার হিসেবে কাজ করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। হাজি শরীয়তুল্লাহ,তিতুমীর, দুদু মিঞা প্রমুখ এরূপ মধ্যবিত্তের সন্তান ছিলেন।

মুসলমান ব্যবসায়িক মধ্যবিত্ত সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। দর্জি, ট্যানারি, বই বাঁধাই, বই বিক্রয়, খালাসী-সারেঙ প্রভৃতি কাজে বাংলার মুসলমান নিযুক্ত ছিলেন। পাশ্চাত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাণ স্রোতের অন্যতম উপাদান ছিল বাণিজ্য উপার্জিত অর্থ। বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা স্থানীয় বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিলেন এমন কিছু ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় ভারতে।[১৬৩] বাংলায় ব্রিটিশ শাসন আরম্ভের পর ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে কিছু ব্যক্তি বাণিজ্য অথবা ব্যাংকিং সংস্থার এজেন্ট হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হন। তাঁরাই বাংলার আধুনিক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য মধ্যবিত্তের পূর্ব পুরুষ।[১৬৪] প্রতিনিধি অথবা দালাল শ্রেণি ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে; কেউ কেউ তা ছোট জমিদারি ক্রয় করে আবার কেউ কেউ ব্যবসা প্রসারেও বিনিয়োগ করেন। তবে তাদের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে বাংলায় বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার খর্ব হলে এদেশে বাণিজ্য মধ্যবিত্তের বিকাশে সহায়ক হয়। এদেশে গড়ে উঠা ইউরোপীয় বাণিজ্যিক ফার্মে বাঙালি হিন্দুরা প্রথমে দালাল বা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত হয়ে ব্যবসায়ের কলা-কৌশল রপ্ত করে পারে তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে অথবা ব্যবসা সংস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশ নেয়।[১৬৫] বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, প্রধান প্রধান পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, পুঁজি যোগান, কাগজের টাকার প্রচলন ও

---

১৬৩. W. H. Moreland, *India At the Death of Akbar, London,* 1920, p. দ্রষ্টব্য।
১৬৪. B. B. Misra, *op. cit.,* p. 76.
১৬৫. *Ibid,* p. 130.

বিভিন্ন বাণিজ্যিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাংলার বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় বাণিজ্য ক্ষেত্রেও বাংলার মুসলমানরা ছিলেন পিছিয়ে।

১৮৫৮ সালের 'বেঙ্গল-ডাইরেক্টরি' (বাণিজ্যিক) ও 'নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি' বাণিজ্য তথ্য থেকে জানা যায়, ইউরোপী ব্যবসায়ীর তুলনায় হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী এজেন্ট ও বেনিয়ার সংখ্যা কম ছিল না। তার তুলনায় মুসলমান ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল নগণ্য।[১৬৬] থেকার্স বেঙ্গল ডাইরেক্টরিতে যে ১০টি মুসলিম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায় এরা সবাই বাংলার বাইরে থেকে এসেছেন।[১৬৭] আর্থ-সামাজিক কারণেই স্থানীয় মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ নিতে পারেনি। A. R. Malick এ প্রসঙ্গে বলেন, "Muslims had not taken to commerce or trade and failed to produce the much needed middle class."[১৬৮] তবে উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও কোন কোন ব্যবসায়িক সংগঠনে দু'চার জন মুসলমান ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায়, তবে সে সংযোগ ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়িক স্বার্থে, সমাজসেবা কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সমবেত হননি।[১৬৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত বাস্তবতায় মুসলিম বণিক ব্যবসায়ীদের মনন জগতেও পরিবর্তন ঘটে। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, এই সময় মুসলমান ব্যবসায়ীরা সভা-সমিতিতে সমবেত হয়েছেন সামাজিক সংহতি চিন্তা ও পরোপচিকীর্ষাবৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে। মাদ্রাসা, স্কুল, ছাত্রাবাস, এতিমখানা, মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনায় তাঁদের অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন। কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রাবাস 'এলিয়ট হোস্টেল' (১৮৯৬) নির্মাণে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ী চাঁদা দিয়েছেন। উক্ত মাদ্রাসায় মুসলমান ব্যবসায়ীদের সন্তানরা পড়ালেখা করেছেন, ১৮৬৯ সালের ছাত্রদের কুল পরিচিতির তালিকা থেকে তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উনিশ শতকের আশির দশক থেকে সর্বক্ষেত্রে তাদের সম্প্রদায়গত পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে এবং বিভিন্নভাবে তারা নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে চেষ্টা করতে থাকেন। এসময় পত্র পত্রিকায় মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণে বিভিন্ন সুপারিশ প্রকাশিত হতে থাকে। সমকালীন এক সাময়িকীতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়: "তোমরা অর্থশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, জমিয়ত, আঞ্জুমান, লীগ, কনফারেন্স, সভা-সমিতি, এসেম্বলি, এসোসিয়েশন, মজলিস, বৈঠক প্রভৃতির সঙ্গে হামদর্দ্দ রাখ ...।"[১৭০] আর একটি পত্রিকায় লেখা হয় : "... প্রত্যেক বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্রে যেমন সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, চাঁদপুর, সরিষাবাড়ি, হিলি, হলদিবাড়ি, নীলফামারী, বদরগঞ্জ, ভৈরব এবং প্রত্যেক জেলা সদর ও মহাকুমায় তুমুল আন্দোলন ও উদ্যোগ করিয়া ৫/৭/১০ লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া কোম্পানি খুলিতে হইবে যাহাতে দরিদ্র ব্যক্তিও ২/৪ অংশে ক্রয় করিতে পারে, সেই জন্য শেয়ারের মূল্য

১৬৬. *Ibid,* p. 106.
১৬৭. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭।
১৬৮. A. R. Mallick, *op. cit.,* p. 75.
১৬৯. *অনুশীলন*, আশ্বিন, ১৩৭২।
১৭০. *রওশন হেদায়েৎ*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩২।

১০/৫, টাকা করিতে হইবে। ব্যাপারি প্রায় সর্বক্ষেত্রই মুসলমান। আর ব্যাপারিদিগকে অংশীদার করা কঠিন ব্যাপার নহে।"[১৭১] ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানরা অবহেলিত ছিল। সে সম্পর্কে ইসলাম প্রচারক মন্তব্য করে, "... কত দেওয়ান সাহেব, কত চৌধুরী সাহেব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার হিসাব লইলে হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে। ... ব্যবসায়টা মুসলমান জমিদারদের মধ্যে কোন শ্রেণিতেই নাই। মুসলমানদের মধ্যে একটু গণ্যমান্য হইলেই ব্যবসায়কে হেয় জ্ঞান করেন।[১৭২]

সমকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে উপর্যুক্ত প্রচার-প্রচারণা মুসলিম সমাজে একধরণের প্রভাব ফেলেছিল। রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আঘাত হেনেছিল। ফলে মুসলিম সমাজ জীবনোপযোগী পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কেও সচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং কিছু ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। সম-সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কলিকাতা, ঢাকা, সিলেট, যশোর, ২৪ পরগণা, হাওড়া ইত্যাদি শহরে মুসলিম ব্যবসা ফার্মের বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদেরকে বাণিজ্য নির্ভর মধ্যবিত্ত বলা যায়। নিম্নে সেগুলোর নাম তুলে ধরা হলো :

১. সেখ ফসিউল্লাহ এ্যাড কোম্পানি লিঃ (সুগন্ধ দ্রব্য সমূহ) হাওড়া।
২. সফি এ্যাণ্ড কোম্পানিস (কেমিষ্ট), কলিকাতা।
৩. তাজ লাইব্রেরি, কলিকাতা।
৪. এস. কে. হামিদিয়া, যশোর।
৫. দারুশ শাফা এ দরবেশিয়া, কলিকাতা।
৬. তাজ এ কুর্সী মার্কা লুঙ্গীর একমাত্র এজেন্ট, মোহাম্মদ সোলেমান চৌধুরী, কলিকাতা।
৭. জেনুইন লুব্রেকেটিং তৈল, এস. এম. দাউদ ব্রাদার্স, কলিকাতা।
৮. গাজীপুর আতর ডিপো, প্রোপাইটর মোঃ জনি সাহেব, কলিকাতা।
৯. জৌনপুর পারফিউমারী ওয়ার্কস, এইচ. এম. জেকারিয়া এ্যাণ্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা।
১০. দর্জ্জির সরঞ্জাম, এইচ. এ. রশিদ, এ খালেক, কলিকাতা।
১১. হিন্দুস্থানী জর্দা, সোলেমানী কিমাম, প্রোঃ মোঃ সোলেমান এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা।
১২. অলংকার নির্মাতা, লোৎফর রহমান এণ্ড সন্স, রাজার হাট, বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা।
১৩. এইচ. এম. আবদুল গণি এ্যাণ্ড কোঃ বিলাতি ঔষধ বিক্রেতা, কলিকাতা।[১৭৩]

মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছিলেন কৃষিজীবী। পাট ছিল তাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। পাটের ব্যবসার সাথে জড়িত মুসলমান ব্যক্তিদের বাণিজ্য নির্ভর মধ্যবিত্ত বলা যায়। পাটের উৎপাদন থেকে পাটকল পর্যন্ত মধ্যবর্তী পর্যায়ে জড়িত ছিলেন অনেক মুসলমান। এসময়ের উপন্যাসে এমন ধরনের মুসলিম চরিত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কাজী ইমদাদুল হক রচিত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের চরিত্র রসুলপুরের মীর মোহসেন আলী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক। তিনি আভিজাত্যের রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনাকে উপেক্ষা করে পাটের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের

---

১৭১. *ছোলতান*, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।
১৭২. *ইসলাম প্রচারক*, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।
১৭৩. *হানাফী*, ১৩৪৪-এর ভলিউম-১২, নং ১৭-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

'আনোয়ারা' উপন্যাসের নায়ক নুরুল ইসলাম বিদেশি কোম্পানির পাট ক্রয়ের দালাল হিসেবে জীবিকা অর্জন করেছেন।[১৭৪]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, কিছুটা বিলম্ব হলেও বাংলায় একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্মেষ হয়েছিল। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তিনটি শ্রেণির সমন্বয়ে- (ক) নব্য শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণি; (খ) মধ্যম শ্রেণির ভূ-মধ্যাকারি শ্রেণি এবং (গ) বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণি। স্বসমাজের জাগরণ এবং নতুন জীবনবোধ সৃষ্টিতে তাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তবে এ কথাও সত্য যে, মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় ক্ষুদ্রাকার ছিল। গঠনগত উপাদান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তাঁদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। এ প্রসঙ্গে আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষ্য মতে,

> আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কেমন করে দ্রুত গতিতে শ্রেণীচ্যুত হয়ে গেল সে কাহিনীর উল্লেখ হয়ত নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রায় একশ বছর ধরে বাঙালার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভেতর দিয়ে এসেছে, বাঙালী মুসলমানদের জীবনে যে অবস্থা এসেছে মাত্র সেদিন–উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই সময়গত পার্থক্য ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মেতিহাসের একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যা এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক পরিণতিকে স্বতন্ত্র করেছে। মুসলমান আমলে হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রশাসনে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে নির্দ্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরেজ আগমনের ফলে তা কিয়ৎ পরিমাণে আলোড়িত হলেও মূলত ধ্বংস হয়নি। ব্যবসায় বা শাসন ক্ষেত্রে তারা শাসক শ্রেণীর একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। এক যুদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিসাবে পণ্য বিতরণ, সরকারি চাকুরি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং ফলে তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব রয়েছে অক্ষত। মুসলমান শাসক ও তাঁদের সহযোগী শ্রেণীর যুদ্ধ ও শাসনকার্য ছাড়া অন্য জীবিকা ছিল না, সেজন্য নতুন শাসকশ্রেণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। ... হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন যত সহজ হয়েছিল মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তত সহজে দ্রুত তৈরি হতে পারেনি। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে উন্নতশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হবার একটা মজ্জাগত ক্ষমতা আছে, মুসলমানের নেই এবং নেই বলেই তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও এখনও (বিভাগান্তর কালে) সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠতে পারে নি। বাঙালি মুসলমান এখনও বুর্জোয়ার মত পরিবর্তন বিমুখ বা আত্ম পরিতৃপ্ত হয়ে উঠেনি।[১৭৫]

সার্বিক বিবেচনায় এ কথা বলা যায় যে, বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত উনিশ শতক পর্যন্ত পরিণত ও স্থিতিশীল হয়নি। গোপাল হালদার স্থিতিশীলতার অভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> মুসলিম কোন কারণে (যেমন- রাজকার্যে, বিচার দপ্তর, ফৌজের ছোট আমলা হয়ে, ব্যবসায়সূত্রে) মধ্যবিত্তের কোঠায় উঠলে সহজেই অভিজাতের পদবীতেও উঠে যেতে পারত। ... মুসলমান উত্তরাধিকার আইনও অনেকাংশে মুসলমানী জীবন যাত্রা পদ্ধতি, আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমান মধ্যবিত্তকে টেনে নিচে নামিয়ে আনত।[১৭৬]

---

১৭৪. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮।
১৭৫. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৫৯-৬০।
১৭৬. গোপাল হালদার, *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ*, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৪৬।

বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারির ভিত্তিতে বাংলার জনগণের জীবিকার অবলম্বনের হার পাওয়া যায়। ১৮৮১ থেকে ১৯০১ সালে গৃহীত দুটি আদমশুমারির রিপোর্ট ভিত্তিতে পেশাজীবী ও অন্যান্যদের হার নির্দেশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, বাংলার জনগোষ্ঠী প্রধানত কৃষি ভিত্তিক ছিল। অন্য পেশাজীবীদের হার ছিল ১৮৮১ ও সাল ১৯০১ সালে ছিল যথাক্রমে ৬.৩৪ এবং ৫.৬৫ ভাগ। আর এর মধ্যেও অধিকাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।[১৭৭]তবে সংখ্যা স্বল্প হলেও মুসলিম পেশাজীবী শ্রেণি সমকালীন বাংলার রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলার তৎকালীন ইতিহাস অধ্যয়নে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে তাঁদের কুল পরিচয় যাই থাকুক, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শরীফ শ্রেণির সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১৭৮] যাঁরা নব্যপন্থি তাঁরাই পাশ্চাত্য সেক্যুলার শিক্ষার পক্ষপাতী, আর যাঁরা প্রাচীনপন্থি তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মুসলমান উদীয়মান মধ্যবিত্তের এরূপ পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্বসংকুল মিশ্ররূপ বিদ্যমান ছিল। নজমুল করিম বলেন,

> The Bengal Muslim Middle Class, like its Hindus counterpart, had its roots in an agrarian set-up but, unlike its counterpart, began to be recruited from various Muslim social classes as the 19th century to a close and this feature began to get more opportunities in jobs, etc. with the first partition of Bengal (1905) and introduction of a reserved quota for Muslim in Government Service.[১৭৯]

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ ছিল অসম। আর এ অসম বিকাশের জন্য উভয় শ্রেণির মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাৎ দেখা দেয়। অনেকেই মনে করেন যে, এটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সামাজিক বিবর্তন ধারার অনিবার্য ফল। এ প্রসঙ্গে যখন শ্রেণিস্বার্থের উত্থান হয়েছে তখন উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি নিজ নিজ গতিপথ ধরেছে।উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকৃত বীজ এখানেই নিহিত ছিল বলেও পণ্ডিতদের মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জীবন ধারণ উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা এবং সুযোগ কম থাকায় এ সময় বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকুরির উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। পুঁজিহীন নিঃস্ব মুসলিম সমাজে সেটা বেশি করে প্রকাশ পেয়েছিল। তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল, বাংলার লোকসংখ্যার অর্ধেক মুসলিম, তাই জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরি ও আইন সভায় স্থান দিতে হবে। লর্ড রিপনকে প্রদত্ত 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের ১৮৮২ সালের 'স্মারকলিপি'তে এ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া

১৭৭. দ্রষ্টব্য *Census of Bengal*, 1881, vol. 1, p. 178. And *Census of India*, 1901, vol. VI, part- 1, p. 449-497.; *Census of India*, 1921, vol. V, Bengal, part- II, p. 365

১৭৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২।

১৭৯. Abdul Khair Nazmul, *The Modern Muslim Politial Elite in Bengal* (Unpublished Doctoral Thesis), University of London, 1964;উদ্ধৃতি, ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।

হয়েছিল।[১৮০]অন্যদিকে তুলনামূলক বিচারে অগ্রসর হিন্দু নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল সাধারণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকুরি এবং আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ। এই নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল।

কেবল শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে নয় উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনৈতিকভাবেও সচেতন হয়ে উঠেন। এই অবস্থায় ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে এতে অংশগ্রহণ প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কংগ্রেসে যোগদানকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের সন্দেহ, মনোমালিন্য বিষয়টিও প্রকাশ্যে আসে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, অসাম্প্রদায়িক হলেও কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান যেমন কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকেন, তেমনি বাংলায় নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী আমন্ত্রণ পেয়েও যোগদান করেননি। বাংলাপত্র-পত্রিকায় মুসলিম লেখকগণও কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান না করার পক্ষে মত দেন। এমনকি তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল বাংলার মুসলমানরা অনগ্রসর জাতি, অগ্রসর হিন্দুদের সাথে রাজনীতি করে ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হওয়া মুসলমানদের পক্ষে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলী অবশ্য মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে নিরুৎসাহিত করলেও মুসলমানদের রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা ও রাজনীতি বিযুক্ত থাকাকে সমর্থন করেননি। উভয় নেতাই কংগ্রেসের বিপরীত ধারায় মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়শন নিছক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল না। একে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বাংলার মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। অন্যান্য লক্ষ্যের সাথে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেউন্নতির ব্যবস্থা করাও এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার জন্য ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন বক্তৃতা, সামাজিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করত।[১৮১] মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও আদায়ে আমীর আলীর উপর্যুক্ত সংগঠনটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিয়েও অবশ্য একথা বলতে হয় যে, কংগ্রেসের মত সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের বিকল্প হিসেবে এটি সফল হয়নি। একই কথা প্রযোজ্য সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স সহ অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রে। বস্তুত কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলমানদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল মুসলিম লীগ এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৬ সালে। তবে এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রভূমি তৈরি করেছিলেন উনিশ শতকের শেষ দিককার মুসলিম সমাজের

---

১৮০. K. K, Aziz, *Ameer Ali: His life and works*, Karachi, 1963, p. 35-36.

১৮১. Mohammad Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D. 1757-1947*, University of Dhaka, Second ed. 201, pp. 194, 201

নব্যপন্থি নেতারাই। এক্ষেত্রে বাংলার মুসলিম নেতাদের অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আরো লক্ষণীয় যে, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাতেই এবং এর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহসহ আরো বাংলার মুসলিম নেতাদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

শুধু রাজনৈতিক সংগঠন নয়, অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে কাজ করেনি। হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দুদের আধিক্য, আবার মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের আধিক্য ছিল। শহর-মফস্বল প্রায় একই চিত্র বিরাজমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের উপনিবেশিক স্বার্থে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের পরস্পর দ্বন্দ্বের বিরোধ নিষ্পত্তির চেয়ে বিরোধ বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ যার একটি প্রত্যক্ষ ফল।[১৮২] প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হলেও বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজও নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম মধ্যবিত্তের কার্যকলাপের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুসলমান সমাজে ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল লতিফ এ ব্যাপারে প্রথম প্রবক্তা ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলীও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা দু'জন ইংরেজদের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে স্বজাতির অধিকারের কথা বলেছেন। তবে নবাব আবদুল লতিফ অপেক্ষা সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন অনেক বেশি প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ। তিনি কেবল মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও জাগরণের মধ্যেই তাঁর কর্মপ্রয়াস সমিবদ্ধ রাখেননি তাদের রাজনৈতিক জাগরণ ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধিকরেছিলেন। সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে আমীর আলীর মতাদর্শের মিল ছিল। তাঁরা উভয়েই ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের সপক্ষে কথা ভেবেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি খ্রিস্টানদের আক্রমণাত্মক সমালোচনায় তিনি আহত হয়েছিলেন। তিনি *স্পিরিট অব ইসলাম* (১৮৯১) গ্রন্থে ইসলামের শরিয়তী আদর্শের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং আরবের প্রথম যুগের মুসলমানের গৌরব ও বীরত্বের ইতিহাস রচনা করে ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। যেমনটা করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানও। উইলিয়াম মুইর-এর *লাইফ অব মহামেডান* (১৮৬৯) গ্রন্থের প্রতিবাদে সৈয়দ আহমদ হজরত মুহম্মদের জীবনী লিখে মুসলমানদের সম্মানিত করেছেন।

সৈয়দআমীর আলীর অনুসারীদের মধ্যে উদীয়মান নব্য শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি ছিল। নজমুল করিম নবাব আবদুল লতিফের অনুসারীদের 'ওল্ড এলিট' এবং আমীর আলীর অনুসারীদের 'নিউ এলিট' বলেছেন।[১৮৩]সৈয়দ আমীর আলী ও নবাব আবদুল লতিফের ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সরকারের প্রতি তাঁদের উভয়ের অধিক নির্ভরশীলতাকে অনেকেই সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে W. S. Bluntএর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে

১৮২. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪।
১৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

পারে। তাঁর ভাষায়, "Neither Amair Ali nor Abdal-Latif would afford to come forward as championss as all their prospects depended on the Government."[১৮৪]এই বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা আছে ঠিকই, তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্যমান বাস্তবতায় এর কি কোনো বিকল্প ছিল? মুসলিম রক্ষণশীল সমাজের জেহাদি তৎপরতা ইতোমধ্যেই অসার প্রমাণিত হয়েছিল। এরূপ মনোভঙ্গি মুসলিম সমাজের ভাগ্যপরিবতর্ন করতে পারেনি, বরং সরকারের সাথে ক্রমবর্ধমান বৈরী সম্পর্ক মুসলিম সমাজকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করেছিল। ফলে তাদের ঠিকে থাকাই দায় হয়ে পড়েছিল। রক্ষণশীল মুসলিম নেতাদের নেতৃত্বও তখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় কাণ্ডারীহীন সমাজের মুখপাত্র হয়ে আবদুল লতিফ ও আমীর আলী অধঃপতিত মুসলমানের মতিগতি ফিরিয়েছিলেন। আর এখানেই তাঁদের নেতৃত্বের স্বার্থকতা।

উনিশ শতকের শেষার্ধে নব উত্থিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখপাত্রদের মধ্যে দেলওয়ার হোসেন আহমেদ মীর্জা, সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখের কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। তাঁরাসনাতনী মুসলিম আভিজাত্যের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে শিক্ষা ও সমাজ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রথমে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩) এবং পরে 'প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩) স্থাপন করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন করেন। তাঁরা শহুরে মধ্যবিত্তের পাশাপাশি বাংলার গ্রামীণ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং গ্রামের মানুষকে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট দেলওয়ার হোসেন আহমদ একজনবিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক আইন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকেই মুসলমান সমাজের অনগ্রসারতার জন্য দায়ী মনে করেন। উত্তরাধিকার আইন, মহাজনী কারবার, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদিরব্যাপক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজকে আধুনিক সমাজে রূপান্তরের প্রত্যাশী ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি একাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন।[১৮৫] সংখ্যায় কম হলেও প্রায় একই রকম মনোভাব পোষণকারী মুসলিম পণ্ডিতদের তৎপরতাও এ সময় লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজের সংস্কার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়াস গ্রহণকারী মুন্সি মুহম্মদ মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ, শেখ আবদুর রহিম, মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী প্রমুখ বাঙালি মুসলমান লেখক ও সম্পাদকের কথা উল্লেখ করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাঁরা বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সমাজের উন্নয়নের চেষ্টা করেন। মুসলমানদের প্রথম সংগঠন কলকাতার 'মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫৫), তাঁর পর 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠে এবং মফস্বল শহরগুলোতেও এদের আদর্শে সভা-সমিতি স্থাপিত হয়। এ সকল সভা-সমিতি মুসলমান সমাজে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা,

---

১৮৪. Wilfred Schwen Blunt, *India Under Ripon*, A Private Diary, London, 1909, p. 109.

১৮৫. Delawar Hosain Ahmed, *The Future of the Mohammedan of Bengal* (1980), *Essays on Mohammedan Social Reform* (1889), *Mohammedan Law of Inheritance* (1896).

সংহতিবোধ এবং সমাজমুখী চিন্তন জাগ্রত করে। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার। কোন কোনটি রাজনৈতিক চিন্তনেরও প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

মুসলিম মধ্যবিত্তের হাতে আধুনিক সাহিত্যের চর্চাও এ পর্বেই শুরু হয়। এর পূর্বে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষা শিখতেন না, বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল উর্দু-ফারসি; আবদুল লতিফের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল গফুর উর্দু কবি ছিলেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ ফারসিতে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। নবাব আবদুল লতিফ নিজেও উর্দু ভাষার সপক্ষে ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল এমনটা মনে হয় না। উর্দু বাঙালির মাতৃভাষা নয়। মাতৃভাষা ছাড়া জাতীয় চিন্তা-চেতনার বিকাশ হয় না।[১৮৬] উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাঝে এ বোধ জাগ্রত হয়। ফলে তারা বাংলা ভাষা চর্চায় বিশেষগুরুত্বারোপ করেন।সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন উদরতা ও যুক্তিশীলতাকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন এবং প্রথম গদ্য লেখেন। তবে তাঁর লেখা এবং মুক্তচিন্তার ডাক মুসলিম সমাজ শুরুতেই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিল এ দাবি করা যাবে না। তিনি*গো-জীবন* (১৮৮৭) লিখে কাফের ফতোয়া পান এবং মামলায় জড়িয়ে বিপদগ্রস্ত হন। তাই তিনি বাধ্য হয়ে ঐ পথ ছেড়ে *মৌলুদ শরীফ* (১৯০৩), *মোসলেম বীরত্ব* (১৯০৭) প্রভৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর পরে টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, যশোরের মুন্সি মুহম্মদ মেহেরুল্লা, নদীয়ার শেখ জমিরুদ্দীন, বরিশালের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ২৪ পরগণার শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ গদ্য লিখে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁদের সমসাময়িক ঢাকার কায়কোবাদ, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, রংপুরের শেখ ফজলল করিম, মেদিনীপুরের শেখ ওসমান প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকরা সুস্থ চিন্তা করেছেন সমাজের আবেগগত অনুভূতিতে ভারসাম্য আনার জন্য।

ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের একটি অংশ বিভিন্ন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত হয়ে অর্থনৈতিক এবং সমাজ-জীবনের উন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছেন। এদের মধ্যে অনেকে নিজের অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম সমাজের পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেছেন। এ লক্ষ্যে তাঁরা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুকরণে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংবাদ-সাময়িকপত্র ও পত্র-পত্রিকা যৌথকর্ম সাধনেরও মুক্তচিন্তা প্রকাশের একটি উত্তম মাধ্যম।[১৮৭] সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য যে, বাংলায় ব্রিটিশ শাসনামলে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করে এবং ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্নেই এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের সূত্রপাত ঘটে। মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলোর উদ্যোক্তা বা সম্পাদকরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যশ্রেণির।[১৮৮] এ মধ্যশ্রেণির অন্তর্গত ব্যক্তিরাই পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

মুসলিম মধ্যবিত্তরা সরাসরি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো সমাজ সংহতি, রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেননি। অতএব তাঁদের লেখনির মাধ্যমে তাঁদের সংগ্রামী প্রগতিশীল

---

১৮৬. মনিরুউদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২০৫-৬।
১৮৭. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮।
১৮৮. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র* (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৮৫।

মনোভাবকে তুলে ধরেন। মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু শক্তির পুনরাভ্যুত্থানের ধারাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি; বরং তাঁদের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে সর্বত্র। আবদুল লতিফ মধুসুদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ভাবাদর্শ ছিল ভিন্ন। মুসলমান সমাজের অবনতি থেকে রক্ষা করাই দায়, তাকে সংগ্রামের মুখে ঠেলে দেয়া ঠিক হবে না ভেবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েও আবদুল লতিফ এমনকিআমীর আলীও হিন্দু সমাজের সংগ্রামী চেতনার সাথে যোগ দিতে পারেননি। আমীর আলী সরকারি অনুগ্রহ বণ্টনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দাবি করেন। মুসলমান সমাজপতিদের এরূপ মনোভাবকে পুঁজি করে শিক্ষিত মুসলমানদের একটি অংশ সাহিত্য লেখা ও সাংবাদিকতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঠিক এ সময় হিন্দু সমাজের নেতা ও সাহিত্যিকগণের মনোভাবের উল্টো ধারা চলে। ফলে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয় তা থেকে মুসলমান পরিচালিত বাংলা সাময়িকপত্রগুলোর জন্ম লাভ করে।[১৮৯]

বাংলায় জেমস হিকির সম্পাদনায় প্রথম সংবাদপত্র *বেঙ্গল গেজেট* ইংরেজি ভাষায় ১৭৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের জন ক্লাক মার্সম্যানের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *দিগদর্শন* প্রকাশিত হয়। পরবর্তী এক মাসের মধ্যেই প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পণ* প্রকাশিত হয়। বাঙালি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *বাঙ্গলা গেজেট* প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের জুন মাসে। ১৮২১ সালে সেপ্টেম্বরে রামমোহন রায় *ব্রহ্মণ সেবধি* নামে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষী পত্রিকা প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পাদনায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিকসহ বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।[১৯০] ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশ বাংলা ভাষা এবং বাঙালির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল বাংলা গদ্যরীতির এবং আবির্ভাব হয়েছিল বহু নতুন লেখকের।[১৯১]

মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের গোঁড়াতে। ১৮৩১ সালের মার্চে শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় বাংলা-ফারসি দ্বিভাষী সাপ্তাহিক *সমাচার সভারাজেন্দ্র* প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬ সালে জুন মাসে রজব আলীর সম্পাদনায় *জগদুদ্দীপক ভাস্কর* কলকাতা থেকে বাংলা-হিন্দি, উর্দু-ফারসি-ইংরেজি পঞ্চভাষী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়।[১৯২] একই সঙ্গে একাধিক ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ উনিশ শতকে সহজ ছিল না। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল সম্পাদকদের ছিল না। আর এ কারণেই উক্ত পত্রিকাদ্বয় বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৬১ সালে আলাহেদাদ খাঁর সম্পাদনায় *ফরিদপুর দর্পণ* প্রকাশের বিজ্ঞাপন পাওয়া গেলেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।[১৯৩] পরবর্তীকালে কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উর্দু-ফারসি ভাষা সমাজে ব্যাপক প্রচলিত থাকায় ঐ ভাষাদ্বয়েও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। এ সময় বাংলা

---

১৮৯. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০।
১৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭।
১৯১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০)*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ২৪।
১৯২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৩৮-৩৯।
১৯৩. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪।

পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাতেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন, মুনাফা অর্জন, সমাজ সংস্কার এবং জ্ঞানের প্রসার।[১৯৪] এগুলো ক্ষণস্থায়ী হলেও মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত করেছিল ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে 'আঞ্জুমানে ইসলামীয়া'র মুখপাত্র হিসেবে *দুরবীন* মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। এর সম্পাদক ছিলেন আঞ্জুমনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগের শিক্ষক মৌলভি আবদুর রউফ। আধুনিক মুসলমান বাংলা সাহিত্যের জনক মীর মশাররফ হোসেন ১৮৭৪ সালে *আজিজন নাহার* ও ১৮৯০ সালে *হিতকারী* নামে দুটি মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা বের করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে মইন উদ্দীন সম্পাদিত*আখবারে ইসলামীয়া* (১৮৮৪-১৮৯৫), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত *মুসলমান* (১৮৮৪) ও *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১, ১৮৯৯), শেখ আবদুর রহীম সম্পাদিত*মিহির* (১৮৯২) ও *সুধাকর* ও *হাফেজ* (১৮৯৭), এ. কে. এম. রওশন আলী সম্পাদিত*কোহিনূর* (১৮৯৮) প্রমুখ সাংবাদিক ও লেখকবৃন্দ বাংলার মুসলিম চিন্তার রূপান্তরে অবদান রেখে সমাজ উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন।[১৯৫]

তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ৯০৫টি সংবাদ সাময়িকপত্রের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয় ২৪০টি।[১৯৬] ১৮৭৮-১৮৮৮ সালের এক দশকে বাংলায় স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময়ের বাংলায় স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং এর প্রচার সংখ্যা নিম্নের ১৮নং সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ১৮[১৯৭]

বছর	পত্রিকার সংখ্যা	যে কয়টি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দেখানো হয়েছে	মোট প্রচার সংখ্যা
১৮৭৮	৩৯	২৩	২৩,৮৯৩
১৮৭৯	৪৪	২২	১৭,৮২৬
১৮৮০	৪০	৩৫	২২,১৮৭
১৮৮১	৩৭	২৯	১৯,১১০
১৮৮২	৪৮	২৭	১৯,০৭৯
১৮৮৩	৫৫	২৮	১৮,৮৮৯
১৮৮৪	৬৪	৩৬	২৫,৬৮০
১৮৮৫	৫২	৪১	৩৮,৮৯৪
১৮৮৬	৬৩	৪৫	৭২,৮২৩
১৮৮৭	৬২	৪৩	৬৪,১০২
১৮৮৮	৬২	৪৭	৭৭,১৯০

তবে সারণিতে উল্লিখিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রকাশক ও গ্রাহকের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এদের দেখাদেখি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিও এগিয়ে আসেন। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো বাংলার

১৯৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, সাক্ষরতা প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৪।
১৯৫. অমলেন্দু দে, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী*, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৪৪, পদটীকা-১৯।
১৯৬. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩১।
১৯৭. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism,* Cambridge at the Univeristy Press, 1971, Appendix-5, p. 367.

কোনো মুসলমান কর্তৃক প্রথম সাময়িকপত্র কলকাতা অথবা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়নি; বরং সে সময়ে অখ্যাত শহর বরিশাল থেকে বের হয়েছিল। ১৮৭৩ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মুসলমান কর্তৃক ২৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম সাংবাদিক ও লেখক কর্তৃক এ সময়ে (১৮৭৩-১৯০০) প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িক পত্রসমূহের তালিকা নিম্নের ১৯নং সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি ১৯[১৯৮]

ক্র. নং	সময়	পত্রিকার নাম	শ্রেণি	সম্পাদকের নাম	প্রকাশ স্থান
১.	১৮৭৩	বালারঞ্জিকা	সাপ্তাহিক	সৈয়দ আবদুল রহিম	বরিশাল
২.	১৮৭৪	আজীজননেহার	মাসিক	মীর মশারফ হোসেন	চুঁচুড়া
৩.	১৮৭৪	পারিল বার্তাবহ	পাক্ষিক	আনিস উদ্দিন আহমদ	ঢাকা
৪.	১৮৭৭	মহম্মদি আখবর	অর্ধসাপ্তাহিক	কাজী আবদুল খালেক	কলকাতা
৫.	১৮৮৪	আখবারে এসলামীয়া	মাসিক	মোহাম্মদ নইমুদ্দীন	করটিয়া
৬.	১৮৮৪	মুসলমান	সাপ্তাহিক	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলকাতা
৭.	১৮৮৪	মুসলমান বন্ধু	সাপ্তাহিক	মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলকাতা
৮.	১৮৮৫	ইসলাম	মাসিক	একিন উদ্দিন আহমদ	কলকাতা
৯.	১৮৮৬	নব সুধাকর	সাপ্তাহিক	মোঃ রেয়াজুদ্দিন আহমদ	কলকাতা
১০.	১৮৮৬	আহমদী	পাক্ষিক	আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	টাঙ্গাইল
১১.	১৮৮৭	হিন্দু-মোসলেম সম্মিলনী	মাসিক	গোলাম কাদের	কলকাতা
১২.	১৮৮৯	সুধাকর	সাপ্তাহিক	শেখ আবদুর রহিম	কলকাতা
১৩.	১৮৮৯	ভারতের ভ্রমনিবারনী	ত্রৈমাসিক	মোহম্মদ আবেদিন	কলকাতা
১৪.	১৮৯০	হিতকরী	পাক্ষিক	মীর মশাররফ হোসেন	লাহিনী পাড়া
১৫.	১৮৯১	ভিষক-দর্পণ	মাসিক	এম. জহিরুদ্দীন আহমদ	কলকাতা
১৬.	১৮৯১	ইসলাম-প্রচারক	মাসিক	মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলকাতা
১৭.	১৮৯২	মিহির	মাসিক	শেখ আবদুর রহিম	কলকাতা
১৮.	১৮৯২	হাফেজ	পাক্ষিক পরে মাসিক	শেখ আবদুর রহিম	কলকাতা
১৯.	১৮৯২	টাঙ্গাইল হিতকারী	সাপ্তাহিক	মোসলেম উদ্দিন খাঁ	টাঙ্গাইল
২০.	১৮৯৫	মিহির ও সুধাকর	সাপ্তাহিক	শেখ আবদুর রহিম	কলকাতা
২১.	১৮৯৮	কোহিনূর	মাসিক	মুহম্মদ রওশন আলী	পাংশা
২২.	১৮৯৯	প্রচারক	মাসিক	মধূ মিঞা	কলকাতা
২৩.	১৯০০	লহরী	মাসিক	মোজাম্মেল হক	শান্তিপুর
২৪.	১৯০০	নূর-অল ইমন	মাসিক	মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী

সারণিতে উল্লেখিত পত্রিকার অনেকগুলোর নাম ছাড়া বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না এবং অধিকাংশই ছিল ক্ষণস্থায়ী। দু'একটি সাময়িকপত্রের নাম জানা যায় তবে সেগুলোর গুরুত্ব তেমন ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোও প্রায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। স্বল্প আয়ু, ক্ষীণ কলেবর, খণ্ডদশ যাই থাক না কেন, এগুলো

১৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৮; আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪।

উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রচারে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। জনশিক্ষা ও জনমত গঠনেও এগুলোর গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেকছিল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশি সামন্তরাজের অসির লড়াই শেষ হলে শুরু হয় মসির লড়াই। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ লড়াই শুরু করেন বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। উনিশ শতকের নবজাগরণের ঊষালয় থেকেই সংগ্রামের সূত্রপাত। অতএব, বাংলার মুসলমানদের প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলো শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশে সমাজের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে মুসলিম চিন্তার রূপান্তর ঘটাতে সহায়ক হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রায় অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ভারত তথা বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে নীরব থাকে। এ সময় প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় ব্রিটিশ সরকারের সংস্পর্শে এসে ব্রিটিশ কৌশল রপ্তকরার পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা ও সমাজ সংস্কারে মুসলমানদের থেকে এগিয়ে যায়। তারা ব্রিটিশদের সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে আর্থ-সামাজিকভাবে অগ্রসর জাতিতে পরিণত হয়।অন্যদিকে এ সময় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকে আধিপত্যবাদী ভেবে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকে। ব্রিটিশরা ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে চালু করলেও মুসলমানরা তা থেকে দূরে থাকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পুরো সময়। ফলে মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ে তাঁদের সামাজিক জীবনে। মুসলিম সমাজের এই গুরুতর দুর্দিনে মুসলিম সমাজে নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো মনীষীর অবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সমাজ বাস্তবতা উপলব্ধি করে মুসলিম সমাজের করণীয় নির্ধারণ করেন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল নিয়ে অগ্রসর হন। মুসলমানদের মুক্তি ও কল্যাণে তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে তাদের উৎসাহিত করেন। এ লক্ষ্যে তারা ইংরেজ সরকারকেও মুসলমানদের জন্য উপযোগী সরকারি নীতি-কৌশল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁদের কর্মোদ্যোগের ফলে মুসলমান সমাজ ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। এদের মাঝ থেকে উদ্ভব ঘটে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আকার, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিন্দু মধ্যবিত্ত অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নতর হলেও সাধারণভাবে বাঙালি সমাজ বিশেষ করে স্বসম্প্রদায়ের উপর তাঁদের প্রভাব ও গুরুত্ব কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। উপরের আলোচনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজের চিন্তা জগতে রূপান্তর ঘটিয়েছিল। ধর্মীয় ও ঐতিহ্য চিন্তার রক্ষণশীলতা থেকে তাঁরা মুসলিম সমাজকে বাস্তববাদী যুগচেতনা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। জীবনের উপযোগী নীতি ও কর্মকৌশল গ্রহণে তাদের পথনির্দেশনা প্রদান করেছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুসলিম সমাজের চিন্তার জগতেই কেবল রূপান্তর সাধনে কাজ করেননি, তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা সামাজিক সংস্কারেও নেতৃত্ব দেন। এমনকি তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করারও চেষ্টা করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচি এবং সরকারের

প্রতি একরকমের আনুগত্যবোধ প্রকাশের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই রাজনৈতিক নীতি-কৌশলকে সমালোচনা করা হয় বটে, তবে তাৎকালীন মুসলিম সমাজের বাস্তবতাও স্মরণ রাখতে হবে। বস্তুত সার্বিক দিক থেকে পশ্চাদপদ একটি মুসলিম জাতিকে এগিয়ে আনার জন্য সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। এ সহযোগিতা নির্ভর করত পারস্পরিক সমঝোতার উপর। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম নেতাগণ এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই তাঁরা ব্রিটিশ উৎখাতে জিহাদি তৎপরতাকেই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ নীতি ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে ইংরেজ বিতাড়ন সম্ভব হয়নি, উপরন্তু শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। এ বাস্তবতায় নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে রাজনৈতিক নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল অধিক যুক্তিসম্মত ও বাস্তববাদী। পূর্বসূরিদের অপেক্ষায় তাঁরা যুগবাস্তবতা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়।

উপসংহার

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক এক যুগ সন্ধিক্ষণ– মানবতাবাদ, ইহলৌকিকতা, যুক্তিবাদ, উদারনৈতিকতা এবং মুক্ত-বুদ্ধি চর্চা হয়ে উঠেছিলো প্রধান লক্ষণ। এ লক্ষণগুলোকে বিবেচনা করে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণকে রেনেসাঁ হিসেবে দেখেছেন অনেক ঐতিহাসিক। বাংলার ভূমি নির্ভর অর্থনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত জটিল ও চাঞ্চল্যকর, আর তদযুক্ত কৃষক বা রায়তই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি নিম্নবর্গ, যাদের অধিকাংশই আবার মুসলমান। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের মানবতাবাদী মুক্ত-উদার সত্ত্বার চিন্তা এ বৃহৎ সমষ্টির উন্নয়ন ও বিকাশের ভাবনায় তাড়িত হয়েছেন এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানরা তাদের সাড়ে পাঁচশত বছরের রাজ্য হারিয়ে অনেকটাই দিকভ্রান্ত এবং এ শতকের শেষার্ধ থেকে শুরু হওয়া কৃষক আন্দোলনের পথ ধরে মুসলমানরা তাদের হৃত রাজ্য হারানোর তথা অতীত গৌরব ফিরে পাওয়ার আকুলতা বারবার প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আদলে– যেমন ধর্মীয় আন্দোলনে, কখনও ভূমিতে অধিকার হরণের প্রতিবাদস্বরূপ, আবার কখনও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির দোসর হিসেবে আবির্ভূত ভূমি আশ্রিত নতুন পূঁজিবাদী শ্রেণির অন্যায়-অন্যায্য শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে।

উনিশ শতকের আধুনিক ভারতের তথা বাংলার মুসলমানদের চিন্তার বিকাশে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও তাদের বিভিন্ন সংগঠন পটভূমি তৈরি করেছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে মুসলিম চিন্তকদের দর্শন ও কার্যক্রম অনন্য-অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল উনিশ শতকের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিনির্মানে। মুসলমানদেও চৈতন্যে মুসলিম চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও সরকারি চাকুরিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এ বিবর্তনে কখনও আপস করেছেন, কখনও তোষণ করেছেন, কখনও মুসলমান সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির জবাব দিয়েছেন, কখনওবা মুসলমানদের দাবী-দাওয়া পূরণের মধ্য দিয়ে তাদের উন্নয়নের মাধ্যমে রাজনীতির মূলধারায় নিয়ে আসতে মুসলিম চিন্তকরা পর্যায়ক্রমিকভাবে কাজ করেছেন।

প্রথম দিকে প্রায় একশ বছর মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে বিরত থাকে। ইংরেজ শাসনের অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে বাংলার মুসলমানরা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। মুসলিম চিন্তাবিদরা বুঝতে পেরেছিলেন এতে করে তাদের লাভের থেকে ক্ষতি বেশি হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা খুব বেশি সফল হতে পারেনি। এর

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে সংগঠিত ফরায়েজী আন্দোলন। শরীয়তুল্লাহর জীবদ্দশায় এ আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া এ আন্দোলনকে আরো গতিশীল ও দুর্বার করে তোলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে। ফরায়েজী আন্দোলনের গণভিত্তির কারণেই তা অব্যাহত থাকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এ আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের ধর্মনৈতিক, আর্থ-রাজনৈতিক চিন্তার রূপান্তরে কিছুটা হলেও সচেতনতাবোধ জাগ্রত করেহয়েছিল। সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর ধর্মীয় ও সীমিত সামরিক নেতৃত্ব মুসলমান সমাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে কিন্তু সর্বভারতীয় দীর্ঘস্থায়ী কোনো কার্যকারী ও সময়োপযোগী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। তার আন্দোলনই বাংলায় 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' নামে পরিচিত। ইসলামি চেতনাবোধের কারণে অনেকে একে মুজাহিদীন আন্দোলনও বলে থাকেন।

তিতুমীর মক্কায় হজ্জ পালন করতে গিয়ে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিতুমীরের আন্দোলনকে প্রকারান্তরে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের প্রশাখা মনে করা হয়। তিনি ১৮২৭ খ্রি. সৈয়দ আহমেদ শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বাংলায় ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন যা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে এবং কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হয়। তিতুমীরের আন্দোলন প্রথমে ধর্মীর সংস্কার নির্ভর হলেও পরবর্তীতে এর ধর্মীয় চরিত্র বিলুপ্ত হয়ে রাজনৈতিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পুনশ্চঃ উল্লেখ্য যে, বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। এ শতকে ইউরোপে নব নব চিন্তাধারা ও বিধি-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির মাধ্যমে এর ঢেউ বাংলাকেও আন্দোলিত করেছিল। ফলে বাঙলীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার জগতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময়ে বাঙলীর একাংশ নিজেদেরকে এক স্বতন্ত্র বাঙলী জাতি হিসেবে ভাবতে শুরু করে। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রগতিমনস্ক নেতৃত্বের অভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলী মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চিন্তা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছিল সুন্নি আদর্শে বিশ্বাসী। ইতিহাসবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, ঔপনিবেশ শাসন পূর্ব যুগে শিয়া মতাদর্শের অনুসারী নবাবদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনে সুন্নিদের অংশীদারিত্ব ক্রমশ হ্রাস করা হয়। নবাবগণ বহিরাগত শিয়া ও অবাঙলী মাড়োয়ারী হিন্দুদের সাহায্যে সরকার পরিচালনার নীতি গ্রহণ করায় বাঙলী মুসলমানরা ক্রমশ সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক সচেতনতাও হারিয়ে ফেলেন। বাংলায় রাজপৃষ্ঠপোষকতায় যে বহিরাগত অবাঙলী মুসলিম অভিজাত শ্রেণি গড়ে ওঠেছিল, ইংরেজ শাসনের অভিঘাতে তাঁরাও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম সমাজের নেতৃত্বে এক ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়। ফলে বাংলায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয়

ভাবধারাপুষ্ট যে নতুন ধারার চিন্তার উদয় হয়, হিন্দু সমাজ এর মমার্থ উপলব্ধি করে এর সাথে যুক্ত হলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম সমাজ সে চিন্তাধারা আত্মস্থ করতে অনেকখানি ব্যর্থ হয়।

এক দিকে পুরনো অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয়, অন্যদিকে উনিশ শতকের নতুন বাস্তবতার উপযোগী নতুন নেতৃত্ব বিকশিত না হওয়ায় বাঙলী মুসলিম সমাজের এ শূন্যতা পূরণ করেন সাধারণ মানুষ থেকে উঠে আসা কতিপয় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এঁরা হলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ, দুদু মিয়া এবং মীর নিসার আলী তিতুমীর প্রমুখ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে তাঁরাই নেতৃত্ব দেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর ব্যক্তিত্ব ও মহৎ চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্থ বাঙলী মুসলমানরা তাঁর দলে যোগ দেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ ছিল না। তবে তিনি স্বজাতীয় মুসলমানদের কোম্পানি সরকারের সহযোগী ও দোসর নব্য জমিদারদের নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নব্য জমিদারগণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন বহু অতিরিক্ত আবওয়াব (অবৈধ কর) কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়। হাজী শরীয়তউল্লাহ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং জমিদারদের এ সকল অবৈধ কর প্রদান না করার জন্য তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দেন। শুধু অত্যাচারী জমিদার নয়, ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন সম্পর্কেও হাজী শরীয়তউল্লাহর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। তিনি বাংলায় ব্রিটিশ শাসনকে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতেন। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহও এ দেশকে "দারুল হরব" বলে ঘোষণা করেন। হানাফি আইনের অনুসরণে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বাংলায় যতদিন বৈধভাবে নিযুক্ত একজন মুসলিম শাসক দায়িত্ব গ্রহণ না করবেন অর্থাৎ এ দেশ "দারুল ইসলাম" না শরীয়তউল্লাহর প্রচারিত সাম্যর মতাদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলার মুসলিম প্রজাসাধারণ এক মহাপরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করলে আতঙ্কগ্রস্থ জমিদাররা নানা অজুহাতে তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন শুরু করেন। কোম্পানি সরকারও তাঁদের সাথে যোগ দেয়। শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলাসহ নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে শরীয়তউল্লাহর প্রচেষ্টা মুসলিম মানস জগতে নাড়া দেয়।

হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহসিনউদ্দিন দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন আরো ব্যাপক ও সংগঠিত রূপ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, হাজী শরীয়তউল্লাহর জীবদ্দশায় পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মুখ্যত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের প্ররোচনার কারণে দু'একটি সংঘর্ষ ব্যতীত কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনে কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়নি। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে আন্দোলনে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে হলেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গও যুক্ত হয়। শুধু ধর্মীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন নয়, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় খ্রিস্টান নীলকরদের নির্যাতনের হাত থেকে মুসলিম কৃষক প্রজাসাধারণকে রক্ষার জন্য দুদু মিয়া তাঁর সর্বশক্তি নিযুক্ত করেছিলেন। পিতার আর্থ-সামাজিক নীতি অনুসরণ করে দুদু মিয়া মানব কল্যাণে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দেন

এবং শ্রমের ওপর জমির মালিকানা নিহিত এ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি অত্যাচারী জমিদারদের খাজনা প্রদান না করতে কৃষকদের উৎসাহিত করেন। দুদু মিয়ার এ ঘোষণা নির্যাতিত কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের কৃষকরা ফরায়েজি আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর চারপাশে ভিড় জমাতে থাকে। দুদু মিয়ার তৎপরতায় ফরায়েজিগণ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে ওঠেন এবং অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেন। ফলে জমিদার ও নীলকরদের সাথে ফরায়েজিদের সংঘাত শুরু হয়। ১৮৬২ সালে দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গাজীউদ্দিন হায়দর (১৮৬২-৬৪ খ্রি.), আবদুল গফুর নয়া মিয়া (১৮৬৪-৮৩ খ্রি.) এবং সইদউদ্দিন আহমদ (১৮৮৩-১৯০৬ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের সময় এ আন্দোলনের গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে পড়ে। তবে তা মুসলিম চিন্তাধারার রূপান্তরে আরও একধাপ অগ্রগতি হয়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ যখন বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাঁর সমকালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী উত্তর ভারতে তরিকায়ে মুহাম্মদী নামক এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনটি শুরু হলেও পরে এটি জিহাদি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সৈয়দ আহমদ বেরলভী অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক এবং তাঁদের এ দেশীয় দোসরদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে জিহাদের ডাক দেন। মুসলিম সমাজে বিশুদ্ধ ধর্মীয় রীতিনীতির পুনঃপ্রবর্তন এ আন্দোলন দু'টির লক্ষ্য ছিল সত্য, তবে ফরায়েজিগণ ওয়াহাবিদের মতো বিপদজ্জনক জিহাদি চিন্তা পোষণ করতেন না। এদেশ থেকে কোম্পানি শাসন উৎখাতে তাঁদের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিও ছিল না। বস্তুত এটি ছিল জমিদার, নীলকর ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার কৃষকদের শ্রেণি সংগ্রাম। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকররা নিজেদের স্বার্থে ফরায়েজিদের একটি বিপদজ্জনক সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহ যখন পূর্ব বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন সে সময়ই পশ্চিম বাংলায় আরেকটি আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.)। পশ্চিম বাংলার বারাসত জেলার অধিবাসী কৃষক পরিবারের সন্তান তিতুমীর জীবনের এক পর্যায়ে মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি নিজ এলাকায় এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আন্দোলনেরও লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার। কিন্তু অচিরেই তাঁর কর্মপ্রয়াস বাংলার প্রজাকুলের উপর স্থানীয় জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ নিয়ে স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের সাথে তাঁর বিরোধ ও সংঘাত শুরু হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিতুমীর এক মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন এবং তাঁর অনুসারী ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুমকে এ বাহিনীর অধিনায়ক করা হয়। তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে জমিদারগণ তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোম্পানি সরকারকে

সম্পৃক্ত করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারকেলবাড়িয়ায় এক দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর তিতুমীর নিজেকে "বাদশাহ্" বলে ঘোষণা দেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদারদের নিকট রাজস্ব দাবি করেন। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বেই গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নির্দেশে লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর তিতুমীরের মুজাহিদদের উপর আক্রমণ চালায় এবং সহজেই তাদের পরাজিত করে। তবে এ আন্দোলন রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে এবং মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়রোধ প্রয়াসের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধ তৎপরতায় পর্যবসিত হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারাপুষ্ট আধুনিক চিন্তাধারা দেখা যায় না। এসময় তাদের রাজনৈতিক চিন্তায় মূলত ধর্মভিত্তিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এসময় মুসলমানদের চিন্তা ছিল বিশেষভাবে আঞ্চলিক, সম্প্রদায়গত ও পেশাভিত্তিক। এসব চিন্তার নেতৃত্ব দেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সমাজ। তাঁদের চিন্তার মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আকুতি ছিল প্রধান। তবে এতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা যুক্ত হওয়ায় এসব চিন্তা মিশ্ররূপ ধারণ করে। এসব চিন্তার ধর্মীয় পুনর্জাগরণ প্রয়াস মুখ্য হওয়ায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্যান ইসলামিজমের ধারণার বীজ বপিত হয়। ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তাতে জিহাদি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির উৎখাত করাকে তাঁদের কেউ কেউ ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতাকে যাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য বলে এ ধারায় মুসলমান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের এ চিন্তা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত ছিল বলে মানা যায় না। কারণ ভারতে কোম্পানি সরকার তখন একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি। এ শক্তিকে বল প্রয়োগে বিতাড়িত করার সামর্থ্য তখন এদেশীয় মুসলমানদের ছিল না। তাই তাদের উচিত ছিল ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাসমূহ গ্রহণ করে প্রথমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা এবং এরপর নিজেদের সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু তাঁরা এটি করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত এ সময় যাঁরা মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেন যুগ বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। চিন্তাধারায় তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল এবং অনেকাংশে পশ্চাদমুখী।

উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম সমাজ যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তাঁদের করণীয় নির্ধারণে অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও হিন্দু সমাজে তা হয়নি। তাঁরা ব্রিটিশদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শুরু থেকে তৎপর ছিল। এজন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে তাদের উৎখাতের জন্য যখন জিহাদি তৎপরতায় লিপ্ত, তখন হিন্দুরা ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে

সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। কোম্পানি সরকার প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার ও আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রি.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এ তৎপরতা দেখা যায়। স্বসমাজের প্রতি ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদ তাঁরা করেছেন, তবে তা কোনো সোচ্চার প্রতিবাদ বা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই তাঁরা বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকাসহ কিছু সংবাদ মাধ্যমের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই উচ্চশিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙলী মুসলিম সমাজে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়নি।

ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহাম্মদী বা তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলিম মানসে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ একে আরো প্রবল করে তোলে। ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় এটি ছিল এক বিরাট প্রতিরোধ সংগ্রাম বা গণ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের উপক্রম হয়। কিন্তু নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ সফল হয়নি। সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে এ বিদ্রোহ দমন করে। তবে এ বিদ্রোহের সূত্র ধরে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হয় এবং ব্রিটিশ রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় যোগদান করলেও সরকার এর জন্য মুখ্যত মুসলমানদের দায়ী করে। সরকার বিদ্রোহের সার্বিক দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে তাদের উপর নানা ধরনের উৎপীড়ন ও চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে থাকে। এমনিতেই ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুর্দশার কারণ হয়েছিল; নবতর পরিস্থিতিতে এ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও তৎপরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের উপর সরকারি আক্রোশ ইত্যাদির ফলে মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ নেতৃত্ব ছিল নগরবাসী ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভকারী উদার মনোভাবাপন্ন। উপরে বর্ণিত মুসলিম সমাজের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, এতদিন মুসলিম সমাজের যে অংশটি জিহাদের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের স্বপ্নে বিভোর ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে তাঁদের সে স্বপ্নেরও সমাধি রচিত হয়েছিল। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের নতুন নেতৃত্ব জিহাদি তৎপরতা পরিহার করে নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা ব্রিটিশ মানস থেকে মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অনাস্থা ও সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণেও প্রয়াসী হন। আর ব্রিটিশ সরকারও নতুন অনুগত মুসলমান নেতাদের সহযোগিতার মনোভাবকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত বাস্তবতায় যে সব মুসলিম নেতা মুসলমান সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও রূপান্তরে প্রয়াস নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন– মৌলবি আবদুর রউফ, নবাব আবদুল লতিফ (১৯২৮-৯৩ খ্রি.), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮খ্রি.) প্রমুখ। তাঁরা সকলেই ব্রিটিশ অনুগত ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। মৌলবি আবদুর রউফ ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগের অধ্যাপক এবং *দূরবীন* পত্রিকার সম্পাদক। প্রধানত তাঁর উদ্যোগ এবং কলকাতা আদালতের কাজী-উল-কুজ্জত ফজলুর রহমান ও মুহম্মদ মজহার প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী মুসলিম নেতার প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালের ৮ মে কলকাতায় আঞ্জুমান-ই-ইসলামি নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। এটি ছিল মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন। তবে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ‘British Indian Association’ এ কয়েকজন মুসলিম নেতা সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে আঞ্জুমান-ই-ইসলামি নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বিধান ও তাদের কল্যাণ সাধন করা, কোম্পানি সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপন, ইসলাম ধর্মের উৎকর্ষ সাধন ও প্রচারে সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। মুসলিম সমাজ তাদের দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের কাছে বিধিসম্মত উপায়ে আবেদন করবে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবে এটি ছিল এ সংগঠনের মূল নীতি। সংগঠনটির মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক ফারসি পত্রিকা *দূরবীন*। এটি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে মুসলিম জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিল।

উনিশ শতকে শেষপাদে বঙ্গ-ভারতীয় চিন্তায় উপর্যুক্ত পটভূমিকায় বাঙলী মুসলিম সমাজে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ১৮৮১ সালে প্যান ইসলামিজমের প্রবক্তা সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানির (১৮৩৮-৯৭ খ্রি.) কলকাতা সফরের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে বিশ্ব মুসলিমবাদের ধারণা শক্তিশালী হয়। এ সময় মুসলিম সম্পাদিত *আখবারে এসলামীয়া*, *ইসলাম*, *আহমদী*, *সুধাকর*, *ইসলাম প্রচারক*, *মিহির ও সুধাকর এবং নূর আল ইমান* ইত্যাদি সংবাদপত্র ও সাময়িকী মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য সময়ে মুসলিম সমাজে একদল সাহিত্যসেবীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে মুনশী মহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭ খ্রি.), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১ খ্রি.), পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১১ খ্রি.), মুনশী শেখ জমিরুদ্দিন (১৮৬৭-১৯৩৭ খ্রি.), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.), মুহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমেদ (১৮৬২-১৯৩৩ খ্রি.) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। তাঁরা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রি.), ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খ্রি.), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খ্রি.), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭ খ্রি.) প্রমুখ হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষী লেখনীর বিপরীতে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে মুসলিম সমাজে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা ক্রমান্বয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠেন। তবে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মীর মশাররফ

হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খ্রি.), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খ্রি), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১ খ্রি.) প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নেন। এ প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন দেলোয়ার হোসেন আহমেদ (১৮৪০-১৯১৩ খ্রি.)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট দেলোয়ার হোসেন আহমেদ ছিলেন পুরোপুরি যুক্তিবাদী একজন মানুষ। তিনি বাংলার মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী যুক্তিবাদী ও আমূল সংস্কারবাদী ধারার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী দেলোয়ার হোসেন মনে করতেন রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে একত্র করার ফলে মুসলিম সমাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম সমাজের চিন্তার অভাবে মুসলমানরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি। তাই মুসলমানদের স্বার্থে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় তাদের অধিকতর চেষ্টা করা উচিত। তবে তাঁর অগ্রগামী চিন্তাধারা সমকালীন রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ফলে বিশ শতকের সূচনালগ্নে মুসলিম চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল আকার ধারণ করে। যার পরিণতি ১৯০৬ সালের সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। মুসলিম সমাজে রক্ষণশীল ধারার প্রাধান্য মুসলমানদের চিন্তায় স্বাতন্ত্র্যচেতনার পিছনে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই; তবে এর পিছনে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সামাজিক আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ স্বার্থবাদী মনোভাব মুসলিম সমাজের মনে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার মুসলিম চিন্তাধারায় নানা রূপান্তর ঘটে। বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এ রূপান্তর ধারার তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ধারাটি হলো ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী। বস্তুত বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা এবং কোম্পানি সরকারের গৃহীত আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক নীতির ফলে তৎকালীন মুসলিম অভিজাত শ্রেণির পতন ঘটে। ক্ষয়িষ্ণু এ অভিজাত শ্রেণি উনিশ শতকের শুরুতে নবতর পরিস্থিতে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলিম রাজনৈতিক অঙ্গনে যে নেতৃত্ব শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণে সাধারণ মানুষ থেকে ধর্মাশ্রয়ী নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। হাজী শরীয়তউল্লাহ, দুদু মিয়া, মীর নিসার আলী তিতুমীর ছিলেন এ ধারারই প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল না এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনো আগ্রহও ছিল না। চিন্তাধারায় তাঁরা ছিলেন পশ্চাদমুখী। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের মধ্যেই তাঁরা মুসলিম সমাজের মুক্তি ও উন্নতির চিন্তা করেছেন। ক্রমান্বয়ে তাঁদের কর্মকাণ্ডে কিছু আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি যুক্ত হলেও ব্রিটিশ বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা কম ছিল। ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তাতে কিছুটা জিহাদি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রবণতা মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছিল। ফলে তারা ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমশ একটি চরম দুর্দশাগ্রস্থ জাতিতে পরিণত হয়।

বাংলার মুসলিম সমাজের উপর্যুক্ত হতাশাজনক পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজে নগরবাসী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদার মনোভাপন্ন এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ নতুন নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতা পরিহার এবং সরকারের সাথে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে শুরুতে মতভিন্নতা থাকলেও সৈয়দ আমীর আলী এ বিষয়ে অনেককে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। ফলে বাঙলী মুসলমান সমাজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় এক দশক পূর্বে তাদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হয়। তবে এ রাজনৈতিক সংগঠনটির মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক তৎপরতা দেখা যায় না। বরং মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটি আবেদন নিবেদনের চিন্তা করে। আর এটিই ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম চিন্তার মূলধারা।

উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে মুসলিম চিন্তনে এসে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও বিশ্ব মুসলিমবাদের প্রভাব প্রকটভাবে দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, বাস্তব কারণে দেরিতে হলেও মুসলমানরা যুগ বাস্তবতা উপলব্ধি করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সরকারের প্রদত্ত সুবিধাগুলো গ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন। ফল হিসেবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজে একটি আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। রাজনীতি, পেশাগত ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠা লাভে এ শ্রেণিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ সময় অদ্ভুত ও বিকৃত আচরণ নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশকে বিক্ষুব্ধ ও জাত্যাভিমানী করে তোলে। এ অবস্থায় উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ দেখা দিলে হিন্দু সমাজে মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের একটি বড় অংশ হিন্দু বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় প্যান ইসলামিজম ভাবধারায়ও তাঁদের অনেকে অনুপ্রাণিত হন। ফলে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ঘটে। এতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে অবনতি ঘটে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়। হিন্দু-মুসলিম এ বিভাজনের পিছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিরও সচেতন প্রয়াস ছিল। বস্তুত তাদের চিরাচরিত 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে তারা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজেদের নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলায় নবাবী শাসনের অবসান এবং ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এদেশে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠা কেবল রাজক্ষমতা ও রাজত্বের হাত বদল ছিল না। কোম্পানি শাসনের সাথে এদেশে আসতে শুরু করেছিল পাশ্চাত্য দুনিয়ার নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবধারা। এর মধ্যে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। দেখা যায় যে, ক্ষমতাহারা

মুসলিম সমাজ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নানারূপ ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়। যোগ্য নেতৃত্ব ও সংগঠনহীন মুসলমানরা তাদের সমকালীন সংকট ও চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। অনেকেই মুসলমানদের পশ্চাদমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও গৌরবময় অতীত প্রীতিকে এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। তবে উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে এ মত সর্বাংশে সত্য নয়। কিছুটা জাত্যাভিমান এবং সংস্কারবশে তারা কোম্পানি সরকারের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও ভাবধারার সাথে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে খাপ খাওয়াতে পারে নি সত্য। তবে একথা আরো অনেক বেশি সত্য যে, সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের কাছে টানার এবং তাদের প্রবর্তিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা বা সুযোগ দেয়া হয়নি। মুসলমান সমাজের অগ্রগতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিয়ে ভারত সরকার প্রায়ই আলোচনা করলেও ১৮৭১ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি। তৎকালে মুসলমানদের আয়ের প্রধান উৎস সামরিক বাহিনী ও রাজস্ব প্রশাসন থেকে তাদের বিতাড়িত করে কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়। ফলে ইচ্ছে থাকলেও ইংরেজ প্রবর্তিত ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর নতুন শিক্ষা গ্রহণ না করায় রাজভাষা পরিবর্তন এবং সরকারি চাকুরি প্রাপ্তিতে ইংরেজি শিক্ষাই যখন একমাত্র যোগ্যতা নির্ধারণ করা হলো তখন বিচার প্রশাসন বা অন্য কোনো চাকুরিতে তাদের আর প্রবেশাধিকরই থাকলো না। অন্যদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে দ্রুত মানিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হিন্দু সমাজ ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে হিন্দু সমাজ বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, চাকরি, শিক্ষাসহ সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। কোম্পানি শাসনের বহুমুখী অভিঘাত ও ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাংলায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই যে নব্য ভাবধারাপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবিভাব ঘটে, হিন্দুরাই এর পুরোধা ছিলেন। আর এ শ্রেণিটিই বৃত্তাবদ্ধ হিন্দু সমাজে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটান। অন্যদিকে নিজেদের সংকীর্ণতাই হোক বা শাসকগোষ্ঠীর অপকৌশলের শিকারে পরিণত হয়েই হোক, বাংলার মুসলমানরা পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা এবং ভাবধারার সাথে আপোস করতে না পারায় তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্ম নেয়। অবশ্য ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং এর মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসানের পর বাংলার মুসলমানদের মনোজগতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ রাজ সরকারও মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষী মনোভাব পরিবর্তন করতে শুরু করেন। ফলে মুসলমান সমাজে নবযাত্রা সূচিত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে মুসলিম সমাজ সেই পথে এগোতে শুরু করে। ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা-চেতনায় নতুন রূপান্তরের সূচনা হয়।

পরিশিষ্ট-১

মানচিত্রে বাংলা

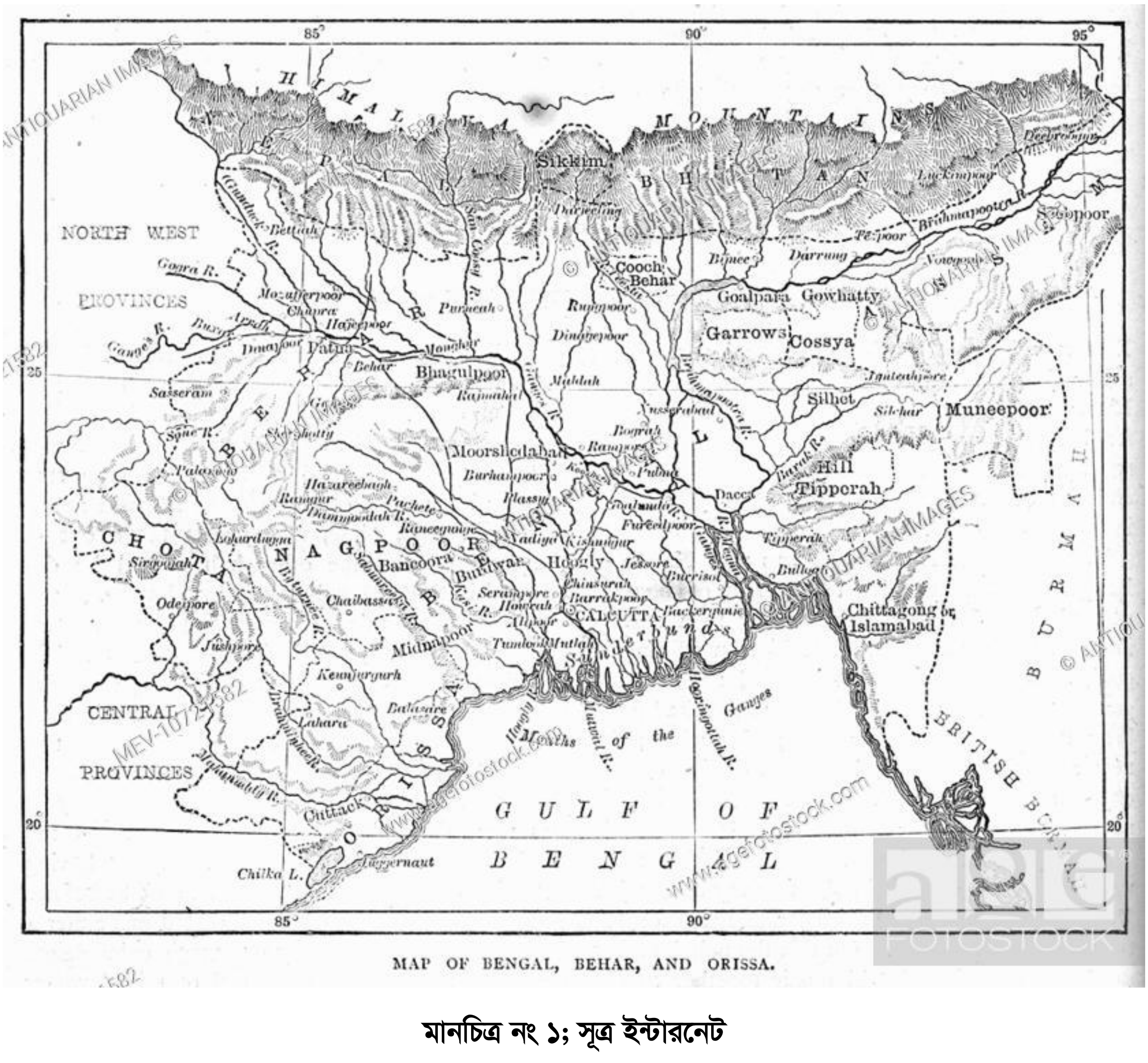

MAP OF BENGAL, BEHAR, AND ORISSA.

মানচিত্র নং ১; সূত্র ইন্টারনেট

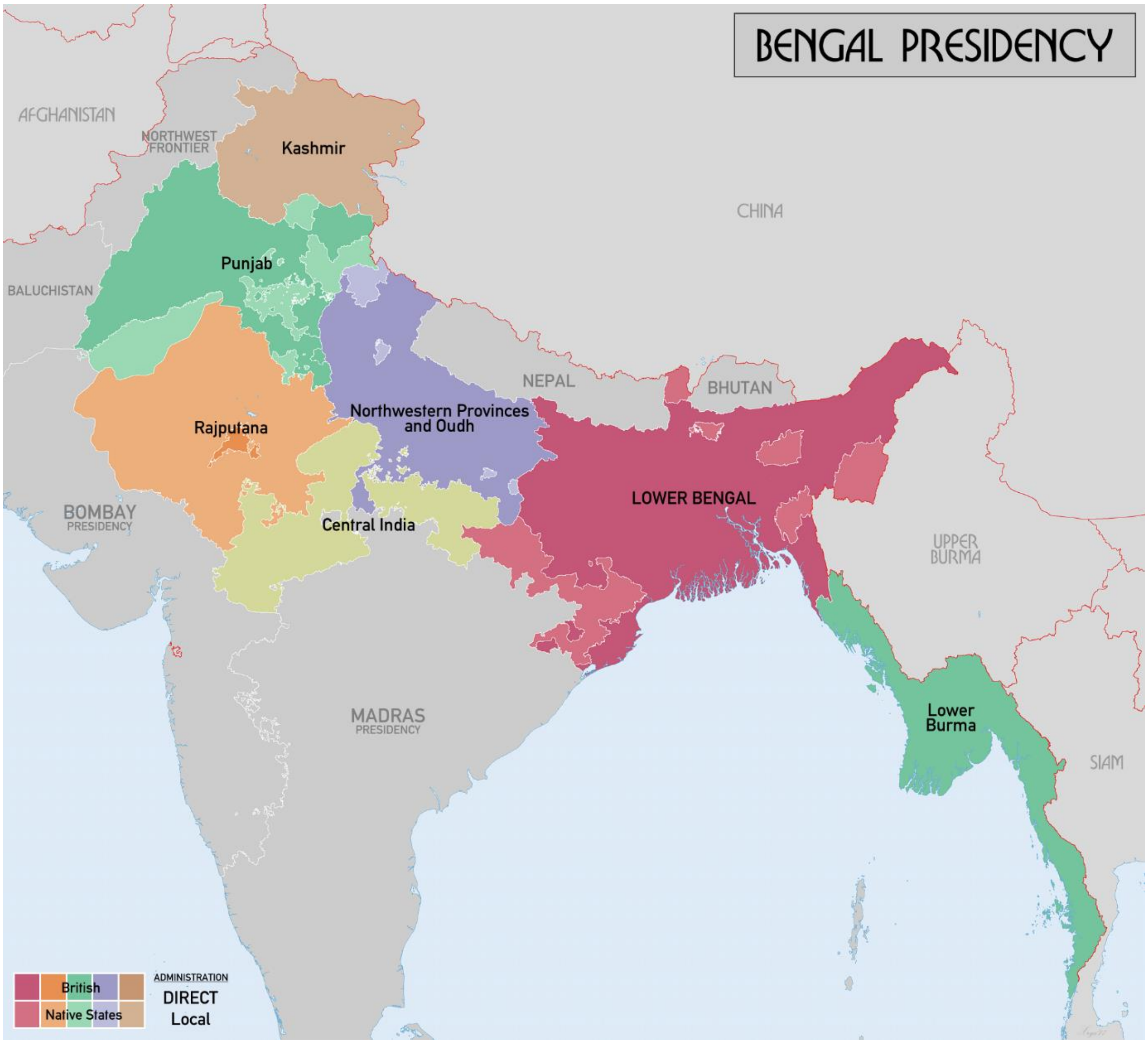

মানচিত্র নং ২; সূত্র ইন্টারনেট

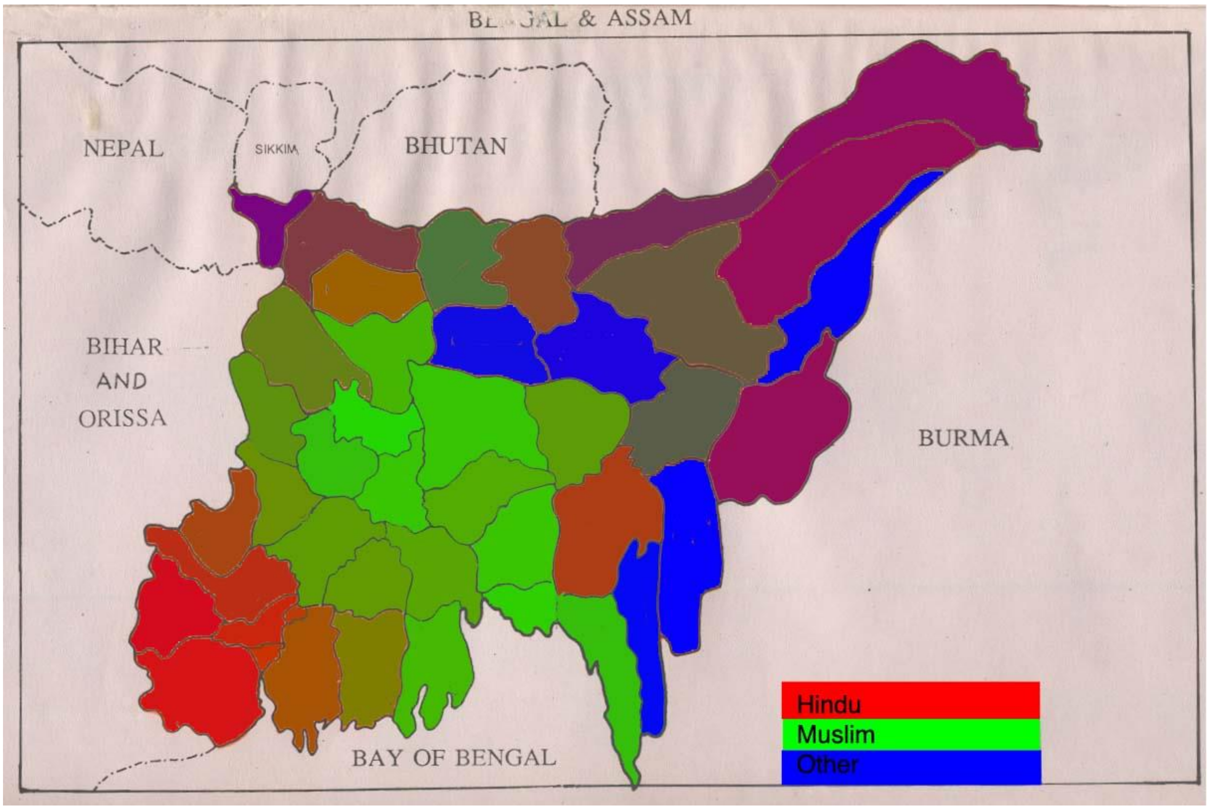

মানচিত্র নং ৩; সূত্র ইন্টারনেট

মানচিত্র নং ৪; সূত্র ইন্টারনেট

পরিশিষ্ট - ২

রাজা রামমোহর রায় (২২ মে, ১৭৭২- ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)

হেনরি লুই ডিরোজিও (১৮ এপ্রিল ১৮০৯- ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১)

লর্ড থমাস বেবিংটন মেকলে (২৫ অক্টোবর ১৮০০- ২৮ ডিসেম্বর ১৮৫৯)

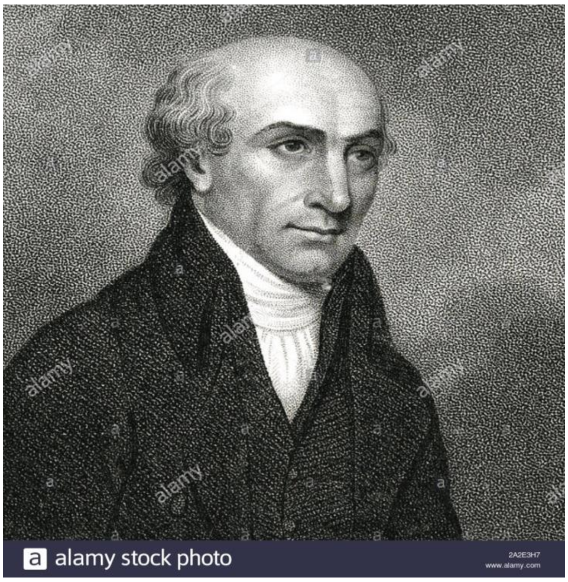

উইলিয়ারম কেরি (১৭ অগাস্ট ১৭৬২- ৯ জুন ১৮৩৪)

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)

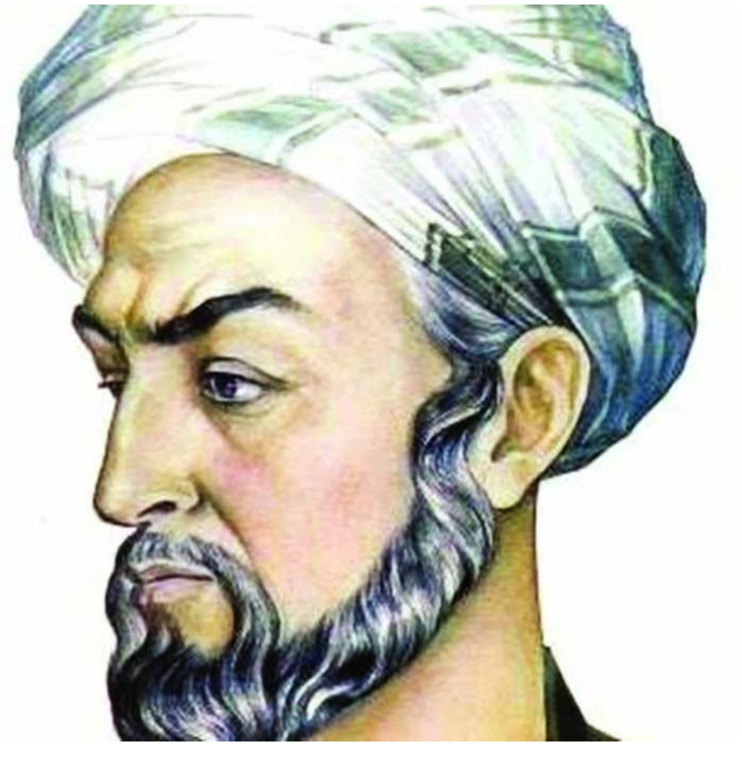

সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর (২৭ জানুয়ারি ১৭৮২- ১৯ নভেম্বর ১৮৩১)

নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

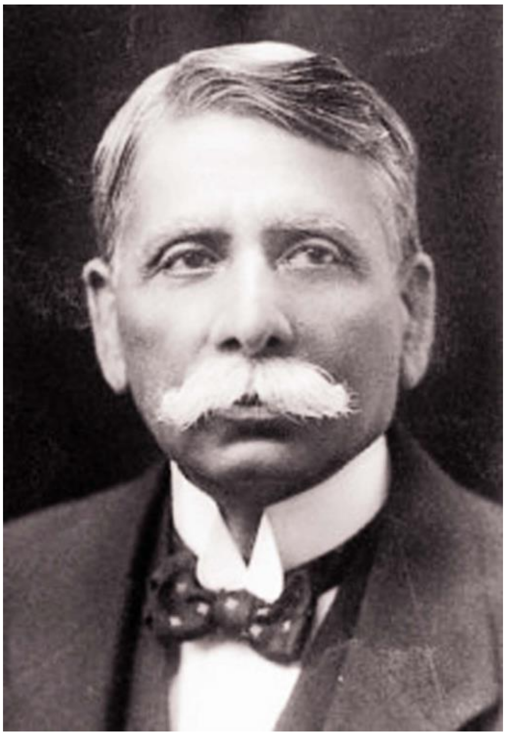

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (২১ ফেব্রুয়ারি ১৭০৩- ২০ অগাস্ট ১৭৬২)

সৈয়দ আহমদ বেরলভী (১৭৮৬-১৮৩১)

Sayyid Ahmad Khan

সৈয়দ আহমদ খান (১৭ অক্টবর ১৮১৭- ২৭ মার্চ ১৮৯৮)

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৩- ১৭ এপ্রিল ১৯২৯)

Sir Abdur Rahim, Kt., M.A.

স্যার আব্দুর রহিম (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭- ১৯৫২)

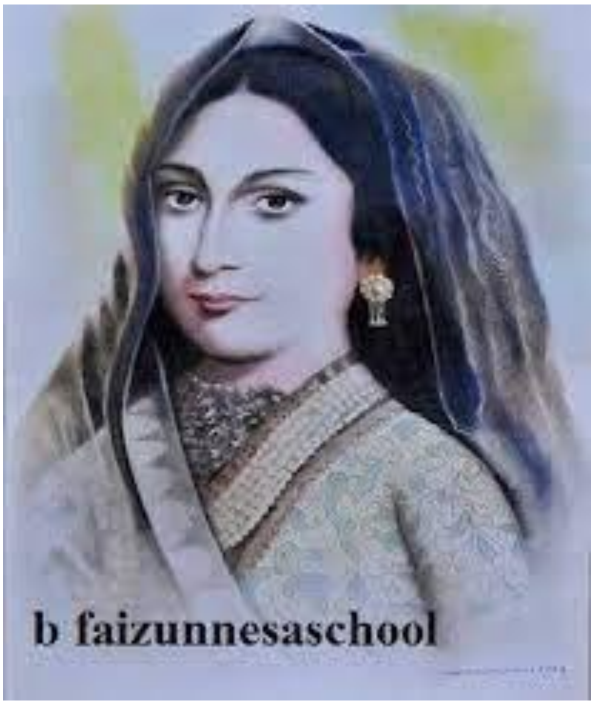

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩)

ছবি সূত্রঃ ইন্টারনেট

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক সূত্র

গ্রন্থসমূহ: প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত

সোবহান, আবদোস। *হিন্দু-মোসলেম*, (কলকাতা, ১৮৮৮)।

হোসেন, মোঃ কামাল। *ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা*, (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

ইসলাম, মোঃ জহুরুল। *মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ : তাঁর জীবন ও কর্ম*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)।

বসু, রাজ নারায়ণ। *হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত*, (কলিকাতা, ১৮৭৬)।

Lateef, Abdool. “A Short Account of my Humble Efforts to Promote Education, Specially Among the Mahomedans”, (Calcutta, 1885).

Nazmul, Abdul Khair. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal* (Unpublished Doctoral Thesis), (University of London, 1964).

Karim, Abdul. *Muhammadan Education in Bengal,* (Calcutta, 1900).

Hossain, A. S. *A Pamphlet on Mahomedan Education in Bengali,* (1880).

Ahmed, Delawar Hosain. *The Future of the Mohammedan of Bengal* (1980), *Essays on Mohammedan Social Reform* (1889), *Mohammedan Law of Inheritance* (1896).

Firminger (ed.), *Grants Analysis in Fifth Report*, 1812, (Calcutta, 1917).

F. Bermier (V.A. Smith ed.), *Travels in Mughal Empire, 1656-68,* (London, 1894).

Rubbee, Khandker Fuzli. *The origin of the Musalman of Bengal,* (Calcutta,1895).

Smith, George. *The Life of Alexander Duff*, vol. I, (London, 1879).

Khan, Golam Hussain. *Seir-I-Mutakherin,* (1926).

Graham, G. F. I. *Life & Works of Sayed Ahmed Khan,* (London, 1885).

Trevelyan, G. O. (ed.). *Life and letters of Lord Macaulay*, 1908

Beveridge, H. *The District of Bakergonj its History and statistics*, London, 1876).

Chatt, H. J. S. *Revenue History of Chittagong*, 1880.

Risly, H. H. *Tribles and Castes of Bengal*, Vol. I, (Calcutta, 1891).

Cotton, H. J. S. *India in Transition*, (London, 1885).

Marshman, J. C. *Life and Time of Carcy*, vol. 11, Marshman and ward, (London, 1859).

Long, J. *Adam's First Report on the state of Education in Bengal*, 1835.

Taylor, James. *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, (Calcutta, 1840).

Phipps, John. *A Series of the Principal Products of Bengal*, No. 1 Indigo, (Calcutta, 1832).

Law, N. N. *Promotion of Learniong in India by Early European Settelers,* (Longman, 1915).

Sinha, Pradip. *Ninteenth Century: Aspect of Social History*, (Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1965).

Sen, Ramcomul. *English-Bengali Dictionary,* (Calcutta, 1834).

Rev. Lal Behari Day, *Recollections of Alexander Duff,* (London, 1879).

Long, Rev. J. *The Social Condition of the Muhammadan of Bengal and the Remedies in Transaction*, vol. III, part- I, (1869).

Duff, Rev. Alexander. *India and India Missions*, (Edinburgh, 1840).

Khan, Sir Sayed Ahmed. *The Present State of Indian Politics*, (Allahabad, 1888).

Mahmood, Syed. *A History of English Education in India* (1781-1893), (MAO College, Aligarh, 1895).

Choedhury, Syed Nawab Ali. *Vernacular Education in Bengal,* (Calcutta, 1900).

Blunt, Wilfred Schwen. *India Under Ripon*, A Private Diary, (London, 1909).

Adam, William. *Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1834)*, edited by Anath Basu, Nath. (Calcutta University, 1941).

Firminger, W. K. *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report*, (Calcutta 1917).

Blunt, W. S. *India Under Ripon,* (London, 1909).

Huter, W. W. *England's Work in India,* (Madraj, 1888).

Hunter, W. W. *The Indian Mussalman,* (London, 1871).

Kaningham, Z. D. *A History of the Shiks,* (Calcutta, 1903).

পত্রিকাসমূহ (বাংলা ও ইংরেজি)

অনুশীলন (আশ্বিন, ১৩৭২)।

আল এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১১-১২শ সংখ্যা, ১৩২৫।

আল হক্, ১ম বর্ষ, বর্ষা সংখ্যা, ১৩২৬।

ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮।

ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ ১২৯৯।

ইসলাম-প্রাচারক, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৮।

যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)*, (কলিকাতা, ১৩৫৬) ।

ইসলাম প্রচারক, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১২৯৯ (বঙ্গাব্দ)।

ইসলাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

নবনূর, ভাদ্র ১৩১১ (বঙ্গাব্দ) ।

নূর-অল ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭।

ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জৈষ্ঠ, ১২৯৭।

বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯ (বঙ্গাব্দ)।

বঙ্গদূত, ১৩ই জুন ১৮২৯।

ভারতী, শ্রাবণ, ১৩১০।

মাসিক মোহাম্মদী ,কার্তিক,১৩৩৪(বঙ্গাব্দ)

মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ (বঙ্গাব্দ)।

মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪।

মিহির ও সুধাকর, ২৫ আশ্বিন ১৩০৮।

মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ়-পৌষ ১৩০৯

মিহির ও সুধাকর, ১৪ আশ্বিন ১৩১১।

সংবাদ প্রভাকর, ৩ আষাঢ় ১২৫৫।

সংবাদ প্রভাকর ,১৮৫৫।

সুধাকর, ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৬।

সোমপ্রকাশ, ১৬ চৈত্র ১২৭০।

সোমপ্রকাশ, ২৬ চৈত্র ১২৯০।

সোম প্রকাশ ,১৮৮২।

রওশন হেদায়েৎ, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩২।

হানাফী, ১৩৪৪-এর ভলিউম-১২, নং ১৭

হাফেজ, জানুয়ারি ১৮৯৭

Calcutta Christian observer, June, 1832.

Calcutta Review, Part I, 1844.

Quarterly Civil List (Bengal), 1881.

Quinquennial Review of Education in India, 1831-93 to 1896-97.

The Calcutta Review, vol. IXXII, NO CXLIV, 1881.

The Moslem Chronicle, 22 August 1895.

The Moslem Chronicle, 23 may 1896 (supplementary).

The Moslem Chronicle, 30 January 1904.

The Moslem Chronicle, 13 January 1900.

The Moslem Chronicle, Calcutta, June 4, 1896.

প্রবন্ধসমূহ

হুসেন, আবুল। 'নিষেধের বিড়ম্বনা', *অভিযান*, (ভাদ্র, ১৩৩৩)।

চৌধুরী, আবদুল ওয়াজেদ খাঁন। 'ব্রিটিশ আমল ও মুসলিম সমাজ', *মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (পৌষ, ১৩৫৭)।

আহমদ, এম. আফতাবউদ্দীন। 'বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা', *ইসলাম প্রচারক*, (অগ্রহায়ণ, ১৩১১)।

হক, কাজী ইমদাদুল। 'ধর্ম এবং শিক্ষা', *নবনূর*, (ফাল্গুন, ১৩১১)।

সিন্ধী, মওলানা উবায়দুল্লাহ্। *শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক*, (লাহোর, ১৯৫২)।

আলী, মওলানা কেরামত। *কুওয়াত আল ঈমান*, (কলিকাতা, ১২৫৩ হিজরি./ ১৮৩৭ খ্রি.) ।

আলী, মাওলানা কেরামত। *মাকাশিফাত ই রাহমাত*, (কলিকাতা, ১৩৪৪ হিজরি)।

ইসলামবাদী, মনিরুজ্জমান। 'ইসলাম ও মিশন', *ইসলাম প্রচারক*, (আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০)।

ফজল, মির্জা আবুল। 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি', *নবনূর*, (শ্রাবণ ১৩১০)।

আজিজ, মীর্জা এম. এ. 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজুদীন', *মাসিক মোহাম্মদী*, চৈত্র ১৩৪০।

বিদ্যাবিনোদ, মোহাম্মদ আহ্‌বাব চৌধুরী। 'কালচারের লড়াই', *মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, (ভাদ্র, ১৩৭৭)।

চাঁদ, মোহাম্মদ কে। মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষায় অবনতির কারণ, *ইসলাম প্রচারক*, (ফাল্গুণ, ১৩১৩)।

উল্লাহ, মৌলভী আহসান। *'সাদ্দারদের প্রতি অবিচার'*, সাম্যবাদী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০০ (বঙ্গাব্দ)।

আযমী, মৌলানা নূর মোহাম্মদ। 'ইংরেজী শিক্ষা গোড়ার কথা', *মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) ।

উল্লাহ, মৌলভী মোহাম্মদ জশমত। 'আবদাল ও ওস্তাদশ্রেণীর কথা', *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০০ (বঙ্গাব্দ)।

সিরাজী, ইসমাই হোসেন। 'মোল্লাচিত্র', *ইসলাম প্রচারক*, (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০১)।

হোসেন, সৈয়দ ওয়াহেদ। 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি., (বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,কলিকাতা, ১১ নভেম্বর ১৯০৩/৪)।

করিম, শেখ ফজলল। 'ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার', *কোহিনুর*, (আষাঢ়, ১৩২১)।

রিপোর্ট, সেন্সাস ও গেজেটিয়ারসমূহ

Adam's First Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar, 1835.

Bengal Administration Report, 1872-73.

Bengal Education Proceedings, August 1872.

Bengal Education Proceedings, October, 1908.

Bengal Hurkaru, 10 December 1829.

Bengal Public Consultation, no. 5, 23 April 1823.

Bengal Secret Consultation, No. 11, 22 June 1795.

Calcutta University Commission Report, 1917-19, vol. 3, part.1.

Census Report of India, Vol. IV, 1891.

Census of India, vol. 1 1901.

Census of India, 1921.

Clive to Court, 29 September, 1765.

District Gazetteer, Pabna, 1923.

'Dufferin to Kimberly', *Dufferin Papers*, Vol. 19, No. 17, 29 (April 1886).

East India Gazetteer, (London, 1828).

First Report of the Calcutta School- Book Society, (Calcutta, 1818).

Gazette of India, 14 June 1873.

General Report on Public Instruction in Bengal, (1890-91).

"General Statement", *Census of Bengal*, (1872).

Sharp, H. *Selections from Educational Records*, part I, 1781-1839, (Calcutta, 1920).

Indian Education Proceedings, 6 March, 1882.

Indigo Papers, *Bengal Government Records*.

Judicial Proceedings, No. 123, 27.9.1855.

Johnston, J. *Abstract and Analysis of the Report of the Education Commission.*

long, James. ‘‘Calcutta in the olden times–Its Localities”, *Calcutta Review,* vol. XVIII, 1852.

Long, J. Adam. *Reports on Vernacular Education in Bengal & Bihar,* Submitted to Government in 1835, 1836, 1838, 1868.

Malley, L.S.S.O. *Bengal District Gazetteers, Jessore*, (Calcutta, 1912).

Garret, J.H.E. *Bengal District Gazetteers, Nadia*, (Calcutta, 1910).

Proceedings of West Bengal State Archives (WBSA), File No. 611906, Movement among the Wahabis.

Progress of Education in India, vol. I, 1902-7.

Report on the Census of Bengal, 1872.

Report on the Census of Bengal, 1881.

Report of the Education Commission, (1881, Calcutta).

Report of the Indian Education Commission, 1883.

Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861-1977).

Report from the select committee, 1781.

“Resolution of the Govt. of India”, 7 August, 1871, para-2, *India Education Proceedings*, (August, 1871).

. Heber, R. *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay*, 1824-25; With an account of a Journey to Madras and Southern India, (London, 1828).

Selection from the Records of the Govt. of India, Home Dept. (Calcutta, 1886).

*Sel. from Records of Bengal Governmen*t, “Appendices no. V”*,* vol. 14.

Sir E. Rayan to Lord William Bentinck, 29 January, 1832, Bentinck Papers.

Thomson, W. H. *Census Report of Bengal*, 1921.

Hunter, W. W. (ed.). *Imperial Gazetteer of India*, Vol. II, (London, 1886).

দ্বৈতিক সূত্র

প্রকাশিত গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ

রায়, অতুল চন্দ্র। *ভারতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, (কলকাতা, ১৯৯৩) ।

দে, অমলেন্দু। *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, (কলকাতা, ১৯৭৪) ।

দে, অমলেন্দু। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী*, (কলকাতা, ১৯৮১) ।

খান, আকবর আলি। *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪)।

মল্লিক, আজিজুর রহমান (অনুবাদ- দিলওয়ার হোসেন)। *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২) ।

করিম, আব্দুল (অনু : মোকাদ্দেসসুর রহমান)। *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), (ঢাকা, ১৯৯৩) ।

কাদির, আবদুল। *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী*, (ঢাকা, ১৯৬৮) ।

বাছির, আবদুল। *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২)।

রহমান, আবদুর। *যতটুকু মনে পড়ে*, (চট্টগ্রাম, ১৯৭২)।

রহিম, আবদুল। *আল দুরার আল মনসুর ফি তারাজিম ঈ আহল ই সাদিকপুর*, (ইলাহাবাদ, ১৩৪৫ হিজরি./ ১৮৪৫ খ্রি.)।

মওদুদ, আবদুল। *ওহাবী আন্দোলন*, (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫) ।

খান, আব্বাস আলি।*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)*, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৭) ।

খান, আব্বাস আলি। *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১১)।

হাবিবুল্লাহ, আবু মহামেদ। *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪)।

আহমদ, আবুল মনসুর। *আমার দেখা রাজনীতির ত্রিশ বছর*, (ঢাকা, ১৯৭৫) ।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮), (কলকাতা, ১৯৯৯) ।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩০-১৯৩০)*, (ঢাকা, ১৯৬৯) ।

ইসলাম, আমিনুল। *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫)।

মোর্তজা, আল্লামা গোলাম আহমদ। *চেপে রাখা ইতিহাস*, মদীনা পাবলিকেশান্স, (বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৭) ।

ছফা, আহমদ। *বাঙালি মুসলমানের মন*, (ঢাকা, ১৯৮১) ।

হোসেন, ইমরান। *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, (ঢাকা, ১৯৯৩) ।

আলী, ইছমত (অনূদিত)। *মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী*, (ঢাকা, ১৯৬৬)।

ইসলামী বিশ্বকোষ , (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭)।

করিম, এ. কে. নাজমুল (রংগলাল সেন ও অন্যান্য অনু.)। *পরিবর্তনশীল সমাজ*, (ঢাকা, ২০০৮) ।

আহমদ, এ. কে. এম. নাজির। *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*,(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,ঢাকা, জুন, ২০০৬) ।

শাহনাওয়াজ ও সালেহ, এ. কে. এম. রুহুল কুদ্দুস মোঃ (সম্পা.)। *বরেন্দ্র বরেণ্য অধ্যাপক এ. কে. এম. ইয়াকুব আলি সংবর্ধনা গ্রন্থ*,

জলিল, এ. এম. এম. আবদুল। *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ*, (ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩)।

রহিম, এম. এ. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা, ১৯৮৮) ।

রহিম, এম. এ. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (ঢাকা, ১৯৮২) ।

রহিম, এম. এ. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (১৭৫৭-১৯৪৭), (ঢাকা, ১৯৯৪)।

আহমদ, ওয়াকিল। *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, (ঢাকা, ১৯৯৭)।

আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী(১৭৫৭-১৮০০)*, (ঢাকা, ১৯৮৫) ।

আলম, ওয়াহিদুল। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম, ১৩৯৬) ।

হান্টার, উইলিয়াম। *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস* (আবদুল মওদুদ অনূদিত),(ঢাকা, ১৯৬৮) ।

ওদুদ, কাজী আবদুল। 'মুসলমানের পরিচয়', *শাশ্বত বঙ্গ*, (ব্র্যাক, ঢাকা, ১৯৮৩) ।

মান্নান, কাজী আব্দুল। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, (রাজশাহী, ১৯৬১) ।

মান্নান, কাজী আব্দুল। *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজ*, (ঢাকা, ১৯৯০)।

রহমান, কাজী সুফিউর। *মুসলিম মানস সমাজ রাজনীতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৪৭)*, (রেডিয়্যান্স, কলকাতা, ২০১৩) ।

মার্কস ও এঙ্গেলস, কার্ল ও ফ্রেডারিক। *উপনিবেশকতা প্রসঙ্গে*, (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১) ।

খান, কে. এম. রাইছউদ্দিন। *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)*, (খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৬)।

রাব্বী, খন্দকার ফজলে (অনুবাদ : মু. আবদুর রাজ্জাক)। *বাংলার মুসলমান*, (ঢাকা, ১৯৬৮) ।

আহমদ, খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন (সম্পা.)। 'ইসলাম ও মুসলমান', *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*,

হালদার, গোপাল। *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ*, (কলকাতা, ১৯৭৫) ।

হালদার, গোপাল। *বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড) (প্রাচীন ও মধ্য যুগ)*,(মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৭) ।

ভূঁইয়া, গোলাম কিবরিয়া। *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, (ঢাকা, ১৯৯৫) ।

ভূঁইয়া, গোলাম কিবরিয়া। *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা, ২০০২)।

ভূঁইয়া, গোলাম কিবরিয়া। *বাংলাদেশ ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*, (ঢাকা, ২০১০)।

আলম, জাফর। *স্মরণীয় বরণীয়*, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৯৯) ।

মান্নান, ডক্টর কাজীআবদুল। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, (স্টুডেন্ট ওয়েজ,বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯)।

হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ. *পল্লি বাংলার ইতিহাস* (ওসমান গণি অনূদিত), (ঢাকা, ১৯৬৯) ।

ইউসফজরী, নওশের আলী খান। *বঙ্গীয় মুসলমান*, (হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭) ।

খান, নওয়াব আবদুল লতীফ সি.আই.ই., (অনুবাদ : আবুজাফর শামসুদ্দীন)। *মুসলিম বাংলা : আমার যুগে*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৮)।

আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ। নাসির হেলাল (সম্পা.), *মুন্সী মেহেরউল্লা জীবন ও কর্ম*, (ঢাকা, ২০০০) ।

ভট্টাচার্য, দেবীপদ (সম্পা.)। *আমার জীবনী*, (কলকাতা, ১৯৭৭)।

খান, নওয়াব বাহাদুর মৌলভী আবদুল লতীফ (আবু জাফর শামসুদ্দীন অনু:)। *মুসলিম বাঙ্গালাঃ আমার যুগে*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা) ।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, (কলকাতা, ১৯৭৭)।

চট্টেপাধ্যায়, প্রণব কুমার। *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯২০)*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৮৩) ।

মাইতি, প্রভাতাংশু। *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, (কলিকাতা, ২০১২) ।

ঘোষ, বিনয়। *ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি*, (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,ঢাকা, ১৯৮৬) ।

চক্রবর্ত্তী, ভাগ। *বিনয় সরকারের বৈঠকে*, (চ্যাটার্জি এন্ড কোং লিমিটেড, কলকাতা ১৯৪৪) ।

ফাহমিদ-উর-রহমান (সম্পা.), ফরায়েজী আন্দোলন আত্মসত্তার রাজনীতি, (বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ২০১১) ।

ঘোষ, বিনয়। *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কোলকাতা,১৯৬৩) ।

ঘোষ, বিনয়। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, (ঢাকা, ২০১৩) ।

সরকার, বিহারীলাল। *তিতুমীর*, (কলিকাতা, ১৩০৪)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। *বাংলা সাময়িকপত্র (প্রথম খণ্ড)*, (কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) ।

জব্বার, মওলবী আবদুল। *জওয়াব ই কুত্তআত আল ঈমান*, (কলিকাতা, ১৮৩৭)।

জব্বার, মওলবী আবদুল আল। *তাকবিয়াত আর মুসলিমিন ফি ইত্তিবা ঈ সুন্নত ই সৈয়দ আল মুরসালিন*, (কলিকাতা, ১২৫৬ হিজরি/ ১৮৪৬ খ্রি.)।

ইয়াহ্ইয়া, মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহা. । *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, (আল-আমিন রিসার্চ একাডেমি বাংলাদেশ, ঢাকা ২০১১) ।

ইউসুফ, মনিরুউদ্দীন। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, (ঢাকা, ১৯৬৮) ।

আলম, মাহবুবুল। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭) ।

খান, মুঈদ উদ-দীন আহমদ (অনুবাদ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া)। *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭)।

খান, মুঈন উদ-দীন আহমদ (অনুবাদ : গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া)। *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭) ।

আহমদ, মুজাফফর। *প্রবন্ধ সংকলন*, (কলকাতা, ১৯৭০) ।

মামুন, মুনতাসীর। *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)* ,(বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৩) ।

মামুন, মুনতাসীর। *শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর ও দুদুমিয়ার লড়াই*, (সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৮)।

মামুন, মুনতাসীর। *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, (ঢাকা, ২০১৪)।

কালিম, মুসা। *মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, (কলিকাতা, ১৯৮৮) ।

ইসলাম, মুস্তফা নুর উল। *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা, ১৯৬৮) ।

ইসলাম, মুস্তফা নুর উল। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০)*, (ঢাকা, ১৯৭৭) ।

ইসলাম, মুস্তফা নুর উল। (সম্পাদনা), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, (বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০১)।

খাঁ, মুহম্মদ আকরাম। *মোস্তফা চরিত*, (ঢাকা, ১৯৭৫) ।

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল । *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৪-১৯৪৭)*, (বাংলা একাডেমি , ঢাকা, ১৯৯৩)।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ।*বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬)।

আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ। *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)।

আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ। *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২)।

আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ। *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২)।

আহমেদ, সুফিয়া (অনু : সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ)। *বাংলার মুসলিশ সম্প্রদায়*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২)।

হক, মুহাম্মদ এনামুল। *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা, ১৯৫৫) ।

হক, মুহাম্মদ এনামুল। *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, (ঢাকা, ২০০৯) ।

হক, মেসবাহুল। *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ*, (ঢাকা, ১৯৮২)।

আল-মাসুম, মো. আব্দুল্লাহ। *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৯৮৫-১৯২১)*, (ঢাকা, ২০০৭) ।

আউয়াল, মোহাম্মদ আবদুল। *মীর মশাররফের গদ্যরচনা*, বাংলা একাডেমি, (ঢাকা, ১৯৭৫)।

কুদ্দুস, মোহাম্মদ আব্দুল। *'নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরণী'* আলোর দিশারী, (বাগিচা গাঁও, কুমিল্লা, ১৯৯৭) ।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী। *মুসলিম বাংলার মনীষা*, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ,দ্বিতীয় সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ১৯৮০) ।

নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ। *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (ঢাকা, ১৯৮৫)।

মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ। *বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার*, যশোর, ১৩৭৫।

খান, মোশাররফ হোসেন। *সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, (ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৭) ।

হক, মোোহম্মদ আজজিুল (অনু : মুস্তফা নূরুল ইসলাম)। *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, ঢাকা।

আল মাসুদ, মোঃ আবদুল্লাহ। *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি* (১৮৮৫-১৯২১),(বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭) ।

কুদ্দুস, মোহাম্মদ আব্দুল (সম্পা.)। *রূপজালাল*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৮৪) ।

মোদাব্বের, মোহাম্মদ। *ইতিহাস কথা কয়*, (ঢাকা, মার্চ ১৯৮৭) ।

বেগম, রওশান আরা। নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৯৩)।

চক্রবর্তী, রতনলাল। *সিপাহিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬) ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'শিবাজি-উৎসব' পূরবী, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ষোড়শ খণ্ড), (ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৪)।

আল ফারুকী, রশীদ। *মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া*, (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১)।

আল ফারুকী, রশীদ। *বাংলা উপন্যাসে মুসলিম লেখকদের অবদান*, (কলিকাতা, ১৯৮৪)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *জীবনের স্মৃতিদীপে*, (কলকাতা, ১৯৭৮)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পা.)। *'ধর্ম ও সমাজ', বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, (কলিকাতা, ১৯৮৩) ।

মনির, শাহজাহান। *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, (বাংলা একাডেমী,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৩) ।

রহমান, শেখ মুহাম্মদ লুৎফর। *সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের অবদান*, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০০৭) ।

জমিরুদ্দীন, শেখ মোহাম্মদ। *মেহের চরিত*, (রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৫)।

মিত্র, সতীশচন্দ্র। *যশোর খুল্‌নার ইতিহাস* (২য় খণ্ড), (কলিকাতা, ২০০১) ।

সেন, সত্যেন। *বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০)।

আহমেদ, সালাউদ্দীন। *উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, (ঢাকা, ২০০০)।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.)। *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৪৭)*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৯৩) ।

ইসলাম, সিরাজুল (প্রধান সম্পাদক)। *বাংলা* পিডিয়া (ষষ্ঠ খণ্ড), (বাংলাদেশ এশিয়াটিস সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৬) ।

বসু, স্বপন। *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, (কলকাতা, ১৯৮৫)।

বসু ও চৌধুরী, স্বপন ও ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.)। *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, (কলকাতা, ২০০৩) ।

মুখোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র। *বরিশাল বেল ইসলামিয়া হোস্টেল*, (বরিশাল, ১৯৪০)।

চ্যাটার্জী, সুনীল কুমার। *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন*, (কলিকাতা, ১৯৭৪) ।

রায়, সুপ্রকাশ। *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, (কলকাতা, ১৯৮০)।

রায়, সুপ্রকাশ। *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ (প্রথম খণ্ড)*, (কলিকাতা, ১৯৭২) ।

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার। *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী)*, (কলকাতা, ১৯৮৭) ।

আহমেদ, সুফিয়া (অনু. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ)। *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় (১৮৮৪-১৯১২)*, (বাংলা একাডেমী,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০২) ।

আমিন, সোনিয়া নিশাত (অনু : পারভীন নাহার)। *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ১৮৭৬-১৯৩৯*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২) ।

বাগল, যোগেশচন্দ্র। *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, (কলিকাতা, ১৩৫৭) ।

বেগম, রওশন আরা। *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

ইংরেজি

Karim, Abdul. *Murshid Quli Khan and His times*, (Dacca, 1963).

Mallick, A. Azizur Rahman. *British Policy and Muslim in Bengal (1757-1856)*, (Dacca, 1961).

Habibullah, A. B. M. *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, (Dacca, 1962).

Ali, A. F. Eman. *'The Concept of Castes: A New Prespective'*, , vol. 8, No. I, (*Chattagong University Studies*, 1985).

Ahmed, A. F. Salahuddin. *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, (International Center for Bengal Studies, Dhaka).

Dani, Ahmad Hasan. *Dacca*, (Dacca,1962).

Ali, A. K. M. Ayub. *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh* (Down to A. D. 1980), (Dhaka, 1983).

Karim, A. K. Nazmul. *The Changing Society of India and Pakistan*, (Dacca, 1961).

Karim, A. K. Nazmul. *The Dynamics of Bangladesh Society*, (New Delhi, 1980)

Martin, Alfred Von. *Sociology of the Renaissance*, (London, 1945).

De, Amalendu. *Roots of Seperatism in Ninettenth Century Bengal*, (Calcutta, 1974).

Seal, Anil. *The Emergence of Indian Nationalisms Competition and Collaboration in later Nineteenth Century*, (Cambridge, 1968).

Desai, A. R. *Social Background of Indian Nationalism*, (Bombay, 1976).

Green, Arnold W. *An Analysis of Life in Modern Society*, (New York, 1964).

D'souza, Austin A. *Anglo-Indian Education*, A Study of its Origins and Growth in Bengal upto 1960, (Oxford University Press, Delhi, 1976).

Mallick, Azizur Rahman. *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*, (Dacca, 1977).

Metcal, Barbara Daly. *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*, (Oxford University Press, New Delhi, 2002).

Kling, Blair B. *The Blue Mutiny*, (Calcutta, 1977).

De, Barun (ed.). *Essays in Honour of Prof. S. C. Sarkar*, (New Delhi, 1976).

Majumdar, B. B. *Indian Political Association and Reform of Legislatures 1817-1917*, (Calcutta, 1965).

Misra, B. B. *The Indian Middle Classes in Modern Times*, (Oxford University Press, London,1961).

Bhatt and Agarwal, B. D. and J. C. *Educational Documents in india (1813-1968)*, (New Delhi, 1969).

Philops, C. H. (ed.). *Selected Documents of the History of India etc.*, vol. IV, (London, 1962).

Smith, C. W. *Modern Islam in India*

Ibrahimy, Dr. M. Sekander Ali (ed.). *Dhaka*, (Islamic Foundation, 1985).

Haque, Enamul (ed.). *Nawab Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, (Dacca, 1968).

Encyclopedia of the Social Sciences, vol, ix, 15th print, (New York).

Stokes, Eric. *The English Utilitarians and India*', (Oxford, 1959).

Tabassum, Farhat. 'Deoband Ulema's Movement for the Freedom of India', *Jamiat Ulama-i-Hind*, (Manak Publication, New Delhi, 2006).

Rahman, Fazlur. *The Bengali Muslims and English Education* (1765-1855), (Dacca, 1973).

Dodd, G. N. *The History of the Indian Revolt*, Muslims of British India, (Cambridge, 1972).

Malik, Hafeez. *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, (Public Affairs Press, Washington D.C., 1963).

Fairchild, Henry Pratt (ed.). *Dictionary of Sociology*, 4th print, (U.S.A. 1979).

Ahmad, Imtiaz (ed.). *Caste among Indian Muslims*, (Delhi, 1973).

Qureshi, I. H. *A Short History of Pakistan*, Book IV, (University of Karachi, 1967).

Qureshi, I. H. *Sultanate of Delhi*, (London, 1938).

Jafar-ul-Islam, ‘The Aligarh political Activities’, *The Journal of the Pakistan Historical Society*, January 1964.

Maitra, Jayanti. *Muslim Politics in Bengal : Collaboration Confrontation (1885-1906)*, (Calcutta, 1984)

Sarkar, Jadu Nath (ed.). *History of Bengal*, vol. II, (Dacca, 1972).

Gould and Kolb, Julious and William L. (ed.). *A Dictionary of the Social Sciences*, (New York, 1964).

Broomfield, J. H. *Elite Conflict in a Plural Society*, (Bombay, 1968)

Sarkar, Jagadish Narayan. *Islam in Bengal*, (Calcutta, 1972).

Sarkar, J. N. *Islam in Bengal*, (Calcutta, 1972).

Wise, James. *Notes on the Races, Caster and Trades of Eastern Bengal*, (London, 1883)

Marx, Karl. *Capital*, vol. I, (London, 1967).

Rubbee, Khondker Fuzil. *The Origin of the Musalmans of Bengal*, (Culcutta, 1895).

Roy, Krishna Ch. High Education and the Present Position of the Graduates in Arts an Law of the Calcutta University. Reprinted with corrections form The Hindo Patriot of the 23rd ocrober 1882. A Convocation Addresses, University of Calcutta, vol. I, 1858-1879.

Mitra, K. C. *The Hindoo College and its Founder*, .

Aziz, K K. *Ameer Ali : His Life and Work*, (Lahore, 1968).

Ashraf, K. M. *Life and Conditions of the People of Hindustan*, (New Delhi, 1970).

K. Marx and F. ENGELS, *On Colonialism*, (Moscow, 1954).

Akanda, Latifa. *Social History of Muslim Bengal*, (Dacca, 1981).

Haque, M. Azizul. *History and Problems of Muslims Education in Bengal*, (Calcutta, 1917).

Khan, M.A. *Titumir and his followers in British Indian Records (1831-33)*, (Islamic Foundation, Dhaka, 1940).

Khan, M. A. *Tomb Inscription of Haji Shariatullah*, JASP, vol. III, (1958,).

Larid, M. A. *Missionaries and Education in Bengal, 1793-1837*, Clarendon Press, (Oxford 1972).

Seriajuddin, M. A. *The Revenue Administration of Chittagong from 1761-85*, (Chittagong University, 1971).

ALi, M. Mohar. *History of the Muslims of Bengal*, (Riyadh, 1985).

Sharif, M. M. *A History of Muslim Philosophy*, Vol. II, (Wiesbaden, 1963).

Roy, M. N. *India in Transition,* (Calcutta, 1941).

Hussain, Mahamud. *The Success of Sayyid Ahmed Shahid: History of The Freedom Muvement,* vol. II, part I, (Karachi, 1960).

Hai, Maulana Abdul. *Nuzhatul Khawater,* vol. VII, (Hyderabad, 1947)

Ali, Mohammad Mohar. *The Bengali Reaction to Christion Missionary Activities (183-1857),* (Chittagong, 1965).

Miyan, Maulana Muhammad (Tr. by Muhammadullah Qasmi). *Silken Letters Movement,* (Shaikul Hind Academy, Darul Uloom Deoband, Manak Publication Pvt. Ltd, New Delhi, 2012).

Shah, Mohammed. *In Search of an Identity: Bengali Muslims 1880-1940,* (Calcutta, 1996).

Ahmad, Mohiuddin. *Saiyid Ahmad: His life and Mission,* (Academy of Islamic Research and Publications, Lucknow, 1965)

Esahak, Muhammad. *Indias Contribution to the stady of Hadith Literature*, (Dacca University University Press, 1955).

Ali, Muhammad Mohar. *History of the Muslims of Bengal*.Vol.I3, (Imam Muhammad Bin Saud Islamic University, Riyadh,1985).

Khan, Muin-Ud-Din Ahmed. *Muslim straggle for freedom in Bengal*, (Dacca, 1963).

Khan, Muin-Ud-Din Ahmed. *Selections From Bengal Government Records on Wahhabi Trials(1863-1870),* (Dacca, 1961).

Khan, Muin-Ud-Din Ahmed. *Titumir and his follower in British Indian Records*, (Dacca, 1974).

Khan, Muin-Ud-Din Ahmed. *History Of The Fara'idi Movement.* (Islamic Foundation, Bangladesh, Second Edition, October, 1984).

Sinha, N. K. *History Of Bengal (1757-1905).*

Kaviraj, Narahari. *Wahabi and Farazi Rebels of Bengal*, (New Delhi, 1982).

Sinha, Pradip. *Nineteenth Century Bengal*, (Calcutta, 1965).

Horton and Horton, P. B. and R. L. (ed.), *Introductory Sociology*, (Illinois, 1977).

Mitra, P. C. *A Biographical Sketch of David Hare,* (Calcutta, 1877).

Spear, Percival. *India, Pakistan and West,* (London, 1952).

Lavy, R. *Social History of Islam*, (London, 1956).

Hardy, P. *The Muslims of British India*, (Cambridge University Press, 1972).

Ahmed, Rafiuddin. *The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity,* (Delhi, 1981).

Mojumdar, R. C. (ed.). *British Paramountey and the Indian Renaissance,* Part II, *(*Bombay, 1956).

Mojumdar, R. C. *History of the Freedom Movement in India*, vol. I, part-2, (Calcutta, 1971)

Dutt, Romesh. *The Economic History of India*, Vol. II, (Routledge and Kegan Paul, London, 1956).

Lavy, Ruben. *An Introduction to the Sociology of Islam,* Part I, (London, 1933).

Islam, Sirajul. *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation, 1790-1819,* (Dacca, 1979).

Sarkar, Sumit. *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, (Delhi, 1973)

De, S. K. *History of the Bengali Literature in the Nineteenth Century* 1800-25, (Calcutta, 1919).

Ikram, S. M. *History of Muslim Civilization in India and Pakistan*, (Lahore, 19650).

Banerjee, S. N. *A Nation in Making*, (Oxford University Press, Madras, 1925).

Sen, Shila. *Muslim Politics in Bengal,* (New Delhi, 1976).

Islam, Sirajul. *Permanent Settlement in Bengal, A Study of its Operation 1790-1819,* (Dhaka, 1979).

Ahmed, Sufia. *Muslim Community in Bangla (1884-1912),* (Dacca, 1974).

Ali, Syed Ameer. *The Spirit of Islam,* (London, 1961).

Torachand, *History of the Freedom Movement in India*, vol. II, (1983).

Sequeira, T. N. *Modern Indian Education,* (Oxford University Press, 1960).

Dutta, Rajani Palme. *India Today*, (Calcutta, 1970).

Struggle for Independence1857-1947, (Karachi,1958).

Anstey,Vera. *The Economic Development of India*, (London, 1952).

Smith, W. C. *Modern Islam in India*, (Victor Golange, London, 1946).

Moreland, W. H. *India At the Death of Akbar, (*London, 1920).

Hunter, W. W. *A Statistical Account of Bengal*, vol. IX, (Delhi, 1974).

Who's Who in India

পত্রিকাসমূহ (বাংলা ও ইংরেজি)

খাঁ, আকরাম। 'সাংবাদিকতায় বাঙালী মুসলমান', *দৈনিক আজাদ* (ঈদ সংখ্যা), ১৩৪২

করিম, আবদুল। 'মুসলমান সমাজের শিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (কার্তিক, ১৩২৯)।

শামসুদ্দীন, আবুল কালাম। 'মুসলিম বাঙলার সংবাদ সাহিত্য', *মোহাম্মদী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ (বঙ্গাব্দ)।

আলী, আবদুল্লাহ ইবনে সৈয়দ বাহাদুর (সম্পা.)। *জওয়াব-ই-ইসতিফতা*, মীর মোহাম্মদ আলী, *মতবা-ই আহম্মদী*, (১২৪৫ হি./ ১৮২৯ খ্রি.)।

আহমদ, ওয়াকিল। 'বাংলার বিদ্বৎসভা : ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, (জুন, ১৯৭৮)

হক, খোন্দকার সিরাজুল। 'বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা ভাবনা,'*সুন্দরম*, ফাল্গুন ১৩৯৭- বৈশাখ ৯৮, পৃ. ৪০।

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল। 'ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', *সাহিত্যিকী*, (বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৪), ।

আলী, মোহাম্মদ ইদরিস। 'মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫।

মোল্লা, মুহম্মদ কাসেম উদ্দিন। 'মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা', চতুর্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, (বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৭) ।

খান, মুহাম্মদ জাকারিয়া। "বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটারের ভূমিকা", *বাংলাদেশ ইতহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় সংখা পৌষ- চৈত্র, (ঢাকা, ১৩৯৪)

মামুন, মুনতাসির ।'বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব এবং পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, *(*৩-৪ সংখ্যা ১৩৮১-৮২)।

বাকী, মুহা. আবদুল। *মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর রাজনৈতিক মানস ও চিন্তার বিবর্তন*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, (ঢাকা, ৩৫ বর্ষ : ১-৩ সংখ্যা, ২০০১-২০০২)।

শাহ, মোহাম্মদ। 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সংস্কৃতিক ভিত্তি', *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১) সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), ৩য় খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৯৩)

ইসলাম, মোঃ মাহ্‌ফুজুল। *স্যার সৈয়দ আহমদ খঅনের রাজনৈতিক দর্শন [প্রবন্ধ সংকলন]*, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ২০১৮)।

আখতারুজ্জামান, মোঃ। *পূর্ব ভারতে মুসলিম বিজয় : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা*, ইতিহাস, ৩৩ বর্ষ : ১-৩ সংখ্যা, (বাংলা ১৪০৬, ১৯৯৯-২০০০)।

আহমদ, সলাহউদ্দীন। 'উনিশ শতকের মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধরা', *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ঢাকা, ১৯৯১)

আলী, সৈয়দ মর্তুজা। 'উত্তর বঙ্গের সাহিত্য', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*,(বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫)।

আলী, সৈয়দ মতুর্জা। 'শ্রীহট্টের ইতিহাস', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, (মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮)।

হাকিম, লোকমান। 'বাংলার মুসলিম নারী সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (১৮৭৩-১৯১১)', *বাংলদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ; ১-৩ সংখ্যা; (১৪১১ বাংলা, ২০০৪-২০০৫)

ইংরেজি

Ahsan, Abdullah. 'A Late Nineteenth Century Muslim Response to the Western Criticism of Islam- an Analysis of Amir Ali's Life and Works', *American Journal of Islamic Social Sciences*, 11:2, 1985

Khan, Mr. Abdur Rafay. *Sir Sayyid Ahmed Khan's political Ideas and Activities*, in the proceedings of the Pakistan History Conference (second session), (Pakistan Historical Society, Lahore, 1952).

Malik, Hafeez. 'Sir Sayyid Ahmad Khan's Contribution to the Development of Muslim Nationalism in India', *Modern Asian Studies*, 4, 2 (1970).

Jafar-ul-Islam, 'The Aligarh political Activities', *The Journal of the Pakistan Historical Society*, (January 1964).

Owli, Mowli Abdul. "Ethnographical Notes on the Mahammadan Castes of Bengal", *Journal of Anthropological Society of Bombay*, Part-7.

Spear, P. 'Bentinck and Education', *The Cambridge Historical Journal*, vol. VI, 1938-40.